

খেলা পেরিয়ে

শ্রীযুধাজিৎ

লিপি-বর্ধন

৯, শিবনারায়ণ দাস লেন : কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারী —১৯৪৬

প্রকাশক :
দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়
লিপিবন্ধন
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :
সুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
রয়েল হাফটোন কোং
৪, সরকার বাই লেন

একমাত্র পরিবেশক :
নব ভারতী
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পাঁচ টাকা

আভাষণ ঃ

আজকাল গল্প বা উপন্যাসের বইয়ে লেখকের মুখবন্ধ সন্নিবেশ করা অচলিত। অনেকের মতে লেখক যদি তাঁর রচিত পুস্তকের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে না পেরে থাকেন, তবেই এভাবে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়। আমার মতে একথা হয়তো সাধারণ বিষয় সন্নিবেশে লিখিত গল্প-উপন্যাসের বই সম্পর্কে খাটে। কিন্তু যদি কোন বই তুই আর তুইয়ে চার হবার মত পটভূমিকা নিয়ে লেখা না হয়—যদি কোন বইয়ে নূতন আঙ্গিক বা অভিনব রচনাশৈলীর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তবে বোধ হয় লেখককে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে সুযোগ দেওয়ায় খুব অন্যায় হবে না। 'মেখলা পরা মেয়ে' সাধারণ ভাবে সাধারণ পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসমাত্র নয়—গত জুন-জুলাই-আগষ্ট মাসে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন উপলক্ষ্য ক'রে যে 'সভ্যতা-সংকট' দেখা দেয়—যে ভ্রান্ত আন্দোলনে উজ্জীবিত এক শ্রেণীর মানুষ মনুষ্যত্বের খোলস খুলে ফেলে পশুতার পোষাক পরে অন্যায় ও অত্যাচারের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত ও নিগৃহীত করে একশ্রেণীর স্বদেশীয় মানুষকে, তারই উদ্বেগাকুল পটভূমিকায় সেই সময় এ উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। আরও একটি কারণে এ উপন্যাস স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। তা হ'ল বাংলা তথা কোন ভারতীয় ভাষার উপন্যাসের সঙ্গে লেখকের 'স্বগতোক্তি' (Soliloquy)-র সংযোজন। আসামের ঘটনার সময় ভারতের প্রধান নেতা যে তুর্বল নীতির আশ্রয় নেন, —যেভাবে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েন সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হ'তে, সেই বিষয় নিয়ে, চিন্তা করতে করতে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের সমাজে শাসনে উক্ত নেতার নেতৃত্বে গঠিত সরকারের আচরিত নীতি কোটি কোটি দেশবাসীকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে; যে বাংলা ভাষাভাষীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা, তাদের

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই দুর্বল দ্বিধাগ্রস্ত শাসনের জন্য কিরূপ বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে ও আসছে—সে সকল বিষয়ে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখকের মনলোকের চিন্তা-প্রতিচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে স্বগতোক্তির মাধ্যমে। সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যের কোন উপন্যাসে এমন প্রচেষ্টা এই প্রথম।

রাজনৈতিক চেতনা সর্বস্ব স্বগতোক্তিগুলি হয়তো অনেক পাঠকের পছন্দ হবে না। কিন্তু সে জন্য তাঁদেব চিন্তিত হবার কিছু নেই। কেননা 'মেখলা পরা মেয়ে'র গল্পাংশ তার আপন গতিতে এগিয়ে গেছে। সমকালীন ঘটনা নিয়ে—যে ঘটনা সমগ্র জাতির মনে বিশেষ একটা ছাপ ফেলে গেছে—উপন্যাস লেখা খুবই শ্রমসাধ্য। কারণ এতে বাস্তব ও কল্পনার ভারসাম্য রক্ষা করা বিশেষ কঠিন। জানি না আমার লেখায় সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে কিনা। তবে এটুকু বলতে পারি যে এ উপন্যাসের গল্পাংশ বাস্তবের তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে কল্পনার স্রোত বেয়েই এগিয়ে গেছে। তাই এ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীমাত্রেই কাল্পনিক। যদি বাস্তব কোন চরিত্রের সঙ্গে এ উপন্যাসের পাত্রপাত্রীব কোন যোগ থেকে থাকে তা নিতান্ত কাকতালীয়।

উপন্যাসটি শারদীয় 'রূপাঞ্জলি'তে প্রকাশিত হ'লে শত শত পাঠক-পাঠিকা আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দু'চারজন অসমীয়া পাঠক নিন্দা ও তিরস্কারও পাঠিয়েছেন। তাঁদের সবার উদ্দেশ্যেই এ সুযোগে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শারদীয় সংকলনে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির বহুলাংশে পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দের প্রশংসাই যে কোন সাহিত্যিকের সাহিত্যিকজীবনের পাথেয়—আর বহুর মনে যদি তাঁর সে লেখা আনন্দের দীপ জ্বালাতে পারে, তবে সেটা হয় তাঁর পরম পাওয়া। এ বইয়ের জন্য যদি পাঠকদেব কাছ থেকে আমি সেই পরম পাওনা পাবার যোগ্য বিবেচিত হই তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

২৫শে ডিসেম্বর
১৯৪৬

বিনীত
সত্যজিৎ

উৎসর্গ

সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের যে সকল মাননীয় সদস্যের ঐক্যমতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় 'আসাম হাঙ্গামা'র বিষয়ে সম্মিলিত প্রস্তাব পাশ করা সম্ভব হয়েছিল, তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে এই বইটি উৎসর্গ করা হ'ল।

—লেখক

MEKHALA PARA MEYE

A Bengali novel with soliloquy

By

Shri Judhajeet

ভূমিকা নয় ঃ

"মেখলা পরা মেয়ে" উপন্যাসের লেখক আমাকে অনুরোধ করেছেন এই বইয়ের একটি ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই বইয়ের কোন ভূমিকা অনাবশ্যক। কারণ আসামের বাঙ্গালী বিরোধী দাঙ্গা ও গুণ্ডামীর কাহিনী সর্বজন পরিচিত। সেই ঘটনা গল্পের আকারে কতটা উপভোগ্য তাহা পাঠকদের বিচার্য্য। আমার মতে আসামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতীয় গণতন্ত্রের বিরোধী এবং মনুষ্যত্বেরও বিরোধী।

ইতি—

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ যুগান্তর

আমার লেখার ঘর। একটা মেহগ্‌নি কাঠের টেব্‌ল। তাতে চন্দন কাঠের দোয়াতদান, টেব্‌ল ল্যাম্প। একপাশে কটা ভাষা ও শব্দকোষ। চারদিকের আলমারিতে ঠাসা বই। এর মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী, শরৎ-গ্রন্থাবলী, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ঋষি বঙ্কিমের গ্রন্থসমূহের সেট সহজেই চোখে পড়ে কেউ এ ঘরে এলে।

ঘরটা খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়। ডিস্টেম্পার করা দেয়াল। মেঝে মোজেক-এ আবৃত। এ ঘরে জুতোর প্রবেশ নিষেধ। কেননা এ ঘরেই চলে আমার সাধনা—সাহিত্য সাধনা। দেয়ালে টাঙ্গানো কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় ও বিশিষ্ট ভারতসন্তানের ছবি। তাঁরা হ'লেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, নিজ হস্তাক্ষরে বাংলায়—"মো, ক, গান্ধী" সহি সহ মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং বর্তমান ভারতের মুখ্য নেতা নেহ্‌রু। এছাড়া আরও একটি চিত্র আছে, তা হ'ল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির। সুতরাং এ ঘরে যে জুতো পরে ঢোকা উচিত নয় আশা করি এ কথা শ্রদ্ধানত চিত্তে আমার সঙ্গে আপনারাও স্বীকার করবেন।

এক দিকের দেয়ালে টাঙ্গানো আছে আরও দুটি জিনিস। তার একটি হ'ল পরাধীনতার আমলে বিদেশী [illegible] অঙ্কিত

নানা দেশীয় রাজ্য কণ্টকিত একটি মানচিত্র। আর ঠিক তার পাশেই স্বাধীনতাত্তোর ভারতের পাক-অংশ বিযুক্ত মানচিত্র। আর যে জিনিসগুলো ছিল একটা উডেন শেলফ-এর ওপর পর পর স্তূপাকৃতি হয়ে তা হ'ল উনিশ শ' ষাট সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সুরু করে জমানো বেশ কিছু খবরের কাগজ—আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার, ষ্টেট্‌সম্যান, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, লোকসেবক, স্বাধীনতা, জনসেবক, আসাম ট্রিবিউন, নতুন অসমীয়া প্রভৃতি। কাগজগুলোর বুকে ছোট বড় নানা হরফে লেখা আসামের ভারতীয় নাগরিক বাংলা ভাষাভাষী নরনারীর ওপর অমানুষিক অত্যাচারের নানা সংবাদ। হতে পারে সবই মর্মান্তিক সত্যি—নইলে কিছুটা হয়ত মিথ্যা, নয়ত বা সত্যে যা ঘটেছে তার চেয়েও সংবাদ হ'য়ে বেরিয়েছে অনেক কম।

একদৃষ্টে আমি অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলাম সেই কাগজগুলোর দিকে। পলক পড়ল না চোখে। তারাগুলো জলে ভরে গেল। চোখের মণিটা স্থির, অচঞ্চল। এক সময় চোখের ভেতরটা আর্দ্র হ'ল। পাতা পড়ল এবার। সঙ্গে সঙ্গে খুলতে পারলাম না চোখ। অনেকক্ষণ মুদিত নয়নে বসে রইলাম। কেমন যেন তন্দ্রাতুর হ'লাম —আর মুদিত চোখের পাতার ওপর ভেসে উঠল দেশীয় রাজ্যে খণ্ডবিখণ্ড বৃটিশ ভারতের মানচিত্র। দেখতে পেলাম সেই মানচিত্রের ওপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জাগরণ। সমগ্র জাতটার হৃদয়ে যেন স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনের ঢেউ একের পর এক এসে আঘাত করতে লাগল। অবশেষে এলো উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সাল— মুক্তিকাম। মানুষগুলোর মুখে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষিত হ'ল সেই ঐতিহাসিক কথা—ইংরেজ, ভারত ছাড়। বৃটিশ সিংহ পলায়নপর হতে বাধ্য হ'ল—সে দাবী শুনে। সরকারী ভবন শীর্ষ হতে নামানো হল ইউনিয়ান জ্যাক। ভারত মাতার বুকের ওপর দিয়ে দেশের নওজোয়ানরা অশোকচক্র লাঞ্ছিত তে-রঙা ঝাণ্ডা উড়িয়ে ব্যাণ্ড ও

বিউগল বাজাতে বাজাতে কুচকাওয়াজ ক'রে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ধ্বনি দিয়ে উঠছে তারা :

—বন্দে মাতরম্! স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ! জয়হিন্দ্!

কিন্তু, কিন্তু ওকি! হ্যাঁ ওই ত বিশাল দৈত্য-সদৃশ এক দেহ—হাতে তার শাণিত ছুরিকা। বিকট শব্দে অট্টহাসি হেসে উঠল দৈত্যটা। পরক্ষণেই সে ভারত মানচিত্রে দেশীয় রাজ্যগুলির এখানে, ওখানে সেখানে, রক্তবীজের মত বহু মূর্তি ধারণ করে হাতের সেই শাণিত ছুরি চালাবার ভঙ্গী করতে লাগল। সেই ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে বিরাট চেহারার দেহটার বিরাট মুখগহ্বর হতে অট্টহাসি বেরিয়ে আসতে থাকে গমকে গমকে। ভারতের ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠলাম আমি।

তবে হঠাৎ তার সে হাসি হ'ল স্তব্ধ। কিন্তু কেন? বিকটদর্শন বহুরূপী দৈত্যটা অকস্মাৎ কার ভয়ে থরথর কাঁপতে লাগল? ওর ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিকে অনুসরণ করে যাঁকে আমি দেখতে পেলাম—তিনি ভারতের প্রথম ও শেষ সহকারী প্রধানমন্ত্রী, 'আয়রণ ম্যান' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। হাতে তাঁর যেন এক মোহিনী যাদুদণ্ড। সেই যাদুদণ্ডের ইঙ্গিতে বিকট দর্শন দৈত্যটার সবকটি প্রতিরূপ—হাতের শাণিত ছুরি ফেলে দিয়ে দে ছুট দে ছুট। অবশেষে সে গিয়ে মিলিয়ে গেল ভারতসাগরের লবণাক্ত নীলাকাশের ছায়া পড়া নীল জলে।

বিস্ময়ে আনন্দে আমার চোখের তারা নেচে উঠল। দৃষ্টি গিয়ে পড়ল চৌদ্দটি 'ক' শ্রেণীর রাজ্য অধ্যুষিত নব ভারতের নতুন মানচিত্রের ওপর। মন আমার নিশ্চয়তায় হ'ল আপ্লুত।

হঠাৎ লেলিহান অগ্নি শিখায় উত্তর-ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশের আকাশ হ'ল রক্তিম! ভয়ার্ত নারী-পুরুষের ভীত করুণ আর্তনাদে আকাশবাতাস মথিত হয়ে উঠল। আবার এসেছে সেই দৈত্যটা। এই বার বছরে তার দেহ যেন বেশ পুরুষ্টু হয়েছে। চোখে মুখে যেন

এসেছে আরও ভয়াল কুটিল ভাব। দেহের রক্ত যেন ওর নৃত্য করতে সুরু করেছে তাথৈ তাথৈ থৈ। আসামের প্রায় সর্বত্র সুরু হ'ল জহ্লাদবৃত্তি।

ভয়ার্ত, হৃতসর্ব্বস্ব মানুষের আকুল আবেদন কি গিয়ে পৌঁছালো দিল্লীর মসনদে? কি করে পৌঁছাবে, দিল্লী যে দূরস্ত্—দিল্লী বহু দূর। কিন্তু বিজ্ঞান ত' পরস্পরের কাছে এনে দিয়েছে গোটা দুনিয়াকে। তাই দিল্লী দূরে থেকেও দূর নয়। তার-বেতার-টেলিফোন, সর্বোপরি সংবাদপত্র স্ব স্ব ধর্ম-মত দূরের মানুষদের আনন্দ-বেদনা-দীর্ঘশ্বাস-আর্তনাদ নিকট করে আনে। তবু যেন বিস্তর টালবাহানার পর প্রধানমন্ত্রী, জাতির জনকের ভাষায় যে—"জওহর সত্যিই একটি জওহর" নেতা নেহ্রু ছুটলো সেই প্রত্যন্ত প্রদেশে।

সারা ভারত উন্মুখ হয়ে রইল—তাদের জাতীয় নেতার সিদ্ধান্ত শুনতে। বিশেষ করে হৃতসর্বস্ব, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, ধর্ষিত—ভারতীয় নাগরিক বাঙ্গালীরা তাঁর আশ্বাসের ললিতবাণী শুনবার আশায় যখন রুদ্ধশ্বাসে পল অনুপল গুণছে তখন নেহ্রু যা বলল তা যে দুষ্কৃতকারীদের তোষণেরই নামান্তর। দাঙ্গায় নিহত বাঙ্গালীদের জন্য নয়—পুলিশের গুলিতে নিহত রঞ্জিৎ বড়পূজারীর জন্য সমবেদনা জানালো নেহ্রুর সে বাণী। সংবাদপত্রগুলোর ওপর নেহ্রু চাপালো অতিরঞ্জনের অপবাদ।

আমার মনের মাঝে নেহ্রুর মন্তব্য সম্পর্কে, তাঁর আচরণ সম্পর্কে ভাবনার আলোড়ন সুরু হ'ল। কিছুতেই সায় দিতে পারলাম না তাঁর সিদ্ধান্তে। তাই সামনের সুদৃশ্য দোয়াতদানের দিকে ডান হাতটা এগিয়ে গেল, তুলে নিল লেখনী। কলমের নিব ডুবিয়ে দিল মসীতে—মনের মাঝে একটা প্রত্যয় যেন দৃঢ়তা সহকারে অস্ফুটে বলে উঠল—**Pen is mighter than sword.**

সত্যি কি? হয়তো সত্যি। সত্যের আলোকে যেন দেখলাম

আসামের ঘটনার ওপর নেহ্‌রুর মন্তব্যটা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে চাপা দেবার সামিল। তাই আমার কলম টেব্‌লের ওপর পড়ে থাকা প্যাড কাগজের বুকে কাটল আঁচড়—রূপ পেল আখর—নেহ্‌রু, তুমি ভুল করলে!

বঙ্গ-আসাম সীমান্ত সন্নিহিত এক মহকুমা শহর। সারি সারি অস্থায়ী তাঁবু পড়েছে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ত্রাণ বিভাগের। অদূরেই জংশন ষ্টেশন। আসাম থেকে আসা ট্রেনের কামরায় কালকে সব কিছু থাকা আজকের সহায় সম্বলহীন ভীতবিহ্বল নব-উদ্বাস্তু নরনারীর ভীড়। ভারতেরই কোন রাজ্য থেকে কুকুর বিড়ালের মত তাড়া খাওয়া ভারতীয় মানুষগুলো এসে আশ্রয় নিচ্ছে তাঁবুতে তাঁবুতে। মুখে চোখে ওদের সব হারানোর ছাপ। রিক্ততার প্রতিচ্ছবি যেন ওরা। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের লোকেরা শিশুদের দিচ্ছে দুধ, একবস্ত্রে চলে আসাদের দিচ্ছে বস্ত্র আর সম্মিলিত হেঁসেলে রাঁধা খিচুড়ি বিলোচ্ছে সবার মাঝে।

সবেমাত্র এক ট্রেন যাত্রী এসে পৌঁছেচে এই অস্থায়ী শিবিরে—তাদের ভেতর থেকে একটি মেয়েকে সবারই চোখে পড়ে—চোখ জোড়া টানা টানা। মাথায় তেলহীন রুক্ষ একমাথা চুল। মুখে অদ্ভুত লালিত্য। স্বর্ণ চাঁপার মত গায়ের রং। পরনে অসমীয়া মেয়েদের জাতীয় পোষাক—ছিন্ন, ময়লা মেখলা। চাদরটা বুঝি হারিয়ে গেছে ওর। দৃষ্টিতে ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি। চোখের কোলে বহু বিনিদ্র রজনী জাগরণের ক্লান্তিচিহ্ন। মুখের রেখায় রেখায় একটা নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভাব। কিন্তু তার সে মুখ ক্রমে ক্রমে সঙ্কল্প-কঠিন হয়ে উঠল। ঠোঁটদুটো সে পরস্পর জোরে চেপে ধরল। তারপর ডান হাতটা সামনের দিকে টান করে ধরল রিভলবারের ট্রিগার টিপবার ভঙ্গীতে। পরক্ষণেই মুক্তাপাঁতি দাঁত চিক্‌মিকিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল:

—ঠাস্, ঠাস্, ঠাস্।—বেঙ্গলি মারিম, অসমীয়া মারিম!

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল ক'রে হেসে উঠে ছুটে পালিয়ে মিশে গেল মেয়েটি উদ্বাস্তু জনারণ্যে। আশপাশের সবাই সমবেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

পণ্ডিত নেহ্রু, আমি ভারতীয়। ভারতীয় সংবিধানের সবগুলি শর্ত মেনেনেওয়া কোন নাগরিক আমি। যে অধিকারের বলে তুমি দেশ শাসন কর, যে অধিকার বলে তুমি নির্বাচনে দাঁড়াও, যে অধিকার বলে তুমি ভারতবাসীর সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ ভাববার দায়িত্ব পেয়েছ, ঠিক সেই সেই অধিকার আমারও আছে। আমি একজন বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিক। আমি সেই ভাষায় কথা বলি, পাঠ করি, কলম চালাই—যে ভাষাকে ধন্য করেছেন, আমার, প্রত্যেক বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর কবিগুরু। এমনকি তোমার গুরুরও গুরু যিনি। তাঁর লেখা বাংলা ভাষার গান আজ হয়েছে জাতীয় সঙ্গীত। এমন কি যে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কংগ্রেস দেশবাসীকে করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক—সেই 'বন্দেমাতরম্' মহামন্ত্রের উদ্গাতাও বাঙ্গালী, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, দেশ-মাতৃকার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে ঐতিহাসিক বাণী বিতরণ করেছিলেন—তাতে বাংলা বা বাঙ্গালীর কল্যাণের কথাই শুধু ছিল না—ছিল সমগ্র ভারতের কল্যাণকর বাণী :

—হে ভারত ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ . . .

যে নেতাজী সুভাষের কাছ থেকে পাওয়া কথা "জয়হিন্দ্" আমাদের জাতীয় সম্ভাষণ-বাণী, সেটাও বাংলার বা বাঙ্গালীর স্বার্থের কথা ভেবে উচ্চারিত হয়নি। হয়েছিল ভারত-কল্যাণ কামনা করেই। বিশ্বের দরবারে যে বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন ভারতবাণী রূপে বঙ্গ ভাষাভাষী ভারতীয় নোবেল কবি—সেখানেও প্রাদেশিক চিন্তার সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তাতেও সমগ্র ভারতের মহামানবের সাগর তীরেই কবি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছিলেন—

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ॥"

সুতরাং বাঙ্গালী যদি কোন কিছুর জন্য গর্ব করে, সে গর্ব তার সংস্কৃতিকে নিয়ে, তার অনুধ্যান নিয়ে, তার চিন্তার পর্যাপ্ততা নিয়ে, তার মনীষার স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে, ভারতীয় জাতির জন্য স্বার্থত্যাগের স্বর্ণকথা নিয়ে আর ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে। যে ভাষার জানালা পথে ভারতবর্ষ গীতাঞ্জলির গীতে পেয়েছে নোবেল প্রাইজ—ভারতীয় তথা বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন বিশ্বকবি—পেয়েছেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাই সে ভাষার কথায় আমরা—ভারতীয় বাঙ্গালীরা গর্ব করে বলি ঃ

"মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাঙলা ভাষা।"

পণ্ডিত নেহ্‌রু, তোমাকে আমি কোনদিনই সামান্য একজন পলিটিশিয়ান বা কূটনীতিক ভাবি নে। যে কূটনীতিক আজ ভারতের পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে ছিটোনো ছড়ানো। যাদের দৃষ্টিতে আমাদের জীবনের সবটুকুই শুধুমাত্র পলিটিক্স। একজন সাধারণ পলিটিশিয়ান হিসেবে তোমাকে জনগণ ভাবে না বলেই স্বাধীন ভারতের ভাগ্য নিয়ে তুমি একটার পর একটা ভুল করে গেলেও ভারতবাসী সে ভুলের খেসারৎ দিয়েছে, দিচ্ছে, দিতে থাকবে। একজন সাধারণ পলিটিশিয়ানের জন্য এতটা ত্যাগ কোন দেশ করে না, কোন জাতি করে না, করতে পারে না। তোমায় প্রিয় নেতার আসনে বসিয়েছে বলেই তোমার ভুলভ্রান্তি জাতি ভুলতে চেয়েছে—ভুলতে চেয়েছে তোমাকে সম্মান শিখরে ওঠার পথ কণ্টকশূন্য করবে বলেই। তা ছাড়া জাতির বড় বিশ্বাস ছিল, তোমার ওপর, তুমি মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্য বলে—তিনি তোমায় 'খাঁটী-জওহর' বলেছিলেন বলে।

গৌহাটী। আসামের বিশ্ববিদ্যালয় শহর। কামরূপ জেলার সদর ও বন্দর। কয়েকদিন ধরে অসমীয়া ভাষাকে আসাম রাজ্যের একমাত্র সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করানোর জন্য রাজনৈতিক নেতৃমহলে জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। এখানে ওখানে নেতারা মিলিত হয়ে উপনেতা ও কর্মীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ চালাচ্ছেন তখন কিভাবে চালিহা সরকারকে দিয়ে অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারী ভাষারূপে কবুল করানো যায়। এইজন্য তথাকথিত নেতারা মিটিং করে জোরালো বক্তৃতা চালাচ্ছেন অসমীয়া ভাষার সমর্থনে। তাঁদের উত্তেজিত বক্তৃতায়—অসমীয়া ভাষার প্রশ্ন বানের জলের কুটোর মত কোথায় ভেসে গিয়ে যে কথা শ্রোতাদের মনে স্পষ্ট গভীর ছাপ ফেলছে তা হ'ল আসাম উপত্যকার যা কিছু অভাব অভিযোগ অনটন—অসচ্ছলতা সব কিছুর মূলে হ'ল বাংলা-ভাষাভাষীরা। যারা শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, মনীষায় সর্বক্ষেত্রেই অসমীয়াদের পরাভূত ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে। আসামের কলেজগুলোর ফল দেখলেই এ কথা স্পষ্ট হয় যে বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীরাই বেশীর ভাগ উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি দখল করে নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে মেধা ও বুদ্ধিবলে বাঙালীরাই অধিষ্ঠিত হচ্ছে, ইণ্ডিয়ান রিফাইনারির বড় বড় 'কী পোষ্ট'গুলো দখল করে আছে যারা তারা বাঙ্গালী। আসামের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া রেলশাখার বাঙ্গালী কর্মীদের সংখ্যাধিক্য নজরে পড়ে। সুতরাং 'বঙ্গাল বেঙ্গলীদের খেদাও'।

লেডিজ হোষ্টেল। বড় বড় আলো-হাওয়া বওয়া সারি সারি ঘর। প্রতিটি ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত দূরত্ব রেখে চারটে করে খাট। প্রতিটি খাটের সন্নিহিত দেয়ালে একটি করে দেয়াল আলমারি, মাথার কাছে প্রত্যেকের জন্য একটি করে মিটসেফ। প্রতিটি খাটের সংলগ্ন একটা করে ডেস্কটেব্‌ল। দু'টি সীট পিছু একটি করে ছোট টিপয়এ বসানো জলের কুঁজো। প্রতি তলার প্রতি ঘরেই এই ব্যবস্থা। তিনটি ঘর পিছু একজন করে ঝি। তারাই ফাইফরমাস খাটে দিদিমণিদের। আর এক এক তলায় তিনটে করে বাথরুম-ল্যাভেটারী।

উঁচু দেওয়ালে হোষ্টেল কম্পাউণ্ড ঘেরা। মেয়েদের আব্রু রক্ষার পক্ষে যা প্রয়োজনীয়। এছাড়া আছে ছোটখাটো একটা খেলার মাঠ—বাস্কেট, টেনিকোয়েট, ব্যাডমিণ্টনের নেট টাঙ্গানো হয় বিকালে। দলে দলে তরুণীরা খেলায় মাতে প্রভূত প্রাণ-চাঞ্চল্যে। কম্পাউণ্ডের মাঝের বাতাসে ভেসে বেড়ায় ওদের কত কথা, কত হাসি কত গান। আর ওরা যখন মিলিত হয় 'রিডিং রুমে' তখন সে ঘর ওদের কলকাকলিতে হয়ে ওঠে মুখর। রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে আধুনিক নারী ও পুরুষের ফ্যাসান ও চিত্রতারকা প্রসঙ্গে নানা বিষয়েই ওদের আলোচনার ঝড় বয়ে যায়।

ভোর হ'ল। ঘুমন্ত হোষ্টেলবাড়ী জেগে উঠল। মেখলা পরা মেয়েরা এ ঘর সে ঘর থেকে মুখে টুথব্রাস, হাতে তোয়ালে বা গামছা নিয়ে ছুটলো বাথরুমের দিকে। সবার আগে রোজকার মত 'রুম নম্বর টেন'-এর দরজাই যে খুলেছিল আজও, তা লক্ষ্য করেছিল ন-দশ-এগারো নম্বর কামরা-জোটের ঝি সুরতিয়া। তারপর বারান্দার পাতাবাহারের টবগুলোর গা ও রেলিং মুছতে মুছতে দেখেছিল খোলা দরজায় যাকে বেরুতে সে শিবানী দিদিমণি। তার পরণে কোনদিনই সুরতিয়া অন্যান্য অসমীয়া মেয়েদের মত চাদর-মেখলা দেখেনি। দেখেছে এই মেয়েটিকে ঠিক তার মত

শাড়ি পরতে। অবশ্য তার মত বাঁ দিক দিয়ে আঁচলটা ঘুরিয়ে কাঁধে তোলে না শিবানী দিদিমণি। ঠিক আর আর বাঙ্গালী দিদিমণিদের মতই নিখুঁত ভাবে গাছ কোমরে শাড়ি জড়িয়ে চলাফেরা করে সে। লেখাপড়ায় শিবানী দিদিমণি সবারই প্রশংসা আদায় করে প্রতিবারের পরীক্ষায়। এ কথা হোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রাসভারি ললিতা বরা থেকে মেয়েদের সবাই স্বীকার করে। তা ছাড়া শিবানীর মত দুধে আলতায় মেশান রং, টিকোলো নাক, টানা চোখের মেয়ে অসমীয়া মেয়েদের মধ্যে নেই বললেই চলে। কথাবার্তায়ও বাংলাই বেশী চালায় শিবানী। তাই তাকে প্রথম দর্শনে সবাই বাঙ্গালী মেয়ে বলে ভুল করে। কেবল যা পুরো নাম শিবানী বড়-গোঁহাই বললে লোকে বুঝতে পারে যে এ মেয়ে বাঙ্গালিনী নয়, অসমীয়া মেয়ে—যাদের জাতীয় পোষাক হ'ল মেখলা।

শিবানী বাথরুমে যাবার পথে সুরতিয়ার কাছাকাছি আসতে ও মুখ তুলে প্রাতর্বাক্য বলে শুধায়ঃ

—দিদিমণি, আপনার চা দিতে বলব ক্যান্টিনে?

—বল্। আর দেখ, লাইব্রেরীতে খবরের কাগজ এসেছে?

—হ্যাঁ, দেখলাম ক্রিং ক্রিং ঘণ্টি বাজিয়ে খবর কাগজবালা ত আসিয়ে গেল।

—তবে আমার জন্য চা আর দু'টো টোষ্ট নিয়ে রিডিংরুমে আয়, কেমন?

—আচ্ছা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিবানী প্রাতঃকৃত্য সেরে চলে এলো 'রিডিং রুমে।' সেখানে তখন আরও তিন চারজন মেয়ে এসে গেছে। ওদের হাতে হাতে ভাগ করে নেওয়া স্থানীয় খবরের কাগজের সীট। শিবানীকে দেখেই অসমীয়া মেয়ে শান্তি ফুকন ফোড়ন কাটেঃ

—শিবানী দি, অসমত অসমীয়া ভাষা রাজ্যভাষা হবলাগে, এই কথা অসমত বাস করা হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বিহারী, নেপালী আদি সকলোয়ে মানি লইছে আর স্বীকার করিছে—মাত্র কাচার জিলাত বাস করা বেঙ্গলী সকলে ইয়াত বিরোধিতা করিছে কিয় ?

প্রশ্নটা শুনে শিবানীর কপালে চিন্তার কুঞ্চন রেখা পড়ল। কেননা সে জানে তার সঙ্গে শান্তি কখনও অসমীয়া ভাষায় কথা বলে না। তা ছাড়া এখানকার সব অসমীয়া মেয়েই চমৎকার বাংলা বলতে পারে আঞ্চলিক টানসহ। মনে মনে বুঝল নেতাদের উস্কানি কি ভাবে সাধারণ মানুষের মনে ক্রিয়া করছে। মুখে হাসি টেনে বলল ঃ

—শান্তি, এ বিচার নেতারাই করুন ভাই, আমরা সাধারণ মানুষ ; আমাদের ওসবে জড়িয়ে না পড়াই ভাল। তা ছাড়া রাজ্যের সরকারী ভাষা কি হবে না হবে—মুখ্যমন্ত্রী চালিহার সঙ্গে সকল পার্টির এম, এল, এ, এম, এল সি-রা বসেই ঠিক করতে পারেন। কেননা যা কিছু বিল .....

শান্তি শিবানীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই উত্তেজিত ভাবে বলে ঃ

—কিন্তু তুমি জান না শিবানীদি, বেঙ্গলী লোক অসমত অসমীয়া ভাষা যাতে না হয় সে জন্য আন্দোলন করিছে।

শিবানী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলে ঃ

—আন্দোলন ত' করবেই ভাই, এ দেশে যে গণ-তান্ত্রিক শাসন। এখানে সবারই সব দাবী জানাবার অধিকার আছে। তা ছাড়া একটা শিশুও চিৎকার করে তার দাবী জানায় মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আর যে ভাষায় কথা বলা লক্ষ লক্ষ অসমীয়া লোক থাকে এখানে তারা তাদের দাবী জানাবে না কেন।

—দাবী জানাক, জানালে এই যে এই রকম উচিত শিক্ষা পাবে।

বলে জ্ঞানদা দাশ হাতের কাগজের একটা খবর দেখিয়ে দেয় শিবানীকে। শিবানী চোখ বুলাতে যায়, এমন সময় সুরতিয়া তার চা ও টোষ্ট সহ প্রবেশ করে। শান্তির সামনে ধূমায়িত চা ও টোষ্টের প্লেট রেখে ও প্রস্থানোদ্যতা হ'লে আর একজন মেয়ে বলে :

—আমার একটা চা এনে দাও ত' সুরতিয়া ?

—এখন লারবো দিদিমণি—ঘর, বারাণ্ডা সব ঝাড়ু দিতে বাকী আছে।

—আহা, শ্রান্তি দি ডাকলে ত' বেশ সুড়ুৎ করে চলে আস ?

—দেখ দিদিমণি, হামাকে ঘাটাবেনি বলে দিচ্ছি। কিসে আর কিসে—শ্রান্তি দিদিমণির মত হোবে, তারপর বলো।

—আঃ সুরতিয়া, তোর কাজে যা ত ? এই যে রেখা, এই চাটা নাও তুমি ভাই।

রেখা কোন রকম সৌজন্য প্রকাশ না ক'রে চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে তাতে ঠোঁট লাগায়। সুরতিয়া প্রস্থান করে। শিবানী টোষ্ট দাঁতে কাটতে কাটতে খবরের কাগজে চোখ বুলায়—সংবাদটায় দেখা যায় পঁচিশ তিরিশ জন লোকের এক জনতা বাঙ্গালী মণিহারী দোকানের মালিককে বাংলায় লেখা সাইন বোর্ড অপসারিত করতে বলে ব্যর্থ হয়ে তাকে তাড়া করে। ভীতসন্ত্রস্ত লোকটি পাশের এক বাড়ীতে আশ্রয় নিলে সে বাড়ীর উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা ঢিল ছুঁড়তে থাকে। এছাড়া আরও ছ'জন লোককেও জনতা নিগৃহীত করে। শিবানী সংবাদটা পড়ে শেষ করতে না করতেই সুরতিয়া আর এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে শিবানীর সামনে টেবিলে রেখে মুখ ঝামটা দিয়ে রেখাকে বলল :

—চা ত পিয়ে লিচ্ছ, রেখা দিদিমণি, ক্যান্টিনে তুম্‌হার নামে লিখিয়ে দিয়েছি, হাঁ।

কথাটা বলেই মুখভঙ্গী করে সুরতিয়া চলে গেল। মেয়েরা তার সে ভঙ্গী দেখে জলতরঙ্গের মত হেসে উঠল। সুরতিয়ার

এরূপ ব্যবহার মাঝে মধ্যে ওদের সইতে হয়। কেননা, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ললিতা বরা— সুরতিয়ার রিপোর্টকে বেশ গুরুত্ব দেয়।

—কি শান্তি দি', পড়লে ত। কাল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভায় রিজোলিউশন পাশ করা হয়েছে—বেঙ্গলী ভাষার বিরুদ্ধে অসমীয়া ছাত্রছাত্রীদের সর্বস্ব পণ করে আন্দোলন করতে হবে।

—কাজটা খুব ভাল হবে না ভাই। আসামে যে সকল বাংলা ভাষী লোকেরা বাস করছে তারাও ত' অসমীয়াই।

—একথা ভুল, আসামের নেতা বরদলুই বলেছিলেন Assam for Assamese.

—কিন্তু জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তার প্রতিবাদ করেছিলেন। আর সাবধান-বাণীতে বলেছিলেন—এরকম মনোভাব হ'লে ভাষার প্রশ্নে ভারত আবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

—আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নেব কেন— আসামের ভাল-মন্দই শুধু ভাবতে পারি আমরা—সমগ্র ভারত নিয়ে ভাববে দিল্লীর নেতারা।

বিজ্ঞের মত বলে জ্ঞানদা।

বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে সাতটা বাজতেই মেয়েরা উঠে পড়ে যে যার ঘরের দিকে চলে গেল দ্রুত পায়ে। কেননা ভোর সাতটা পর্যন্ত রিডিং রুমে কাগজ পড়তে পারে, তারপর পড়ার বই নিয়ে বসবার কড়া হুকুম আছে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ললিতা বরার।

ওরা চলে গেলে হঠাৎ শিবানীর দৃষ্টি পড়ল বাংলাভাষী অদ্ভুত মেধাবতী মেয়ে সহপাঠিনী ষোড়শী মধুছন্দার ওপর। ওর চোখ-দুটো তখন জল-ছল-ছল। শিবানীর দিকে চেয়ে বলল :

—শিবানী দি, কি হবে?

—ভয় কি ছন্দা, আমি ত আছি। ওরা অমন বলেই থাকে। এটা কি মগের মুল্লুক নাকি, যা খুশী তাই করলেই হ'ল?

কথা শেষ করে শিবানী নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে মধুছন্দার চোখ মুছিয়ে দিয়ে আবার বলল :

—অত ভেঙ্গে পড়তে নেই, মনকে শক্ত কর। ভয় পেলেই ভয়।

কলেজে গিয়েও শিবানী দেখল ক্লাশের মেয়েদের কিছু সংখ্যকের মধ্যে রাজ্য ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলছে। আবার কোন কোন অসমীয়া ছাত্রী তাদের বাংলা ভাষী বন্ধুদের প্রবোধ দিচ্ছে, অভয় দিচ্ছে। কিন্তু সে আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারে না আসামবাসী বাংলাভাষী মেয়েরা। ভেবে পায় না কি সে কারণ যার জন্য রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে তাদের অসমীয়া ভাষী সহ-পাঠিনীদের মনোভাব। কোথায় গলদ, কোথায় ত্রুটি তাদের, কি অপরাধ ওদের—শুধুমাত্র বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষায় ওরা আস্থাশীল বলেই কি ওরা অপরাধী হয়ে গেল। এই কি ন্যায়, এই কি নীতি, এই কি বিচার?

অধ্যাপক ক্লাশে আসতে মেয়েদের কলগুঞ্জন শান্ত হল। রোলকল সেরে সুরু করলেন তিনি লেকচার। মেয়েরা শুনতে লাগল সমনযোগে। কিন্তু কোন কোন মেয়ে অধ্যাপকের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করেও সাম্প্রতিক ভাষা সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা অনুচ্চ স্বরে চালিয়েই যেতে লাগল।

এক সময় ক্লাশের মেয়েরা দোরের দিকে চেয়ে দেখল পাঁচ ছ'জন অচেনা মেয়ে ক্লাশ রুমের সামনে এসে জটলা করছে। তাদের মধ্যে একজন অধ্যাপকের উদ্দেশ্যে শুধায়:

—মে উই কাম ইন স্যার?

প্রশ্ন করে উত্তরের অপেক্ষায় না দাঁড়িয়েই মেয়েরা দলবদ্ধভাবে ক্লাশে ঢুকে পড়ল। অধ্যাপক তাদের এ আচরণে কিছুটা বিব্রতবোধ

করলেও কোন রকম আপত্তি জানালেন না। মেয়েরা ভেতরে এলে তাদের একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমিতির ও আসাম ভাষা সংরক্ষণ উপসমিতির সহযোগী সম্পাদিকাকে পরিচয় করিয়ে দেয় মেয়েদের সঙ্গে। এরপর সহযোগী সম্পাদিকা উত্তেজিত কণ্ঠে যা বলল তাতে প্রকাশ পেল যে কাছাড়বাসী বাঙ্গালীদের চক্রান্তে এবং বাঙ্গালী ঘেঁষা চালিহা মন্ত্রীসভার ক্লীবতায় আসাম রাজ্যে অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা করা যাচ্ছে না। এজন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। তাই আজ বিকালে 'গুয়াহাটী' বিশ্ববিদ্যালয় লনে একটি ছাত্র সভা আহ্বান করা হয়েছে। এই সভায় প্রত্যেক অসমীয়া ছাত্রছাত্রীর যোগদান করা ও ভাষার প্রশ্নটিতে ছাত্র সম্প্রদায়ের ইতিকর্তব্য স্থির করায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তাই সহ-সম্পাদিকা আশা প্রকাশ করলে যে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর প্রত্যেক অসমীয়া ছাত্রীই যেন বিকাল চারটেয় বিশ্ববিদ্যালয় লনে আজকের মহতী ছাত্র জনসভায় সমবেত হয়। এছাড়া সম্পাদিকা আরও আবেদন জানালে যে এতদিন অসমীয়া মেয়েরা বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রায়ই শাড়ি পরে এসেছে কিন্তু এখন থেকে প্রত্যেক অসমীয়া মেয়েকেই শাড়ি ছেড়ে মেখলা-চাদর পরতে হবে। কেননা মেখলা-চাদরই আসামের জাতীয় পোষাক; এ কথাটা যেন অসমীয়া ছাত্রীরা সর্বদা মেয়েদের স্মরণ রাখে।

কথা শেষ করে সঙ্গিনীদের নিয়ে চলে গেল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমিতির সহ-সম্পাদিকা। মেয়েরা অধ্যাপকের উপস্থিতিতেই ছাত্র সমিতির ফতোয়া সম্পর্কে আলোচনায় লেগে গেল দেখে অধ্যাপক— 'ওয়েল, ওয়েল' বলে তাদের তাঁর লেকচারের দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা পেলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হল না। ক্লাস মনিটর জুলেখা খাতুন সহসা উত্তেজিতভাবে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল :

—অসমীয়া ভাষার প্রশ্নে অসমীয়া ছাত্র-ছাত্রীসমাজের মন

বিক্ষিপ্ত—সুতরাং আজকের মত ক্লাশ না নিলে ছাত্রীরা খুশী হবে, স্যার।

জুলেখার কথা শুনে একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন সিভিক্স-এর অধ্যাপক জয়ন্ত সান্যাল। মনে মনে আহতও হলেন। নিজেকে অপমানিত মনে করলেন এবং পরক্ষণেই এ্যাটেণ্ডান্স বুক ও বইগুলি গুছিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে ক্লাশ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন। কিন্তু তিনি ক্লাশের দরজা পেরুতে না পেরুতেই অসমীয়া মেয়েদের অনেকেই বাঙ্গালী বলে তাঁর প্রতি উপেক্ষার সমবেত হাসি হেসে উঠল। কেউ কেউ ডেস্কের ওপর বই পিটাতেও লাগলো। আর পরক্ষণেই যার যার সামনের বইখাতাগুলো হাতে তুলে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল ক্লাশ থেকে।

ওরা বেরিয়ে গেলে দেখা গেল ওদের সঙ্গে যারা যায় নি—তাদের মধ্যে শিবানী এবং আর দু'জন অসমীয়া মেয়ে এবং মধুছন্দা ও আরও ক'জন বাংলা ভাষী মেয়ে অধোবদনে বসে। সবারই মুখ থম্‌থমে। শিবানী অপাঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখে ওদের মুখ। মনে মনে ওর নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। একই দেশের মানুষ, একই আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা মানুষ—তারা কিভাবে যে পরস্পর শত্রু হয়ে পড়ে। আশ্চর্য!

পলিটিক্স—রাজনৈতিক নেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে বাজিমাৎ করবার কি কুটিল চক্রান্ত। ও ভেবে স্থির করে ওর প্রাথমিক কর্তব্য হ'ল ওদের সাহস দেওয়া, সহানুভূতি জানানো। শিবানী ওর জায়গা ছেড়ে উঠে এগিয়ে যায় মধুছন্দার কাছে। পাশে দাঁড়িয়ে ওর পিঠে সান্ত্বনার হাত রাখতেই সে 'শিবানী দি' বলে সোচ্ছ্বাস কান্নায় দু'হাতে মুখ ঢাকে।

—দেখ ছেলেমানুষী! কি হয়েছে যে অমন ভেঙ্গে পড়ছ তুমি? কৃত্রিম হাসি হেসে বলে শিবানী।

—ওরা যে পথে ঘাটে আমাদের টিটকিরি দিচ্ছে শিবানী দি।

অলকা ঘোষ তার সীট থেকে বইগুলো হাতে তুলে নিয়ে শিবানীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে।

—অলকা, ওরা জানে না ওরা কি ভুল করছে। ওরা বলছে তোদের 'বঙ্গাল', মানে তোরা বিদেশী, কিন্তু সত্যিই কি তাই? ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ক'জন এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা? বেশীই ত ঐ বাংলা থেকেই আসা। তাছাড়া আমাদের এ রাজ্যের অধিবাসীদের শিক্ষায় দীক্ষায় বড় করে তুলবার অনুপ্রেরণা দিয়েছে কে? তোদের বাঙ্গালীদের পূর্বপুরুষরাই। তাই তোদের প্রতি এই অন্যায় ব্যবহার কোন প্রকৃত দেশপ্রেমিক অসমীয়াই সমর্থন করতে পারে না। অন্ততঃ সমর্থন করা উচিত নয়।

আর দু'জন অসমীয়া মেয়ে, রঞ্জিতা মেধি ও লক্ষ্মী গোঁহাই এগিয়ে আসে ওদের কাছে। ওরাও সমর্থন করে শিবানীর কথা।

—তুমি ঠিকই বলেছ শিবানীদি। এ অন্যায়, এ ভারি বিশ্রী।

—কিন্তু আমার বড় ভয় করছে, যদি আমায় রাস্তায় একা পেয়ে কিছু বলে ওরা। বড় রাস্তা দিয়েই ত আমায় যেতে হবে।

চিন্তিত স্বরে বলে অলকা।

—চল্ দিকিনি, তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি, তোদের শিবানীদি সঙ্গে থাকতে কারও সাধ্যি নেই কিছু করে।

অতঃপর শিবানীর দৃপ্ত আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে হাণ্ডিকুই কলেজের দু'জন বাঙ্গালী ও তিনজন অসমীয়া মেয়ে একজোট হ'য়ে কলেজ কম্পাউণ্ড ছেড়ে পথে নামে।

খানিকটা এগোতেই ওদের মনে হয় গৌহাটী শহরের জনবহুল পথ যেন এ নয়। চারদিকে কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব। ত্রাসের সুস্পষ্ট চিহ্ন। বাঙ্গালী মেয়েরা শঙ্কিত মনে এগোতে থাকে।

—আয় আমি দু'গজ রিবন কিনবো।

বড় ষ্টেশনারী দোকানটার সামনে এসে বলে শিবানী। ওদের পরিচিত দোকানটার সবগুলো ভাজ-দরজা আজ খোলা নেই। মাত্র একটা দরজাই একটু যা খোলা। ওরা ভেতরে ঢুকতেই মালিক সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে ঃ

—বলুন দিদিমণি, কি দেব ?

—বিশেষ কিছু নয়, দু'গজ নাইলনের রিবন।

বলে শিবানী।

দোকানদার নানা রঙের নানা ধাঁচের জিনিস বের করে দেয়। মেয়েরা তার ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে পছন্দ করতে। এমন সময় দূর থেকে বহু লোকের শ্লোগান ভেসে আসে। দোকানের মালিকের ছেলে সন্ত্রস্ত হ'য়ে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এসে বাবার কানে কানে কি যেন বলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখভাবে আসে পরিবর্তন, হাসি-হাসি ভাবটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে ধারণ করে পাংশু ভাব। বিব্রত স্বরে সে শিবানীকে বলে ঃ

—দিদিমণিরা যদি কিছু মনে না করেন, সামনেব ঝাঁপটা বন্ধ করে দেব ?

—কেন বলুন ত' ?

—সবই কপাল দিদিমণি। ভারতের স্বাধীনতার বলি হ'য়ে বড় আশা নিয়ে পাকিস্তানে সব ফেলে চলে এলাম ভারতে—এই আসামে। কিন্তু আজ ক'দিন থেকে এখানকার লোকেরা কতভাবে যে শাসাচ্ছে দিদিমণি। বলে আমরা নাকি বঙ্গাল—আমরা নাকি বিদেশী। আপনিই বলেন দিদিমণি—আমরা যদি ভারতে বিদেশীই হব তবে কি সাতপুরুষের জমিজমা বিষয়-আশয় ছেড়ে চলে আসি ?

—আপনি মিছেই ভয় পাচ্ছেন, আমিও ত' আসামেরই মেয়ে—আমি বলছি—ওরা কিছু করতে পারবে না। ভয় পাবেন কেন ? ভারতের মাটিতে আমার মতই আপনারও অধিকার আছে বাস করবার—এ আমার মত আপনারও দেশের মাটি।

ততক্ষণে মিছিল আরও অনেকটা এগিয়ে এসেছে। মালিকের ছেলে দরজা বন্ধ করতে গেলে শিবানী তাকে সরিয়ে দিয়ে উদ্ভাসিতা হ'য়ে আত্ম-বিশ্বাসের ভঙ্গীতে দরজা আগলে দাঁড়ায়। দৃপ্ত স্বরে বলে ঃ

—আমি আসামেরই মেয়ে—আপনার দোকানের ক্ষতি করতে হলে আমার দেহে প্রাণ থাকতে বাধা পাবে। আপনাকে ঝাঁপ বন্ধ করতে দেব না আমি।

শিবানীর কথা ছাপিয়ে বহু কণ্ঠের ক্রুদ্ধ চীৎকার স্পষ্ট হতে ক্রমে স্পষ্টতর হয়। শোনা যায় ওদের শ্লোগান ঃ

—বঙ্গালীর ভাষা
ছাগলীর ভাষা।
অসমত অসমীয়া ভাষা রাজ্য ভাষা
হব লাগে! হব লাগে!

মধুছন্দা ও অলকা ভীত চকিতা হরিণীর মত কাউণ্টারের ভেতরের দিকটায় গিয়ে দাঁড়ালো।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল এটা। ক্রমে ক্রমে ওরা দোকানের কাছে এলো—এগিয়ে চলল ওরা শ্লোগান সহ ঊর্দ্ধে বদ্ধমুষ্ঠি আস্ফালন করতে করতে।

মিছিল চলে গেলে শিবানী ভেতরে এলো। রিবন পছন্দ করে নিয়ে আবার পথে নামল বান্ধবীদের নিয়ে। চোখে মুখে তার সঙ্কল্পের দ্যুতি। পথে নেমে একটু এগোতে না এগোতে মধুছন্দা কুণ্ঠিত ভীত স্বরে বলে ঃ

—শিবানীদি, ওরা যদি আমাদের—

—আঃ ছন্দা, অত ভয় পেওনা, ভারতীয় মেয়েরা শুধুমাত্র অবলা নয়—শক্তির আধার তারা, মনে সাহস আনো। ভয় পেলেই ভয় বাড়ে।

বলতে বলতে শক্ত হাতে মধুছন্দার হাত ধরে এগিয়ে চলে শিবানী দৃঢ় পদক্ষেপে।

ওরা যখন পথ দিয়ে এগুচ্ছিল তখন রাস্তায় এখানে ওখানে অসমীয়া ছাত্রদের জটলা। সমবেত কলকোলাহলে চারিদিকের আবহাওয়া অশান্ত, উত্তপ্ত। ঝালুকবাড়ির দিক থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসে একটা লরী। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কোন ছাত্রনেতা মুখের চোঙে তখন অসমীয়া ভাষার সমর্থনে ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে জোরালো চলমান বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। লরীটা ওদের পাশ দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে যেতে মধুছন্দা শিবানীর গায়ে আরও ঘন হয়ে এসে পথ চলে। শিবানী বোঝে, তার আশ্বাসেও আশ্বস্ত হ'তে পারছে না ছন্দা। চোখেমুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। হয়তো ওর অবস্থায় পড়লে সে নিজেও পারত না মনের স্থৈর্য বজায় রাখতে।

ওরা তখন অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। এমন সময় ওদের পাশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে চলে যায় কলকাতা থেকে বিমানে আসা বাংলা সংবাদপত্রের একটি ভ্যান।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ওদের কানে আসে ক্রুদ্ধ জনতার প্রচণ্ড কোলাহল। সভয়ে পাঁচটি মেয়ে পেছনে ফিরে ভীত দৃষ্টিতে দেখে কিছুদূর এগোতে না এগোতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পত্রিকা ভ্যানটিকে ঘিরে ধরেছে। বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ ছিটিয়ে ছড়িয়ে একাকার করছে। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একদল লাঠিধারী গুণ্ডা প্রচণ্ড বিক্রমে রাস্তার দু'দিকের দোকানগুলোর বাংলা সাইন বোর্ড নিদারুণ আক্রোশে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে দুমড়ে মুচড়ে একাকার ক'রে দিতে শুরু করেছে।

পথচলা শিবানীদের আশপাশের দোকানদাররাও ভীত-সন্ত্রস্ত হ'য়ে চটপট দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে তাতে। হাঙ্গামার কাছ থেকে সোডার বোতল বা বোমা জাতীয় পটকার বিস্ফোরণ-শব্দ

বায়ু বাহিত হয়ে ভেসে এসে ওদের নারীমন আরও ভয়াতুর করে তোলে। অলকা ওদের বাড়ীতে ঢুকে যায়।

—কি হবে শিবানীদি ?

ফেরার পথে শিবানীর ডান হাতটা চেপে ধ'রে ভয়ে কাঁপা স্বরে বলে মধুছন্দা।

—কিচ্ছু হবেনা, ভয় কি, আমি ত' সঙ্গে আছি। চল্ চল্ তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে চল্।

ওরা পড়ি কি মরি করে এগিয়ে চলে পথ বেয়ে। গুয়াহাটী শহরের রাস্তায় সাধারণ লোকজন বিশেষ নেই বললেই চলে—কিন্তু তার মধ্যেই বিশৃঙ্খল। আর দু'ফার্লং এগুলেই ওদের হোষ্টেল। ওদের গতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই হল্লার শব্দটা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। ওরা শেষ পর্যন্ত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে হোষ্টেলের তালাবদ্ধ মেইন গেটে এসে ভীতচকিত সমবেত কণ্ঠে দরোয়ান কিষেণজিতের নাম ধ'রে ডাকতে লাগ্ল। কিষেণজিৎ ওধারে বোধহয় কাছে পিঠেই ছিল, তাই দ্রুত হাতে খুলে দিল বদ্ধ দরজার অর্গল। মধুছন্দা দরজা ঠেলে ত্রস্তে সবার আগে ঢুকতে চেষ্টা করতে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মুখথুবড়ে। শিবানী মুহূর্তে ছোঁ মেরে ওকে তুলে নিল। কিন্তু কপালটা ওর কেটে গেছে ততক্ষণে। শুধু ওরই নয়—অসমীয়া বাঙ্গালীদেরও কপাল বুঝি। শিবানী ওকে 'ফাষ্ট এইড' দেবার জন্যে ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল ষ্টোর রুমের দিকে—যেখানে হোষ্টেলের ফাষ্ট-এইড বক্সটা থাকে।

পণ্ডিত নেহ্‌রু তুমি ভুল করছ! আমি পলিটিশিয়ান নই—রাজনীতি আমার পেশা নয়—ভারতের প্রধান মন্ত্রী ত দূরের কথা সামান্য এম, এল, এ বা করপোরেশনের কাউন্সিলার হতে গেলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যতটুকু কদর্য ও কপটভাবে রাজনীতির দাবা-বোড়ে চালতে হয় ততটুকু করতেও আমি ঘৃণা বোধ করি। তাই আমি যা বলছি ভারতের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেই বলছি। যে নাগরিক ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ নিয়ে, তার ভাল মন্দ নিয়ে তার ছোট্ট মনের পরিধিতে চিন্তা করে, ভাবনা করে। ঠিক সেই ভাবনা বা চিন্তার মাধ্যমেই আমি এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে তুমি ভুল করছ। হয়তো সব ভুলের জন্য তুমি দায়ী নও। হয়তো তোমার বিচারশক্তির কোন ছোট্ট ফাটল দিয়ে ঐ ভুল এসে সত্যের মত প্রকট হয়ে তোমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে, করছে। তবু ভুল ভুলই।

মনে কর না পাক হানাদারদের নৃশংস অত্যাচারে লাঞ্ছিত প্রকৃতির লীলানিকেতন ভূস্বর্গ কাশ্মীর উপত্যকার কথা। যেখানে ভারতীয় সেনা বাহিনীর দুর্মদ জওয়ানরা, বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিদেশী শত্রুর ওপর। পলায়নপর শেয়ালের মত তারা পালাচ্ছে—পাকিস্তানের দিকে। বিজয়লক্ষ্মী যখন বরমাল্য নিয়ে স্মিতমুখে আমাদের জওয়ানদের ললাটে জয়টিকা আঁকতে এগিয়ে আসছেন, ঠিক সেই জয়-পরাজয়ের সন্ধিক্ষণটিতে আমাদের সেনা-বাহিনীকে তুমি বললে ঃ

—থামো।

থামলো যুদ্ধ—'শান্তির সোনার হরিণ' পাবার আশায় তুমি গেলে রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারস্থ হ'তে। তোমার বোগলের এক্সটারন্যাল পোর্টফলিও যে সব জঁাদরেল অফিসারের হাতে, তারা ভুল ধারায় রাষ্ট্রপুঞ্জে জানালো নালিশ—যে ভুলের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের নালিশ কোনদিনই কল্কে পাচ্ছে না।

তারপর? তারপরের ইতিহাস কাশ্মীরকে উপলক্ষ করে—ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের খেসারতের পর খেসারত দেবার ইতিহাস। কিন্তু জাতির তখনও আশা ছিল তোমার ওপর, আস্থা ছিল তোমার নেতৃত্বের ওপর। অবশ্য আমি তাঁদের কথাই বলছি, এদেশের নাগরিকদের যারা পলিটিক্যাল কন্সাস। রাজনীতি-অজ্ঞ অগণিত জনতা তোমায় মহাত্মার মন্ত্রশিষ্য হিসেবে প্রণাম ঠুকলো, জানালো শ্রদ্ধা—তার মূল্য আমি দিই না—কেননা 'মূর্খের স্বর্গে সবই সম্ভব।' কিন্তু জ্ঞানী-গুণীদের যে বিচার, যে সিদ্ধান্ত, তার প্রতি তোমারও নিশ্চয়ই আস্থা আছে, আছে বিশ্বাস। অন্ততঃ থাকা উচিত। তাই তাদের কথা, তাদের সমালোচনা সহ্য করতে পার আর না পার, শুনতে হবে—কেননা তুমি গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধান মন্ত্রী। তোমার নিজের মর্জি সবার মর্জি নাও হতে পারে। আর যদি তোমার মর্জি সবার মর্জি বলে চালানো হয় তবে গণতন্ত্রের টুটি টিপে মারা ছাড়া আর কিছু হবে না।

মধুছন্দাকে "ফার্ষ্ট এইড" দিয়ে ওকে ওর ঘরে পৌঁছে দিল শিবানী। নিজের কামরায় ফিরে আসতে না আসতেই ওর কানে এল হোষ্টেলের গেট থেকে প্রচণ্ড সোরগোলের শব্দ। পরক্ষণেই উত্তেজিত পদসঞ্চারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটি দল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল হোষ্টেল কম্পাউণ্ডে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ইতস্ততঃ কামরায় কামরায় গিয়ে শাসাতে লাগল। শাড়ি পরা বাঙালী মেয়েদের ফতোয়া দিল—আসামে থাকতে হলে তাদের শাড়ি ছেড়ে

মেখলা-চাদর পরতে হবে। আর যদি কেউ না মানে তাদের হুকুম তবে কালকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে সংগ্রামী ছাত্রবৃন্দ।

গোলমাল শুনে হোষ্টেল স্থপারিণ্টেণ্ডেন্ট ললিতা বরা তাঁর বিরাট বপু সহ অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন যাতে কোনরকম অশান্তি সৃষ্টি না হয় তার জন্য। তিনি বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তাঁর হোষ্টেলের মেয়েরা সবাই যাতে তাদের দাবী মেনে নেয় সে ব্যবস্থা তিনি করবেন।

ছাত্রছাত্রীরা তাঁর আশ্বাসে কান না দিয়ে তখন শিবানীর কামরায় এসে দলবদ্ধভাবে ঢুকে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাসংরক্ষণ সমিতির সম্পাদিকা শিবানীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার শাড়ির আঁচল ধরে টেনে অসমীয়া ভাষায় যা বলল তার মানে হ'ল ঃ

—তুমি না অসমীয়া মেয়ে, বেঙ্গলী মেয়েদের মত শাড়ি পরতে তোমার লজ্জা করে না ?

—এতে লজ্জার কি আছে ! আমি এটা পছন্দ করি।

—আচ্ছা নির্লজ্জ ত' তুমি ?

—তোমাদের চেয়ে অনেক কম, ভারতেরই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে তোমরা যদি ভারতীয়দের ওপর পরিকল্পনা ক'রে গুণ্ডামী করতে লজ্জা না পাও তবে শাড়ি পরতে আমি কেন লজ্জা পাব ? আমি এতে কোন অন্যায় দেখিনে।

—জান এটা আমরা করছি আসাম রাজ্যের মংগলের জন্য। বেঙ্গলী লোকেরা আমাদের দিনের পর দিন কোন্ঠাসা করে রাখছে—তারা রিফিউজি পাঠিয়ে নিজেদের কালচার আমাদের মধ্যে স্লো-পয়জন করছে। এ থেকে জাতিকে মুক্তি দেওয়া অসমীয়া ছাত্রদের দেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেখনি জাপানে, কোরিয়ায় সংগ্রামী ছাত্ররা কি মহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ?

—দেখেছি—কিন্তু উত্তেজনা সৃষ্টি করলেই মহৎ কাজ করা হয় এ মতে আমি বিশ্বাসী নই। মহাত্মা গান্ধীর দেশের মানুষ আমরা।

ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ় স্বরে বললে শিবানী।

—আঃ শিবানী, তুমি চুপ করো। তোমরা কিছু মনে করো না, আমি ওকে বুঝিয়ে বলব ভাল করে।—

শিবানী এবং ওদের এই বাদানুবাদে বাদ সাধলেন ললিতা বরা—হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

ছাত্র-ছাত্রীদের যারা এসেছিল তারা সকলেই চলে গেল। গেলনা কেবল মাত্র এই হোষ্টেলেরই ছাত্রী বিরজা বরদলুই। যে কিনা ছাত্র-আন্দোলনের সংগে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ওরা চলে যেতে ললিতা বরা শিবানীর উদ্দেশ্যে দৃঢ় স্বরে বললেনঃ

—তুমি ওদের চটাতে গিয়ে ভাল করলে না শিবানী।

—কিন্তু দিদিমণি, যা অন্যায়, যা ভ্রান্ত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবো না?

—অন্যায়টা কি বলেছে ওরা? তুমি অসমীয়া মেয়ে, অসমীয়া পোষাক পরবে। এতে অন্যায়ের কি আছে?

—কিন্তু জুলুম করবার অধিকার ওদের নেই। কোন পোষাক পরা না পরা মানুষের ব্যক্তিগত রুচির ওপর নির্ভর করে। তা ছাড়া ওরা ত' শুধু অসমীয়া মেয়েদেরই 'মেখলা' পরতে বলছে না, আসামের বেঙ্গলী মেয়েদেরও 'মেখলা' পরতে বলছে।

—তুমি অবাক করলে আমায়। আচ্ছা শিবানী, একটা কথা বল্‌বে আমায়, বেঙ্গলীদের প্রতি তোমার এত টান কেন?

—কারণটা আমি জানি দিদিমণি।

পাশ থেকে ফস করে বলে বসল বিরজা বরদলুই। বলে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ফিক করে একটু হেসে ফেলল।

—কি?

প্রশ্ন করলেন ললিতা বরা ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক স্বরে।

—ওর না দিদিমণি, এক বেঙ্গলী প্রফেসরের সংগে বিয়ে হবে।

—'আই সি, দেয়ার লাইজ দি কজ'।

সার্চলাইটের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিবানীর আপাদমস্তকে চাইলে ললিতা বরা। মধুর একটু লজ্জা পেল শিবানী। ওর দৃষ্টি তখন আনত হতে হতে নিজের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে এসে ঠেকল। আর না দাঁড়িয়ে গট গট করে পা ফেলে নিজের অফিস ঘরের দিকে চলে গেলেন লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ললিতা বরা।

মেয়েদের জটলাটাও পাতলা হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। শিবানী তখনও অধোবদনে দাঁড়িয়ে। মনের মধ্যে ওর নানা চিন্তার তরঙ্গবিক্ষেপ। সে তরঙ্গের সাথে সাথে শোলার নৌকার মত দোল খাচ্ছে তার একটি অতি প্রিয় নাম।—নামটা তার নিভৃত মনে যখনই ভাসন্ত হয় তখনই বক্ষকুঞ্জে সুরু হয় নব বসন্তের সুর মূর্ছনা। সে নামটায় আচ্ছন্ন হয় সব চিন্তা ভাবনা, জগতের সবকিছু। তার সকল সত্তাই যেন মিশে যায় সেই নামটির সংগে। হ্যাঁ, সে নামটা কোন বাঙ্গালীরই—সে নাম শুভ্রেন্দুর। অধ্যাপনা যার জীবিকা। সুন্দর রুচির, সুন্দর স্বভাবের ছিমছাম এক বাঙ্গলাভাষাভাষী অসমীয়া যুবক।

বিরজা বরদলুই তখনও কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে মুচকি হাসি মেখে লক্ষ করছে শিবানীকে। একটু পর এগিয়ে এসে সে শিবানীর একটা হাত ধরতেই ও চমকে ওঠে। এতক্ষণ যেন ওর মন ওকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল তা বোঝে ও। মনে মনে তাই লজ্জা পায়। বিরজা সহানুভূতির স্বরে ওকে বলে:

—দেখ শিবানী, তুই অসমীয়া মেয়ে। after all তোর কোন বিপদ হোক এটা আমি চাইনে।

—বিপদ! কেন? কিসের বিপদ?

—সত্যি রে। শাড়ি পরা এখন আর তোর নিরাপদ নয়।

—কেন বলতো?

—তুই ত জানিস ছাত্রদের ভাষা সংগ্রাম কমিটির সংগে আমি যুক্ত আছি। ওরা বলছে শাড়ি পরা মেয়েদের ধরে ধরে না, ওরা…

পরের কথাটুকু—ওদের দু'জনের উপস্থিতিতেও কি এক কুণ্ঠায়, সংকোচে প্রকাশ্যে বলতে পারে না বিরজা। এদিকে ওদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে শিবানীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে ফিস ফিস করে যে কথাটা বলে তা শোনামাত্র শিবানী ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে পিছিয়ে গিয়ে মনের সবটুকু ঘৃণা স্বরে মিশিয়ে বলে ঃ

—ছিঃ!

—ওসব 'পুয়োর সেন্টিমেন্ট'-এর কথা ছেড়ে দে। এর নাম 'পলিটিক্স'। জানিস ত, প্রেম আর পলিটিক্স-এ অন্যায় বা অপরাধ বলে কোন কথা নেই।

কথা শেষ করেই খিলখিল করে রহস্যময় উছলিত হাসি হেসে বিরজা চলে গেল তার কামরার দিকে। কিন্তু শিবানী যেন পাথর হয়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বইলেও বাইরে ওর দেহটা যেন প্রস্তরিভূত হয়ে গেছে। যেন ওর সারা দেহ এই মাত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে। মনের সক্রিয় চিন্তা তখন ভাবছে—এত কদর্য, এত নীচ হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছাত্ররা! তা হ'লে শিক্ষার মূল্য কি? যে শিক্ষা মানুষকে সৎ হতে শেখায় না, যে শিক্ষা বিনয়ী হতে বলে না, সে শিক্ষার কি প্রয়োজন? নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় ওর। যে কথা এখনই বিরজা বলে গেল—সে কথা শোনবার পর নিজেকে সেই সমাজের অন্যতমা মনে করে বড় কষ্ট হয়। একটা অস্বস্তিতে ছেয়ে যায় ওর মন। নারী ও। ওর ভাব-প্রবণ কোমল মনটা মুহূর্তে যেন একটা বিশ্রী যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে। সেই উদ্বেল যন্ত্রণাটা চাপতে চাপতে ও ছুটে যায় নিজের ঘরে। তারপর বিছানায় আছড়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। এ কান্না ওর নিজের জন্য নয়, আসামের বর্বর ব'নে যাওয়া এক শ্রেণীর উদ্দাম ছাত্রদের জন্য। যারা সভ্যতার ইতিহাসের শেষের পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে আরম্ভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পশু-পদক্ষেপে। এগিয়ে যাচ্ছে আদির দিকে, আদিমতার দিকে।

কান্নায় আচ্ছন্ন শিবানী এক সময় তন্দ্রাতুর হয়। সেই তন্দ্রার মাঝে বড় সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে দেখে দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে গান্ধিজীর পদ-যাত্রার দৃশ্য! হাঁটুর ওপরে কাপড় পরা এক সঙ্কল্পবদ্ধ মহামূর্তি লাঠি হাতে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছেন। নোয়াখালির আকাশ-মাটি-মানুষে সঞ্চারিত হচ্ছে ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্কল্প। বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অপূর্ব্ব সে সঙ্গীত লহরী—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

একলা চল রে।'

এ দৃশ্য ও স্বপ্ন-ঘোর একসময় স্বপ্নাচ্ছন্ন শিবানীর মন-পর্দা থেকে মুছে গেল—সেখানে এসে দাঁড়াল শুভ্রেন্দু—তার প্রীণিত প্রশান্ত রূপ নিয়ে। ওর মাথায় সান্ত্বনার হাত রেখে যেন বলল ঃ

—ছিঃ, ভেঙ্গে পড়তে নেই। মনকে শক্ত কর, ওঠো, জাগো, মেয়েরা শক্তির জাত। দুর্বলতা তাদের শোভা পায় না।

শুভ্রেন্দুর চেহারা মিলিয়ে যেতে না যেতেই কে যেন এসে ওকে ঠেলতে লাগল। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল শিবানী। দেখল, না, কাছে পিঠে কোথাও ত' নেই শুভ্রেন্দু! ওর খাট ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ভয়াতুর মুখ-চোখে মধুছন্দা।

—কিরে, কি হয়েছে?

—শিবানী দি, আমাদের যে হকারটা কাগজ দেয় না, তাকে ভার্সিটির ছেলেরা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। বেচারা এসে বলে গেল কাল থেকে আর বাংলা কাগজ দেবে না। শুধু ষ্টেটস্‌ম্যান দেবে। শিবানী দি, কি হবে, আমার যে বড্ড ভয় করছে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে হতবুদ্ধি শিবানীর মাথাটায় যেন কি হয়ে যায়। ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে ঃ

—জানি না হতচ্ছাড়ি। দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। দেশের সব মানুষ যদি অমানুষ হয়ে যায় রাতারাতি, নেতারা যদি না

দেশের লোককে রক্ষা করতে পারে, আমি, আমি কি করতে পারি, কতটুকু করতে পারি তোদের জন্য ?

এ হোষ্টেলে একমাত্র সান্ত্বনার স্থল শিবানীর রূঢ় কথায় মধুছন্দা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে প্রস্থানোদ্যতা হতেই শিবানী নিজেকে ত্বরিৎ সামলে নেয়। মুহূর্তে শয্যা ছেড়ে উঠে ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। বলে ঃ

—লক্ষ্মী বোন আমার, ক্ষমা কর। আমার মাথার ঠিক নেই। সারা দেশে যদি আগুন জ্বলে, আর সে আগুন জ্বালায় একশ্রেণীর শিক্ষিত ছাত্র আর পলিটিশিয়ানরা তা হলে আমার মত ছোট মনের সামান্য এক মেয়ের মাথা কি করে ঠিক থাকে বল ? ছন্দা, পারিস ত তোর শিবানী দি'কে ক্ষমা···

মধুছন্দা ত্বরিৎ হাত বাড়িয়ে শিবানীর মুখ চেপে ধরে বলে ঃ

—তোমাকে ক্ষমা করতে ব'লে আমায় ব্যথা দিও না শিবানী দি। তুমি না থাকলে এ ক'দিনে আমি ভয়েই মরে যেতাম।

কান্না করুণ কণ্ঠে কথা শেষ করে মধুছন্দা।

—আয়, আমার বিছানায় বোস। ভেবে দেখি কি করা যায়। এভাবে এখানে তোর থাকা উচিত হবে না আর।

ওরা দুজনে গিয়ে বসল বিছানায়। কোলের ওপর বালিশ জোড়া নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তিত মুখে থম্ মেরে থাকল শিবানী। তারপর যেন একটু ক্ষীণ আলো দেখেছে এইভাবে উজ্জল মুখে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল ঃ

—এক কাজ কর, তোরা, মানে যারা বাঙ্গালী মেয়ে আছিস, সবাই বাড়িতে গার্জিয়ানদের 'টেলি' করে দে। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যা। সেই ভাল, এখানে কে তোদের দেখবে বল ? ললিতাদির ওপর আমার একটুও বিশ্বাস নেই।

—তুমি যা বলবে, তাই হবে।

—যা, তোর ঠিকানা নিয়ে আয়। আর অন্যান্য যেসব বাঙ্গালী

মেয়ে আছে তাদের বলগে যদি রাজী থাকে ঠিকানা দিতে। আমি আমার নাম দিয়ে টেলিগ্রাম করে দেব। নইলে ললিতাদি তোদের ওপর চটিতং হবে। তার চেয়ে ওর সঙ্গে আমিই বোঝাপড়া করব'খন। আর দেখ, বাঙ্গালী মেয়েদের এ সব কথা চুপি চুপি বলিস, অসমীয়া মেয়েরা যেন এ সব ঘুণাক্ষরেও না জানতে পায়। বলা ত যায় না কার মনে কি আছে?

গৌহাটী শহরের অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। ২৮শে জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যে নিষ্ঠুর নাটক অভিনীত হয়েছে তারপর এক শ্রেণীর অসমীয়া ছাত্রদের বর্বর ক্রিয়াকলাপ জঘন্নতার পঙ্কপথে কতদূর যে এগিয়ে গেছে তার ছিটেফোঁটা সংবাদই মাত্র জেনেছে শিবানী। অবস্থা আরও অবনতির দিকে যাওয়ায় ডেপুটি কমিশনার ৩০শে জুন শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু সে আদেশ খাতা কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে বলে শিবানীর সন্দেহ। কেননা হোষ্টেলের ঠাকুর-চাকর-বেয়ারাদের মুখ থেকে শহরের যেটুকু খবর সে সংগ্রহ করছে তাতেই বুঝতে পারছে যে ছাত্রদের শাসন করার ব্যাপারে পুলিশ খুব একটা কিছু করতে পারছে না বা ইচ্ছে করেই করছে না। বিশেষ করে অসমীয়া পুলিশদের মনেও বাঙ্গালী বিদ্বেষের পাপ ঢুকেছে।

ইতিমধ্যে একে একে বাঙ্গালী মেয়েদের অভিভাবকরা এসে তাদের মেয়েদের নিয়ে গেছে। এজন্য অবশ্য শিবানীকে ললিতাদির ধমকানি শুনতে হয়েছে। তা' হ'ক। তাতে বিচলিত হয়নি শিবানী। কেননা মেয়েদের অভিভাবকরা চলে যাওয়ার সময় যে ভাষায় কৃতজ্ঞতা বা আশীর্বাদ জানিয়ে গেছে তাকে—তার মূল্যকে মনুষ্যত্বের পরিমাপে সে অনেক বেশী মনে করে। মধুছন্দা যাবার সময় উচ্ছ্বসিত কান্নায় শিবানীর বুকে ভেঙ্গে পড়ে বলেছিল:

—অসমীয়া আর বাঙ্গালীরা যদি সকলেই সকলের কাছে শত্রু হয় তবু তুমি যেন শেষ পর্য্যন্ত আমার শিবানী-দিই থেক।

—থাকব রে বোন, থাকব।

জল-ছল-ছল চোখে কথা দিয়েছিল শিবানী—

—তোর আমার পরিচয় ত আলাদা নয় ছন্দা—তুইও প্রথমে ভারতীয় তারপর বাঙ্গালী, আমিও ত তেমনি প্রথমে ভারতীয় তারপর অসমীয়া। বিদেশে গেলে আমাদের উভয়েরই যে প্রথম পরিচয়টায়ই পরিচিত হতে হবে। আমরা কি পরস্পরের পর হতে পারি?

কান্নাভেজা কণ্ঠে শেষ কথা বলেছিল মধুছন্দা ঃ

—চলি শিবানী দি, যদি এ 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের বলি না হতে হয়, আবার দেখা হবে আমাদের।

—ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখিস ছন্দা, আর ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করিস নে।

উজ্জ্বল কণ্ঠে উপদেশ দিয়েছিল শিবানী।

বাঙ্গালী মেয়েদের সকলেই একে একে চলে গেছে। হোষ্টেল-জীবন যেন কেমন ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। অসমীয়া মেয়েদের অনেকেই আন্দোলনের উত্তাপে উত্তপ্ত। কোথায় যেন কেটে গেছে সুর, ছিঁড়ে গেছে তার। অসমীয়া মেয়েদের অনেকেই শিবানীর সংগে তেমন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে মেশে না—তারা ওকে অপবাদ দেয় Pro Bengalee বলে। কোন অসমীয়ার যেন বাঙ্গালীকে ভালবাসা মস্ত একটা অপরাধ।

অসমীয়া মেয়েদেরও অনেকের অভিভাবক এসে নিজের নিজের মেয়েদের নিয়ে গেছে। শিবানীর আর ভাল লাগছে না এই হোষ্টেল-জীবন। ওর কামরার বাকী তিনটে সীটই খালি। একা ওই যা আছে। যা কিছুই হোক না কেন ওর এখন যাওয়া হবে না—কেননা ওর বাড়ি থেকে ওকে নিতে আসবার মত কেউ নেই।

অথর্ব বাবা—আর বার্দ্ধক্য পীড়িত মা। হ্যাঁ একজন হয়তো ছুটে আসতো এইভাবে অবস্থা অবনতির দিকে যাবার আগেই—সে শুভ্রেন্দু। কেননা সে তাদের সংসারেরই ছেলেরই মত। সেবার মাকে ও বলেছিল :

—ছেলে নেই, তাতে কি কাকিমা, আমি কি আপনাদের ছেলে নই ?

কিন্তু সে ত' এখন এখানে থাকে না। সেই কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন শুভ্রেন্দু আপনার যোগ্যতায় কলকাতাতেই অধ্যাপনার চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে।

সন্ধ্যার পর ওর মাথায় এক মতলব এলো। ট্রাঙ্ক খুলে বের করল ট্রানজিষ্টার রেডিও সেটটা। যেটা শুভ্রেন্দু ওকে ওর এক জন্মদিনে প্রেজেন্ট করেছিল। কি সুন্দর করে বলেছিল :

—পাণ্ডববর্জিত দেশে পড়ে থাক—জগতের খবর রাখতে অহম-দুহিতার সুবিধা হবে এতে।

প্রথম প্রথম প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই সেটা খুলে বসে থাকত শিবানী। কিন্তু পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে বলে ওকে সেবার ধমকে দিয়েছিল শুভ্রেন্দুই। তারপর থেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল শিবানী খুব বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আর সেটা খুলবে না।

কিন্তু এবার নিশ্চয়ই সেই বিশেষ প্রয়োজন এসেছে—এই শহরের বুকেরই ওপর দিয়ে বর্বরতার যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার ছিটেফোঁটা খবরও কি পাওয়া যাবে না সরকারী প্রচার যন্ত্রে—যে সরকারের শীলমোহরে উৎকীর্ণ বাণী হ'ল "সত্যমেব জয়তে।"

সন্ধ্যার পর দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে এলো শিবানী। তারপর খুলে বসল রেডিওটা। খুব আস্তে করে দিল আওয়াজ। দু'একটা প্রোগ্রামের পর সুরু হ'ল আসাম সরকার প্রচারিত প্রেসনোট। মনযোগ দিয়ে শুনল শিবানী সে প্রেসনোট। সরকারী প্রেসনোটে বলা হ'ল ;

১৭ই জুন ২৫।৩০ জন লোক এক ব্যক্তিকে আক্রমণ করে ; ঐ ব্যক্তি যে বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লয়, সেখানে ঢিল ছোঁড়ে। তাহারা অপর ছয় ব্যক্তিকেও মারপিট করে। ২৮শে জুন ৫০ জন যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কলিকাতা হইতে আগত সংবাদপত্রের গাড়িটি থামাইয়া গাড়ীর আরোহীদের টানিয়া বাহিরে আনে এবং তাহাদিগকে মারপিট করিয়া কাগজগুলি ছিনাইয়া লয় ও পুড়াইয়া ফেলে। ২৯শে জুন সহরে কয়েকটি মারপিটের ঘটনা ঘটে। গৌহাটী পুলিশ মারপিট সম্পর্কে ১৯টি ক্ষেত্রে তদন্ত আরম্ভ করে। ৩০শে জুন অবস্থা আরো অবনতির দিকে যাইতে থাকায় এবং কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মারপিটের ঘটনা ঘটায় ডেপুটি কমিশনার ১৪৪ ধারা জারী করেন, কার্ফ্যুও জারি করা হয়। ঐ দুইটি আদেশ সত্ত্বেও প্রায় এক শত লোকের জনতা 'কুকুমতা' রেল ফায়ার সাব ষ্টেশনের কর্মীদের মারপিট করে এবং টেলিফোন রিসিভার অপসারণ করে। রাত্রি ১০টায় তৈল শোধনাগারের একজন কর্মীর বাড়ীতে ইট পাটকেল ছোড়ে। চাঁদমারীতে একদল লোক বেআইনীভাবে একজনকে আটক করিয়া রাখে, পানবাজারে আর এক ব্যক্তি প্রহৃত হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় জনতা এক বাড়ীতে ঢুকিয়া তিন ব্যক্তিকে মারপিট করে। চাঁদমারীতে একজন নারীও লাঞ্ছিতা হন। গৌহাটীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীতে মিলিত হইয়া অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাহারা পূর্ণশান্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। ইহাতে কার্ফ্যু প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করা হয়। বিভিন্ন পল্লীতে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। ২রা জুলাই কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি হকারদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া

হয়। সন্ধ্যায় কিছু সংখ্যক লোক দিঘমানী পুখুরীর নিকট এক বাড়ীতে ঢুকিয়া লোকজনকে জখম করে। দুষ্কৃতকারীরা শিলপুখুরীর নিকট বাড়ী ঘরের ওপর ইটপাটকেল ছোঁড়ে। পাণ্ডুঘাট বাজারের জনৈক চিকিৎসক ছুরিকাহত হন। হাসপাতালগামী এম্বুলেন্সের ড্রাইভারকে প্রহার করা হয়। একজন পুলিশ কনষ্টবলও প্রহৃত হয়। ঐ অঞ্চলে একজন ডাক্তারও প্রহৃত হন। যানবাহনের উপর ঢিল ছোঁড়া হয় এবং গাড়ী জখম করা হয়। উযানবাজার ষ্টিমারঘাটে এক ব্যক্তি প্রহৃত হয়। ৪ঠা ও ৫ই জুলাই-এর ঘটনার কিছু বিবরণ গতকল্যকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি ঘটনার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। পুলিশ সুপার সশস্ত্র বাহিনী সহ 'ডন বসকো'র দিকে যাইবার সময় একদল লোক অয়ারলেশ ষ্টেশনে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করিতেছে দেখিতে পাইয়া উহা বন্ধ করে। পৌনে ১২টার সময় অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে পুলিশ উগ্রমূর্ত্তি জনতার উপর গুলী ছোঁড়ে। উহাতে এক ব্যক্তি নিহত এবং অপর ৯ জন আহত হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এদিকে ৬০ জন লোকের এক জনতা ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয় ঢুকিয়া পড়ে। ঐ সময় তিনি অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিতে-ছিলেন। ঐ সময় যে ঠেলাঠেলি সুরু হয় তাহাতে স্বয়ং ডেপুটি কমিশনার ছুরিকাঘাতে আহত হন। ১২-১৫ মিঃ এর সময় পুনরায় কার্ফ্যু জারি করা হয়। প্রেসনোটে শহরের সর্বত্র হাঙ্গামার প্রসারে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। ইহার ফলে এমন কি পদস্থ পুলিশ কর্মচারির জীবনও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি

এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আবেদন সত্ত্বেও অবস্থা খারাপের দিকেই যাইতে থাকে। কার্ফ্যু জারি করা ছাড়া শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি নিবারণ সম্ভব নয় বলিয়া দেখা যায়। অবস্থাকে আরো অবনতির দিকে যাইতে দেওয়া যায় না। দুস্কৃতকারীদের কঠোর হস্তে দমন করা হইবে। এই জন্যই পুলিশকে সাহায্য করার জন্য সৈন্য তলব করা হইয়াছে। প্রেসনোটে অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিবাইয়া আনার জন্য সরকারের প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতা করার নিমিত্ত বিশিষ্ট নাগরিক ও জনসাধারণের নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

রেডিও বন্ধ ক'রে শিবানী সেটা ট্রাঙ্কের ভেতর চালান করে দিল। তারপর শোনা ঘটনাগুলো মনের মাঝে নাড়াচাড়া করতে লাগল। ভাবতে লাগল ও যে সরকারী বিবরণে যা বলা হয়েছে ততটাই কতনা ভয়াবহ। বাস্তবে না জানি আরও কি ভয়াবহ বর্বর ও জঘন্য অত্যাচার চলেছে তাদের ওপর যারা এই ভারতেরই নাগরিক। দুর্মনায়মান শিবানী মনে মনে একটা কথা ভেবে আশ্বস্ত হ'ল যে শুভ্রেন্দু এখন কলকাতায়। সে এখানে থাকলে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় শিবানী কিছুতেই এই হোস্টেলে পড়ে থাকতে পারত না। কিন্তু জ্যাঠামণি, জেঠিমা, তাদের প্রতিও ত' তার একটা কর্তব্য আছে। হ্যাঁ আছে বই কি। কালই মাকে চিঠি লিখবে ও—যেন তারা প্রাণ থাকতে ওদের কোন ক্ষতি হতে না দেয়। হ্যাঁ, আর একজনকেও চিঠিতে অনুরোধ জানাবে ওদের ওপর নজর রাখতে—সে হ'ল কানাই কাকতি। ধীমতী শিবানী বোঝে কানাই কাকতির যেটুকু দুর্বলতা আছে ওর ওপর তাতে তার অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে পারবে না। ও অঞ্চলে যারা হাঙ্গামা করতে পারে তাদের দলে যে বিশিষ্ট আসনে কানাই কাকতি থাকবে সে বিষয়ে শিবানীর কোন সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, কাল সকালেই খাম কিনে এনে চিঠি দিতে হবে।

রাতের আহারে হাত নেড়েচেড়ে এসে একরূপ অভুক্ত অবস্থায়ই চিন্তান্বিতা শিবানী বিছানা নিল। কিন্তু বিছানা নিল বটে চোখের পাতায় ঘুম এলো না। প্রেসনোটে যে ঘটনায় চুম্বক ও জানতে পেরেছে—তার সূত্র ধরে শিবানীর মনের মাঝে যেন বিভৎস, বর্বর আক্রমণগুলো চলচ্চিত্রের ছবির মত থেকে থেকে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতে লাগল।

একসময় ও অশান্ত মন নিয়েও ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমের মাঝে সেইসব দৃশ্য স্বপ্ন হয়ে ওর মনকে করল আচ্ছন্ন। দেখতে পেল একদল অসমীয়া দুর্বৃত্ত পাশব প্রবৃত্তিতে উল্লসিত হয়ে ইণ্ডিয়ান রিফাইনারীর এক বাঙ্গালী বড়বাবুর বাড়ী আক্রমণ করছে। কয়েক মুহূর্তে সারা বাড়ীতে যেন গুণ্ডাদের প্রেতনৃত্য সুরু হয়ে গেল। ওরা অন্দরে ঢুকে ভদ্রলোকের ভয়ব্যাকুলা স্ত্রীকে ঘৃণিত প্রয়াসে নিষ্ঠুর আকর্ষণে ধরে এনে একের পর এক তার ওপর চালাতে লাগল অকথ্য অত্যাচার, যাকে সভ্য মানুষের ভাষায় বলে পাশবিক আচরণ। স্বামীর সাক্ষাতে স্ত্রীর ওপর বর্বর অমানুষিক অত্যাচার! দুর্বৃত্তরা বলিষ্ঠ হাতে ধরে আছে ভদ্রলোকের একটি বাহু। তিনি শরীরের সকল শক্তিতে চেষ্টা করছেন ওদের হাত থেকে মুক্তি পেতে। মনে মনে সঙ্কল্প নিচ্ছেন যে করেই হ'ক পিশাচদের প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত বাম হাতের বাহুমূল ছিঁড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন গিয়ে স্ত্রীর বুকে পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে নিরত বিকট দর্শন লোকটির ওপর। পাশ থেকে আর এক দুর্বৃত্ত হাতের মোটা ডাণ্ডাটা সজোরে মারল বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মাথায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। বুক ফাটা আর্তনাদ করে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন ভদ্রলোক। ভদ্রমহিলাও তখন সংজ্ঞাহীনা। সে কি বীভৎস দৃশ্য!

—আঁ……আঁ……আঁ……

স্বপ্নের মধ্যেই ভয়ার্ত্ত চীৎকার করে বিছানায় উঠে বসল শিবানী। সে শব্দ নিস্তব্ধ রাত্রির নির্জনতা খানখান করে ছড়িয়ে পড়ল দিক হতে দিগন্তে। পাশের ঘরের একটি মেয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে শিবানীর কপাটে করাঘাত করতে লাগল :

—এই শিবানী, কি হল ?

—ও কিছু নয়—স্বপ্ন দেখছিলাম। তুই শুয়ে পড়গে।

বলল শিবানী। মেয়েটির পায়ের চপ্পলের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলে শিবানী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এগিয়ে গিয়ে সুইচে হাত রাখল। আলোয় ভরে গেল ঘর। বুক, গলা, ঘাড়, সারা গায়ে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম। এগিয়ে গেল কুঁজোর দিকে। পর পর দু'গ্লাস জল ঢক ঢক করে ঢেলে দিল গলায়। নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। আবার এসে দেহভার এলিয়ে দিল বিছানায়।

চিন্তা আর চিন্তা। এ চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় শিবানী। মনটাকে নিয়ে যায় এই হোষ্টেলের কামরা থেকে, আসাম থেকে—সেই পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তর সহর কলকাতায়। তারপর সতর্কে এগিয়ে গিয়ে আড়ি পাতে শুভ্রেন্দুর হোটেলের কামরায়। ঠিক যা ভেবেছিল, পাঠ পাগল শুভ্রেন্দু রাত জেগে টেবিল ল্যাম্পটার আলোকছত্রের নীচে বসে একমনে লিখে যাচ্ছে। কি লিখছে এত মনোযোগ দিয়ে ? পাশে স্তূপাকৃতি নোটখাতা। বুঝেছে শিবানী, যে থিসিসটা ও সাবমিট করবে ডক্টরেট-এর জন্য সেটার সাধনায় ও এখন মগ্ন। ওর ঐ ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি ওদের বাড়ীতে গিয়ে ওর পড়ার ঘরে আড়ি পেতে কতবার দেখেছে শিবানী। কতদিন মনে মনে ভেবেছে মানুষটা পারিপার্শিক ভুলে কি করে যে এতটা তন্ময় হয়ে যায়!

আবার ঘুম নামে শিবানীর চোখে। আবার ওর চেতনা ও চিন্তা নিঃসাড় হয়ে আসে। কিন্তু সে নিদ্রা প্রগাঢ়

নয়—সে নিদ্রাও চিন্তাকীর্ণই বলা চলে। চিন্তা আবার রূপ পায় স্বপ্নে।

সে স্বপ্ন ভ্রাতৃনিধন যজ্ঞের কোলাহল মুখর। মার মার শব্দে যারা এগিয়ে এসে ঢুকলো আসামে চার পুরুষের বাসিন্দা জ্যেঠামণিদের বাড়ীতে-তার নেতৃত্ব করছে যে শুভ্রেন্দুর প্রতি বরাবরই দুর্বাক কানাই কাকতি! প্রচণ্ড উল্লাসে সে তার সশস্ত্র দলবল সহ প্রতিটি ঘরে কাকে খুঁজে ফিরছে? জ্যেঠামণিকে দেখেও দেখল না—ভয়ার্ত জেঠিমাও ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করল না। তারপর যে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা শুভ্রেন্দুরই ঘরে! সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শিবানীর! যে ঘরে বিবুধ শুভ্রেন্দুর বিদ্যার সাধনা চলে—সেই ঘর কলঙ্কিত হচ্ছে আজ কুটিল প্রয়াসপুষ্ট ভ্রাতৃঘাতি সংগ্রামে লিপ্ত জহ্লাদদের পদ-স্পর্শে! হ্যাঁ, ঐ ত' দুর্নীত কানাই এগিয়ে গিয়ে সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি শুভ্রেন্দুর মুখোমুখি দাঁড়ালো এক দুর্নিবার সংকল্প নিয়ে। শিবানী শিউরে উঠল কানাইয়ের হাতের শানিত ছুরিকা দেখে। ঘুমের ঘোরেও ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল ওর! বুকটায় এক প্রচণ্ড অব্যক্ত যন্ত্রণা উথালি পিথালি করতে লাগল। স্বপ্নঘোরেই মধ্যরাত্রির বিবিক্ত বিছানায় ছটফট করতে লাগল ও। তারপর বুকফাটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার করে উঠল শিবানী শুভ্রেন্দুর ধড় ছাড়া মাথাটা অন্ধকারের বুকে ভেসে বেড়াতে দেখে!

—আঃ আঃ আঃ!

আবার আর্ত্তনাদ করে ওঠায় শিবানীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল উত্তেজনায় উঠে বসল সে। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ঘসল চোখের পাতা আন্দোলিত করে চাইল এদিকে ওদিকে—সত্যি নয়ত। ওর যেন তবু ঘোর কাটতে চায় না। মনে হচ্ছে শুভ্রেন্দুর ধড় ছাড়া মাথাটা যেন এখনও এই নির্জন ঘরের মধ্যেই ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল বিধুনিত শিবানী। সুইচ টিপে আলো জ্বাললো। কুঁজোর কাছে গিয়ে মাথার তালুতে জল ঠাসল। কি বিশ্রী স্বপ্ন। তবু এ স্বপ্ন আজ অনেক হতভাগ্য বাঙ্গালী যুবকের জীবনেই সত্য হয়েছে। যদি সত্যিই শুভ্রেন্দুকে ওরা···প্রচণ্ড ভয়ে শিউরে ওঠে ওর সারা দেহ—মুখ দিয়ে একটা ব্যথা করুণ ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ বেরোয়।

আগুন জ্বলেছে সমগ্র আসাম উপত্যকায়—আগুন জ্বলেছে আজ শিবানীর মনেও। কেমন এক অস্থিরতায় ঘরময় পায়চারি করে ফেরে ও। কখনও দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট দংশন করে। কখনও মাথার তু'পাশের দপ্‌দপ্‌ করা রগতুটো টিপে ধরে হাতের আঙ্গুল দিয়ে। কখনও চেয়ারটায় গিয়ে বসে টেবিলের ওপর কনুই রেখে হাতের তালুতে চিন্তা-ভার মাথা রাখে। কখনও ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে ওর। উৎকণ্ঠা ভরা একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন ওর পেটের ভেতর থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে স্প্রিং-এর মত উঠে গলা অবধি এসে আটকে যায় বারবার।

ঘরটায় প্রচণ্ড গুমোট। দম যেন আটকে আসে ওর। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দরজার ছিটকিনি খুলে মানসিক যন্ত্রণাকাতর ও বাইরে বেরিয়ে আসে। ফুলবাগান থেকে আসা বাসিত হাওয়া বুকভরে টেনে নিতে নিতে শিবানী ক'বার সতর্ক পায়ে পায়চারি করে বারান্দার এ মাথা থেকে ও মাথা।

এক সময় চেয়ে দেখে পূবের আকাশে উষার আভাস। তু'একটা নিদ্রাজাগা পাখি তখন নীড় ছেড়ে অসীম আকাশে উড়ে যায় আলস্যের আড় ভেঙ্গে। কণ্ঠে তাদের খুসীর কাকলি। কিন্তু আসামের এক শ্রেণীর অধিবাসী বাঙ্গালী আজ ভয়ে বিবর্ণ। তাদের মুখে ঐ রকম খুসীর কাকলি কি আর কোন দিন শোনা যাবে? ভাবতে ভাবতে পায়চারি করে—পায়চারি করতে করতে ভাবে শিবানী। ভাবে আর ভাবে।

পণ্ডিত নেহ্রু, তুমি কেন বোঝ না যে যে সংবিধান মানুষকে ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মমতে বিশ্বাস রেখে বসবাস করবার আধকার দিয়েছে—সে সংবিধানের মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব তোমার ওপর, তোমার সরকারের ওপর। যে গুণ্ডাবাজী তখন অবলীলাক্রমে চলেছে আসামের বঙ্গভাষাভাষী অসমীয়াদের ওপর সেই গুণ্ডাবাজী যদি রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে ছড়িয়ে পড়ে—তবে ভারতের অস্তিত্ব ভাববার মত অবশিষ্ট থাকবে কে? রাজ্যগুলি যদি পরস্পর বিভেদের পোঁটলা নিয়ে ভারত সংহতির বেষ্টনী ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করে তবে 'ভারত আমার, ভারত আমার' বলে কে রক্ষা করবে এই সংবিধানের মর্য্যাদা? যদি তুমি সত্যাশ্রয়ী মহাত্মার প্রকৃত মন্ত্রশিষ্য হও, তবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমার মন হাহাকারে ভরে উঠবে। কিন্তু তোমার মনের হাহাকার ত ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা বন্ধ করতে পারে না—এজন্য তোমাকে হ'তে হবে বজ্রের মত কঠোর—কেননা 'তোমার আবিস্কৃত ভারতের' সৎ নাগরিকরা দেশের একক নেতা তোমার কাছ থেকেই তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনের নির্ভরতা চায়।

যে সোভিয়েৎ রাশিয়ার জননায়কদের তুমি বন্ধু, সেখানে কম বেশী দু শ' চল্লিশ রকমের ভাষা চালু আছে শুনেছি। তাঁরা কিভাবে সে সমস্যার সমাধান করেছে? কেন পারনা তুমি তার চেয়েও অনেক কম ভাষাভাষী ভারতের ভাষা সমস্যার সমাধান করতে?

আমি জানি কেন পার না। তোমার ভয় ভাষা সমস্যার সমাধান করতে বজ্র কঠিন হাতে শাসন চালালে কংগ্রেস হয়তো তার প্রভাব হারাবে অনেক রাজ্যে। পণ্ডিত নেহ্রু, ভারতের সামান্য একজন নাগরিক হিসাবে আমার প্রশ্ন—কংগ্রেস বড় না দেশ বড়? নেহ্রু-নীতি বড় না জনগণের অধিকার বড়? এই জন্যেই আসামে দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার লোকদের ওপর 'পিটুনী ট্যাক্স' বসাবার প্রস্তাব করেও বসাতে পারনি। এক পক্ষকালের মধ্যে পুনর্বাসন করার কথা অসমীয়া নেতাদের বলেও সে কথার গুরুত্ব রাখতে পারনি।

উন্নাসিক আমি নই নেহ্রু। তোমার গুণ-গুলির আমি বড় ভক্ত। কিন্তু তোমার দোষগুলির প্রতি কোন করুণা প্রদর্শন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কেননা আমি সাহিত্যিক—সত্যের পূজারি। সত্যকে সূর্য্যালোকের মত প্রকাশ করাই আমার কাজ। দেশবাসীর প্রতি আমার দায়িত্ব।

আমি বাঙালী সমাজের উন্নাসিকদেরও সহ্য করতে পারি নে। বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের জন্য গর্ব করি বলে অপর কোন ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আমি ছোট করে দেখতে চাই নে। কিন্তু তাই বলে আমি আমার ভাষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকলে ভারতের সীমানাতেই অপরাধী হবো—আর আমার মাথায় এসে পড়বে হিংসার ডাণ্ডা বা বুকে বসবে ঘৃণার ছুরিকা—এ ব্যবস্থাও আমি মেনে নিতে পারিনে। সংবিধানের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় তুমি কঠোর হও, ক্লীবতার নামাবলী একান্ত অবহেলায় ধূলায় ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে চল—আমি সামান্য ভারতীয় লেখক হিসাবে তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠব। তোমার জয়ে আমি জয়ধ্বনি দেব।

কিন্তু তুমি বা তোমার 'ক্যাবিনেট' ত সেভাবে এগোবে না—বোম্বাইকে দ্বিভাষিক রাজ্য বলে ঘোষণা ক'রে একবার এক্সপেরিমেন্ট

করলে। শেষ পর্য্যন্ত ওখানকার প্রভাবশালী নেতাদের কথায় ভাগ করলে সে ভূখণ্ড। অন্ধ্রের বেলাতেও করলে তাই।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করতে গিয়ে বিহারের সঙ্গে ধানবাদ জুড়ে দিলে, উড়িষ্যার দাবী করলে উপেক্ষা আর পুরুলিয়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পিঠ দিলে চাপড়ে। এই যে ধামাচাপা নীতি, এই নীতিতে কি করে সুশাসন চলে কোন রাষ্ট্রে? যারা শাসক তারাই যদি অস্থিরমতি হন, কিভাবে জনসাধারণ তাদের ওপর আস্থা রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতি গঠনে, কিভাবে সফলতার পথে এগিয়ে যায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো? তাই বলি, পণ্ডিত নেহ্‌রু, তুমি ভুল করছ।

স্নান করে এসেও চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেল না গৌহাটী শহরের 'হাণ্ডিকুঁই গার্লস কলেজ'-এর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শিবানী। চিন্তা, চিন্তা আর চিন্তা। মাথায় যেন ওর চিন্তার আগুন জ্বলছে রাবণের চিতার মত। সাতসকালেই সুরতিয়াকে ডেকে ও পয়সা দিয়ে দিল কাউকে পাঠিয়ে একটা খাম কিনে আনতে।

অন্যান্যদিনের মত আজ গেল না ও রিডিং রুমে। নিজের বিছানায় ঠায় শুয়ে রইলো ও। মাঝে মাঝে নানা মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তা ওর মনে কিলবিল করে উঠতে লাগলো। আশপাশের রুমের মেয়েদের অনেকেই এসে ওর কুশল জিজ্ঞেস করে গেল। উত্তরে ও নির্লিপ্ত স্বরে বলল:

—না তেমন কিছু নয়। এমনি শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।

কেউ কেউ আবার ওর অলক্ষে ঠোঁটও উল্টালো 'ঢং' বলে। চিন্তাক্লিষ্টা শিবানী বিছানায় অনড় হয়ে পড়ে থাকলেও সময় এগিয়ে চলল তার আপন গতিতে। এক সময় সুরতিয়া তার আদিষ্ট খাম এনে দিল। আর সেই সংগে দিল একটা ইনল্যাণ্ড লেটার।

সুরতিয়ার 'চিঠ্ঠি' কথাটা শোনামাত্র শয্যা থেকে বিদ্যুৎপৃষ্টের মত উঠে এল শিবানী। ছোঁ মেরে সুরতিয়ার হাত থেকে সেটা নিয়ে নিল আর সংগে সংগে তাতে দৃষ্টি ফেলে হস্তাক্ষর দেখেই বুঝল সেটা কার চিঠি। মনের সব অবসাদ, সব গ্লানিমা যেন চিঠিটা স্পর্শমাত্র মুহূর্তে কোথায় মিলিয়ে গেল। খুশীর ঝর্ণার মত বুঝি কলতান করে উঠল ওর তরুণী মন। সেই খুসীর প্রাবল্যে ও সুরতিয়াকে এক টাকার ফেরতা পয়সার সবটাই বকশিস করে দিল। বিপুল বিস্ময়ে সুরতিয়া শুধায় ঃ

—সব লিয়ে লিব দিদিমণি !

—হ্যাঁ, সব।

হ্লাদিতা শিবানী হাসিমুখে বলে। কথা নয়, যেন কলতাপ !

বেলার প্রথমার্দ্ধে এমন একটা অপ্রত্যাশিত লাভ পেয়ে খুসীতে ডগমগ সুরতিয়া হাল্কা পায়ে চলে গেল কর্মান্তরে। আর সংগে সংগে মনের মিষ্টি একটা স্বাদ অন্তরের সবটুকু লোলুপতা দিয়ে আস্বাদন করতে করতে চিঠির মুখটা ছিঁড়ে ফেলল শিবানী। তারপর দৃষ্টির সাকুল্য একাগ্রতা দিয়ে আস্তব্যস্তে ভাষার আকিবুকিগুলো পড়ে যেতে লাগল ঃ

কলিকাতা

৪।৭।৬০

সুচরিতাষু—

আশা করি কুশলে আছ। আর আমার চিঠি গত কিছুদিন না পেয়ে বিশেষ চিন্তায় পড়েছ। আমি ত' জানি, আমার চিঠি পেতে দেরী হ'লে তোমার কি অবস্থা হয়। এদিকে খবরের কাগজে আসামের ঘটনার যে সব খবর বেরুচ্ছে, তাতে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছি। গত ২৩শে জুন থেকে একটানা সাতদিন জ্বরে ভুগলাম। ডাক্তাররা বলল টাইফয়েড। তবে খুব একটা সিরিয়াস

টাইপ-এর নয়। কিন্তু তাতেই আমার স্বাস্থ্যের বিস্তর অবনতি ঘটেছে। এইজন্য অন্যান্য সতীর্থ অধ্যাপকদের পরামর্শে দিন পনেরর ছুটি নিয়েছি। আগামীকাল দেশে যাচ্ছি। অবশ্য ট্রেনে নয়—প্লেনেই যাব। তোমাদের গুয়াহাটীতে ছাত্ররা নাকি বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছে—বাঙ্গালী বিরোধী কাজে? এ ব্যাপারে 'বড়ুয়া' নাকি নেতৃত্ব নিয়েছে। ওর গুণের কথা তোমার মুখে অনেক শুনেছি। তাই সংবাদটা হয়ত নিতান্ত মন গড়া নয়। যা-হ'ক না কেন তোমার সার্টিফিকেট আমি ত অনেকবার পেয়েছি—আমি বাঙ্গালীর চেয়ে অসমীয়া কোন অংশে কম নই বলে। তাই আশা করি আমি মাথা বাঁচিয়ে আমার দেশ, আমার ঘরে গিয়ে পোঁছোতে পারবো।

হ্যাঁ, আমার এ চিঠির উত্তর দেশে দেবে। কেননা যখন এ চিঠি তোমার হস্ত চুম্বন করবে তখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। স্নেহ নেবে, প্রীতি নেবে, আর যেটা পেলে তুমি খুসী হও সেটাও এই চিঠির সংগে পাঠাচ্ছি।

ইতি—

তোমারই—

চিঠি পড়তে পড়তে ওর মন থেকে আনন্দের রেশটুকু কোন ফাঁকে কোথায় যেন ছুটে পালিয়ে গেল। পরিবর্তে শিবানীর মাথার সবগুলো শিরা উপশিরা যেন উৎকণ্ঠার লেলিহান আগুনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। কি দুঃসাহসী ছেলে! এই হানাহানি কাটাকাটির মধ্যে লোক যখন পালিয়ে যাচ্ছে আসাম ছেড়ে, তখনই কিনা অকুণ্ঠায় চলে আসছে আসামে?

তাছাড়া যে কানাই কাকতি আশৈশব আহিতলক্ষণযুক্ত শুভ্রেন্দুর সংগে কোন প্রতিযোগিতায় পারে নি—সে কি নিতে

পারে না এই স্বর্ণ সুযোগ ? পড়াশুনায়, ভদ্র সংযত ব্যবহারে শুভ্রেন্দু যে রগচটা কুক্রিয় কানাইকে বরাবরই পেছনে ফেলে এসেছে—সে যদি এই সুযোগ নেয় ? এ ছাড়া 'মাটিকার ?' বইটা কতবার কতভাবে না সে পড়েছে শুভ্রেন্দুকে দেখে—গানগুলো কতবার আবৃত্তি করেছে সে তার বিশ্রী কণ্ঠস্বরে।

বিশেষ করে শুভ্রেন্দুকে কাছে পিঠে দেখলে ও আরও বেশী জোর দিয়ে আবৃত্তি করেছে 'মাটিকার' এর সেই বাঙ্গালী বিদ্বেষী গানটা। শুভ্রেন্দুর হাবভাবে কিন্তু তাতে কোন রকম পরিবর্তন হত না। মৃদু মৃদু হাসি তার ঠোঁটে লেগেই থাকত। কানাইকে বলত—

—কম্‌রেড, আমাকে মেরে নেতা হতে চাও নাকি ?

এমন নিরাসক্তভাবে কথাটা বলত শুভ্রেন্দু যা কানাইয়ের মনে বুঝি কাঁটা ফুটিয়ে দিত। ও কটমট করে ক'বার ওর দিকে চেয়ে চলে যেত আবৃত্তি বন্ধ করে। এই সব ভাবতে ভাবতে রাত্রির সেই দুঃস্বপ্নটা ধ্বক্ করে যেন ভেসে ওঠে শিবানীর স্মৃতিপটে—শুভ্রেন্দুর ধড়হীন মাথাটা মা কালীর হাতের নৃমুণ্ডের মত অন্ধকারে ভেসে বেড়াচ্ছে!

শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে শিবানী বিছানায় আছড়ে পড়ে। অহমকন্যার কালো ডাগর চোখের জল ঝরে বালিশে—এক বাঙ্গালী ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে। কেঁদে কেঁদেও কোন কূল কিনারা পায়না শিবানী। এতবড় একটা সমস্যা, যার সংগে তার নারীজীবনের ভবিষ্যৎ গাঁথা হয়ে আছে। যে বিবুধ বাঙ্গলাভাষী যুবকের আদর্শে সে নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছে সেই ছোট্টটি থেকে, তাকে এতবড় একটা বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে কি করে সে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে ?

তাছাড়া শুভ্রেন্দুকে সে যতটা জানে তার মা-বাবাও কি জানে ততটা ? ঠিক শিশুর মত সরল তার মন। তার [illegible] শত্রু কানাই কাকতিও যদি গভীর রাত্রে এসে বলে, 'চল ব্রহ্মপুত্রের ধারে

বেড়িয়ে আসি'—তবে বিনা দ্বিধায় তার সংগে চলে যাবে শুভ্রেন্দু। নিজের মনে পাপ নেই বলে কাকেও ও পারে না সন্দেহ করতে। এজন্য অনুযোগ করেছিল একদিন শিবানী :

—কানাই দা'র সংগে তোমার এখানে ওখানে যাওয়াটা ঠিক নয়।

—কেন বলত ?

—ওর সাঙ্গপাঙ্গরা তেমন ভাল নয়। কি সব যা তা বলে তোমায়।

—ভীরু বালিকা, তোমার ভয় অমূলক। ও আমার সংগে সেই ছোট বেলা থেকে বড় হয়েছে—ওটা ওর একটা মজা, রসিকতা, ঠাট্টা।

কি সরল বিশ্বাস। কিন্তু শিবানী নিজে ত জানে কানাইয়ের মন কত কুটিল। শানিত যৌবনা শিবানীর প্রতি কানাইয়ের লালস বরাবরই। কত দিন কানাই তাকে একান্তে পেলেই লব্ধবিদ্ধ শুভ্রেন্দুর বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করতে চেষ্টা করেছে। বলেছে :

—তুমি একজন শিক্ষিতা অসমীয়া মেয়ে হয়ে বাঙ্গালীর পায়ে মাথা নোয়াবে? অসমীয়া সমাজে কি এমন কেউ নেই যে তোমার উপযুক্ত ?

—শিক্ষা মানুষকে উদার করে কানাইদা। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যারা কারবার করে তারা অতি নীচ স্বভাবের জীব। ভিন্ন স্থানের অপরিচিত কুকুর দেখলে কুকুররাই তাকে তাড়া করে, মানুষের স্বভাব ওটা নয়।

মোটা বুদ্ধির কানাই শিবানীর এই শ্লেষপূর্ণ কথার কোন যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারত না। ফলে ইলেকট্রিক শক খাওয়া সার্কাসের সিংহের মত ঘাড় গুঁজে সেখান থেকে চলে যেত সে।

না-না-না এমন বিপদের মুখে শুভ্রেন্দুকে ঠেলে দিয়ে শিবানী এই হোষ্টেলে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে বসে থাকতে পারে না। নিশ্চিন্ত

অবলম্বনের মত দু'হাতে আঁকড়ে ধরে থাকা বালিশটা ছুড়ে দিয়ে ছিটকে নেমে পড়ে ও মেঝেতে। ওর মঞ্জুল মুখের এখানে ওখানে লোনা জলের দাগ। অস্থির চাঞ্চল্যে ও ঘরময় পায়চারি ক'রে ফেরে। মনের মধ্যে তখন ততোধিক অস্থিরতা ওর।

সব দিদিমণির খাওয়া হ'য়ে গেলেও শিবানী খেতে গেল না দেখে হোষ্টেলের ঠাকুর সুরতিয়াকে পাঠায় ওর খোঁজ নিতে। সুরতিয়া শিবানীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। দেখে চিন্তা-থম্‌থম্ মুখে সে ক্রমাগত পায়চারি করে চলেছে—আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর দুটি হাত রেখে।

আশ্চর্য্য, এই ত ঘণ্টা দুই আগে হাসিখুসি মেয়েটাকে দেখে গেল সে। আর এটুকু সময়ের মধ্যেই এত পরিবর্তন। এতদিন হ'ল দেখছে সুরতিয়া শিবানীকে—এমন হাসিখুসি মেয়ে আর একজনও আছে এ হোষ্টেলে? অথচ আজ সেই মেয়ের কি হ'ল! কি হতে পারে? হুঁ, তবে বোধ হয় যে চিঠিটা সে এনে দিয়েছে, তাতেই কোন 'বুরা' খবর এসেছে। সুরতিয়ার নিজের ওপর রাগ হল—সাত সকালে এমন একটা খারাপ খবর এনে দেবার জন্যে।

শিবানী যেন এ লোকে নেই। এই হোষ্টেল বাড়ী থেকে, গৌহাটী শহরটা থেকে ওর মন চিন্তা-পাখির পাখায় ভর করে যেন চলে গেছে অনেক অনেক যোজন দূরে—তাদের ছায়াসুনিবিড় গ্রামটায়। যেখানে সে আর শুভ্রেন্দুর মিলিত জীবন কেটেছে অনেকগুলি বছর ধরে। যেখানকার পথ-ঘাট, লতা-পাতা, গাছপালায় এখনও হয়তো লেগে আছে ওদের দু'জনের মিলিত নিঃশ্বাস।

—দিদিমণি!

সুরতিয়ার ডাক শুনে চমক ভাঙ্গে শিবানীর। চোখের কোণে ওর জলবিন্দু চিক্‌চিক্ করছিল। চাঁপার কলির মত আঙুল

দিয়ে মুছে ফেলে সে জল। মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে বলে :

—কি রে সুরতিয়া ?

—দিদিমণি, তুমি 'কানছিলে' ?

—না রে, চোখে কি যেন একটা পড়েছিল।

কান্না-ভেজা ঈষৎ কাঁপা কণ্ঠেই বলে শিবানী। শত চেষ্টাতেও ওর মনোভাব লুকোতে পারে না সুরতিয়ার কাছে।

—কোন খারাপ খবর আসিয়েছে নাকি দিদিমণি ?

—না, খারাপ আর কি।

—আমাকে লুকাচ্ছ দিদিমণি।

—নারে, না, সত্যি কোন খারাপ খবর নয়।

—তবে 'কানছ' কেনে ? আমি মানুষটা যে ঘরে এলাম তা মালুমই হ'ল না তোমার! যেন হুঁস নেই। ডারিয়ে ডাড়িয়ে যেন খোয়াব দেখছ বলে মালুম হল।

—ও কিছু নয়, একটা কথা ভাবছিলাম। তা তুই কি কিছু বলতে এসেছিলি ?

—আসিয়ে ছিলাম ত। এত বেলা হইয়ে গেল, তবু তুমি খেতে যাচ্ছ না বলে ঠাকুরমোশায় হামাকে বলল—ওরে সুরতিয়া, দেখ ত' তোর শিবানী দিদিমণি আসছে না কেন ? তাই ত চলে এলাম।

—তাই ত। কটা বাজে ? বা-র-টা ? চ' চ' শিগ্‌গীর।

বলে কপট হাসি মুখে চোখে মেখে সুরতিয়ার হাত ধরে হিড়হিড় করে বারান্দা দিয়ে টেনে নিয়ে চলে ও।

অবাক হয় সুরতিয়া। এ আবার কি রকম 'দিল্লগী' করছে তার শিবানী দিদিমণি! একটু আগে যে কথা বলল কান্না ভেজা কণ্ঠে সেই মেয়েরই মুখে কোথা থেকে এক ঝলক খুশী এল জ্যোৎস্নার মত রূপোলী আভা নিয়ে। সুরতিয়া ভাবলো, সত্যিই

ওর শিবানী দিদিমণি অনন্যা—অন্য আর একটাও মিলবে না তার মত এ হোষ্টেলের মেয়ে মহলে।

ততক্ষণে ওরা একতলায় নামবার সিঁড়ির মুখে এসে গেছে। ওদের ডাইনিং হল একতলায়। সিঁড়ির ধাপ ডিঙ্গোতেও পাছে শিবানী ওকে আগের মতই হিড়হিড় করে টানতে থাকে সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে ওঠে সুরতিয়া। বলে :

—আরে, তুমি কি হামারে মার ডালবে নাকি…

—চুপ! ও কথা বলতে নেই।

হঠাৎ গলার স্বরকে অস্বাভাবিক গম্ভীর করে কথা কটা বলে শিবানী। সংগে সংগে ওর গতিতেও পড়ে যতি। থমকে যেন দাঁড়িয়ে পড়ে ও। সুরতিয়া শিবানীর চোখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। এই একটু আগে যে মুখে দেখেছে হাসির বিদ্যুৎ, সেই মুখেই স্তবকিত মেঘমালার মত কাল কঠিন বিমর্ষতা!

—ও কথা বলতে নেই সুরতিয়া—চারদিকেই ত মারামারি হানাহানি চলছে—এখনও যারা পরস্পরের সংগে প্রীতির সম্পর্ক নিয়ে আছে—তাদের ও সব ভাবাও পাপ।

কথা শেষ করেই ধীর পায়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে থাকে শিবানী। সুরতিয়া কুণ্ঠিত পায়ে তাকে অনুসরণ করে। মনে মনে ভাবে, বাবা কি তেজ, কি চমক এ মেয়ের মুখে, এ মেয়ের মনে।

কোন রকমে নাকে মুখে দুটি গুঁজে নিয়েই পাতে হাত ঝেড়ে উঠে এসেছিল দুর্মনা শিবানী। যে চিন্তার জ্বলুনি তার সারা মনটাকে জ্বালাচ্ছে তার হাত থেকে নিস্তার পায়নি সে। সে যেন মনের সংগে বোঝাপড়া করতে চায়। শুভ্রেন্দু—যাকে কেন্দ্র করে তার ভবিষ্যৎ জীবনের সবকিছু আশা আকাঙ্ক্ষা হবে পল্লবিত তাকে এই ভ্রাতৃনিধন যজ্ঞের লেলিহান শিখা থেকে কি করে বাঁচাতে পারে সে—যে কিনা সামান্য এক নারী। কিন্তু তার মত সামান্যা

নারী যাকে কেন্দ্র করে অসামান্যা হ'বার স্বপ্ন দেখে এসেছে আশৈশব তাকে ছাড়া ত' সে নিজেকে অযুগ্ম কল্পনাই করতে পারে না।

কিন্তু শুভ্রেন্দুকে কেন্দ্র করে অত সব ভাববার মত এমন কিছু সামাজিক সম্বন্ধ ত তার গড়ে ওঠেনি ইতিমধ্যে। তবে কেন সে অত গভীরভাবে ভাবছে এ নিয়ে? প্রতিটি মেয়েরই ত' কুমারী জীবনে কত বসন্তের পাখি আসে, প্রত্যেকেই কি আর তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারে? ইংরেজ সমাজে ঐ সব ক্ষণ প্রণয়ীদের ত' উপহাস করে বলাই হয় 'কাফ-লাভ'। যারা আসে তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে সমাজ-স্বীকৃত বিবাহের মাল্যডোরে বন্দী হয়ে তার নিকটে যাবার সুযোগ পায়। কিন্তু তেমন মন্ত্র ত' ওদের দুজনকে পারস্পরিক বন্ধনে বাঁধবার জন্য কোন পুরোহিত আজ পর্যন্ত আওড়ায়নি। তবে কিসের দায়িত্ব তার শুভ্রেন্দুর প্রতি? ওর বিবেক বলল, শিবানী, এমন অনেক দায়িত্ব জগতে মানুষকে পালন করতে হয়—যা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না—উপলব্ধি দিয়ে, হৃদয়-ধর্মের নির্দেশে পালন করতে হয়। তেমন কোন নির্দেশ, কোন সংকেত, কোন আদেশ কি তোমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বতোৎসারিত হচ্ছে না?

বিবেকের এ কথায় লজ্জা পায় শিবানী, নিজেকে অপরাধীও মনে হয়। যুবক শুভ্রেন্দুর মার্জিত মনকে বিজিগীষার স্বপ্নে সে ত আকৈশোরই মগ্ন। নিজের মনের সব চেয়ে সুন্দর এক অনুভূতিতে যার উদ্দেশ্যে সে তার কুমারী কুসুমকে অর্ঘ্য দেবে বলে স্থির সংকল্প করে রেখেছে তার ভাল-মন্দ, আপদ-বিপদ সম্পর্কে সে ভাববে না ত' কে ভাবতে আসবে? পুরোহিতের মন্ত্রনির্দেশে যদিও সে বিবাহ-সভায় সবার সমক্ষে আবৃত্তি করেনি—

যদেতদ্ হৃদয়ং তব
তদেতদ্ হৃদয়ং মম—

তবুও ঐ সংস্কৃত মন্ত্রটার অর্থগত দিকটা হৃদয়ের সুন্দর নির্দেশে বহুদিন

পূর্বেই ওরা দু'জনে জেনে ফেলেছে। আর ওদের এই একান্ত উপলব্ধিটা সার্থকতায় রূপান্তরিত হয়েছে ওদের দু'জনের অভিভাবক-দের প্রশ্রয়েই। তাই ত' ওরা জেনে ফেলেছে জীবনভর ওরা দুটিতে দুজনের সাযুজ্য থাকবে।

বয়সের উপান্তে এসেও একদিন শিবানীর মা পড়শী শুভ্রেন্দুর মায়ের কাছে ক্ষেদ করছিল যে, তার মাতৃজঠরে কোন কুমার কার্ত্তিকেয়র আবির্ভাব হল না বলে। আশৈশব শিবলিঙ্গে জল ঢেলে যে মনস্কামনা জানিয়েছিলেন তা যে হল ব্যর্থ। কামরূপের কামাখ্যা মন্দিরে গিয়েও সেবার পুত্রার্থে ধর্ণা দিয়েছিলেন। করেছিলেন কত রকম অভিচার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এ ক্ষেদের উত্তরে শুভ্রেন্দুর মা বলেছিল ঃ

—আক্ষেপ কেন করছেন ভাই, শুভ্রকেই ছেলে করে নিন না।

—সত্যি বলছেন !

বিগলিত কণ্ঠে বলেছিল বিস্ময় বিমুগ্ধ রুণীবালা।

—হ্যাঁ, সত্যি, সত্যি, সত্যি।

তিনসত্যি গেলে বলেছিল শুভ্রেন্দুর মা মমতাময়ী।

—অবশ্য আপনার কাছে আমারও একটা দাবী আছে।

— বলুন দিদি, দেবার হলে সে দাবী মেনে নেব আমি।

—আমার দাবী হ'ল আপনার শিবানী। আমারও ত ছোট বেলা থেকে শখ ছিল একটি কুমারী গৌরী তার আলতারাঙ্গানো নরম রাঙ্গা পা ফেলে আমার ঘরময় ঘুরে বেড়াবে। সে সাধ ত' ভগবান পুরণ করলেন না।

—এ বেশ হল।

উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল শিবানীর মা রুণীবালা। সেইদিন থেকে পাশাপাশি বাড়ীর বা[illegible]ী ছেলের মা ও অসমীয়া মেয়ের মা— শুভ্রেন্দু ও শিবানীর মিলিত ভবিষ্যৎ স্থির করে রেখেছিল। বলা বাহুল্য তারপর থেকে মমতাময়ীর সংসারে মঞ্জুল মুখের কুমারী

গৌরীর আলতা রাঙ্গানো পা চলে ফিরে বেড়িয়েছে—আর রুণীবালার বাড়ীতে শুভ্রেন্দু যখন তখন যে ভাবে যাওয়া আসা, হাঁটা চলা করেছে সেটা বাড়ীর ছেলেরই মত।

গৌহাটীর অবস্থার ক্রমাবনতি হয় দিনের পর দিন। কুখ্যাত ছাত্রনেতার উস্কানিতে সবকিছু রুচি ও শালীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে ছাত্ররা মেতে ওঠে যেন আসামবাসী বাঙ্গালীমেধ যজ্ঞে। থেকে থেকেই আসপাশ থেকে হল্লার শব্দ ভেসে আসে শিবানীদের কানে। শব্দ আসে বোমার সেল ফাটার। প্রতিটি শব্দই যেন শিবানীর বুকে মারে হাতুড়ির ঘা। আর পরক্ষণেই ওর মনের পর্দায় ভেসে ওঠে শুভ্রেন্দুর মুখখানা।

একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছিল অনেক আগে। সেদিন ত' সান্ধ্য আইনও জারি করা হ'ল। কিন্তু নেতাদের চোখ রাঙ্গানিতে তা তুলে নেবার পরই ঘটল ডনবস্কো স্কুলের কাছে সেই শোচনীয় ঘটনা। মধ্যাহ্নের সূর্য্য বিদায় গোধূলিতে পৃথিবীর বুকে ম্লানিমা ছড়িয়ে চলে যায় অস্তাচলে। গৌহাটী শহরের বুকে নেমে আসে সন্ধ্যার আবছায়া। শিবানীর মন চিন্তার অথৈ সাগরে যেন সারাদিন ধরে ডুবুরি মাছের মত হাবুডুবু খাচ্ছে। ওর ঘরটাও তখন আঁধারের আবছায়ায় ডুবে আছে।

আসপাশের ঘরে আলো জ্বলছে, অথচ শিবানীর ঘর আঁধার দেখে সুরতিয়া বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘরে ঢুকে মুহূর্তে সুইচটা টেনে দেয়। বিজলী বাতির আলোর ঝলকানিতে ভরে যায় ঘর। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শিবানীর মনের অন্ধকারেও একটা সংকল্পের আলো যেন ঐ বাল্বটার মতই দপ্ করে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। মননিভৃতের সেই উজ্জ্বল আলোই যেন শিবানীকে পথের নিশানা দিল, উদ্দীপ্ত করল তার সংকল্পকে—সারা সত্তায় একটা উচণ্ড উজ্জীবন বইয়ে দিল। সুরতিয়া হাসি মুখে বলল :

—কি মেয়ে তুমি দিদিমণি, সেই কখোন থেকে ভাবছ—অথচ কেন ভাবছ তা হামারে বললে না। কি হইয়েছে তোমার বলনা হামায়, হামভি ত' এক জেনানা আছি—তোমার দুঃখ কোষ্টো হামি ঠিক বুঝিয়ে লিবে।

—হ্যাঁ, সত্যি। তুই বুঝবি সুরতিয়া, ঝিয়ের কাজ করিস বলেই তোর কোন সুষ্ঠু চিন্তাশক্তি নেই এ আমি বিশ্বাস করি নে।

—তবে আর কিন্তু হচ্ছো কেনে, বলিয়ে ফেল।

—শুনবি সব? না থাক, এখন নয়।

—কেন কি হল আবার? আখুন ত' এ কামরায় আমি ছাড়া কই না আছে?

—তবু এখন বলব না। বাংলায় একটা কথা আছে জানিস ত' 'দেওয়ালেরও কান আছে।'

—তবে কখুন বলবে?

—যখন সব মেয়েরা ডাইনিং রুমে খেতে যাবে—তখন চুপিচুপি চলে আসবি। তখন তোকে সব খুলে বলবো। সত্যি রে, দ্বিতীয় কারো কাছে আমার মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সমস্যা-উদ্বেগ খুলে বলতে পারলে যেন বুকটা হাল্কা হতো।

—বেশ, তখুনই আসবো হামি। কিন্তু অত চিন্তা কেন করছ, চিন্তা করলেই কি নিশানা মিলবে? সঞ্ঝে বেলায় ত' কিছু খেলে না। এক কাপ চা আনিয়ে দেব?

—চা? আচ্ছা যা, নিয়ে আয়।

শিবানী ওর কথা শোনায় সুরতিয়া মনে মনে খুশি হয়ে হালকা পায়ে চলে গেল ক্যান্টিনের দিকে।

'ভারতরত্ন' পণ্ডিত নেহ্‌রু, ভারতকে, তার ঐক্যকে তুমি কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছ? যে ভারত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের সংকল্প হ'ল 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি'—সেই ভারতের প্রধান মন্ত্রী হয়ে এবার স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে তুমি বলে বসলে 'বাংলা বা আসামের স্বার্থের চেয়ে ভারতের স্বার্থ অনেক বড়'। পণ্ডিত নেহ্‌রু, ভারতবর্ষ বলতে তুমি কোন্ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটুকুকে বোঝ? বাংলা ও আসামকে ত্যাগ করলে, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটকে ছেড়ে দিলে, কেরল ও মাদ্রাজকে ছেঁটে ফেললে, এরপর মহীশূর, বিহার, উড়িষ্যা সবই যদি একে একে চলে যায় তবে কোন্ ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলে তুমি নিজেকে মনে করবে? ভারত নামের কোন পৃথক স্থান ত নেই। "জন গণ মন" সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে প্রকৃত ভারতবর্ষের পরিচয় দিয়ে গেছেন কবিগুরু তাঁর পরিণত চিন্তার স্বাক্ষরসহ ছন্দবদ্ধ বাণীতে। তুমি বিজ্ঞ নেতা হয়েও সেই মহান কথাটাকে কটাক্ষ করে নিজেকে কত না ছোট করলে।

হ্যারোর ছাত্র নেহ্‌রু, ছাত্রাবস্থায় তুমি ইতালীর গ্যারিবল্ডির জীবন-চরিত পড়ে তার মত তুমিও না ভেবেছিলে—

"এক জাতি একপ্রাণ একতা"?

কিন্তু আজ তোমার কাজে ও কথায় কেন সেদিনের সেই সুন্দর ও বাস্তব চিন্তা হারিয়ে যাচ্ছে? কেমব্রিজের 'ভারতীয় মজলিশে' তুমি বক্তৃতা দিতে। উঠে হাঁফিয়ে গিয়ে বসে পড়তে—কিন্তু সেই বুঝি ছিল ভাল তা' হ'লে কাজের ভেতর দিয়ে জাতি তোমাকে পরিপূর্ণ

করে পেত—শুধু তোমার কথার ফুলঝুরিতে তাদের পস্তাতে হতো না। নরওয়ের শীতল ঝর্ণার জলে ডুবন্ত তোমায় রক্ষা করেছিল তোমার ইংরেজ বন্ধু—আজ যখন ভারতীয় জাতি নিমজ্জিত হচ্ছে ভ্রাতৃঘাতি কলহের বারিধিতে তখন তোমার দুর্বল শাসন কি তাকে বাঁচাতে পারবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জোড়াতালির নীতিতে চলছ তুমি, সে নীতিতে অবিচল থেকে ভারতের ঐক্য অটুট রাখা সম্ভব নয়। তাই বলছি পণ্ডিত নেহ্‌রু তুমি ভুলই করছ; হ্যাঁ, তুমি ভুল করছ।

খেতে যাবার ঘণ্টা পড়তে মেয়েরা যে যার ক্রিয়মান কাজ ফেলে রেখে খেতে ছুটল ডাইনিংরুমে। কিন্তু শিবানী তখনও তার বিছানায় চিন্তা সংগী করে শুয়ে। মেয়েদের স্লিপার ও খড়মের শব্দগুলো দূরে মিলিয়ে গেলে শিবানী উৎকর্ণ হয়ে উঠল সুরতিয়ার আগমন আশা করে। কিছুক্ষণ পরেই খোলা দরজা দিয়ে সুরতিয়া সুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে শিবানীর কাছাকাছি এসে চাপা গলায় বলল:

—হাঁ, আখুন বল, আর সব মেয়ে চলিয়ে গেছে।

কথা শেষ করে সাবধানের মার নেই ভেবে বুঝি আবার বারান্দায় গিয়ে সঞ্চরণশীল সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক দেখে এলো সুরতিয়া।

শিবানী একটুক্ষণ গুম্ মেরে বসে থেকে ধীরে ধীরে সব কথা খুলে বলল সুরতিয়াকে। তার কথায় শুভ্রেন্দুর প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসার সৌরভ যেন আগ্রহী শ্রোতা সুরতিয়ায় নাসারন্ধ্রে সুগন্ধীকৃত ঘ্রাণ হয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল। শেষে কাল রাতের বিশ্রী স্বপ্ন আর আজ সকালে তার পত্র পেয়ে সে যে কতটা বিচলিত হয়েছে—সারাদিন ধরে তার চিত্তবিক্ষেপ কোন পর্যায়ে উঠেছে তাও অকপটে বলল সে সুরতিয়াকে। একান্ত মনযোগে সব শুনে গেল সুরতিয়া। কথা শেষ করে শিবানী বলল:

—তাই আমি ঠিক করেছি, আজ রাতেই চলে যাব হোষ্টেল ছেড়ে।

—হায় রাম!

গালে আঙ্গুল ছুঁইয়ে চোখ বড় ক'রে বিস্ময় প্রকাশ করে সুরতিয়া। তারপর মুখ তুলে বলে:

—লেকিন সুপারিণ্টেন তো বলিয়ে দিয়েছে বাড়ী থেকে নিতে না এলে কোন মেয়েকে হোষ্টেল ছেড়ে যেতে দেয়াই হোবে না। দিন মে ভি কৈ কো বাহার জানা মানা হায়।

—সেই জন্যেই ত রাতে আমায় পালিয়ে যেতে হবে।

কথাটা শোনামাত্র আঁতকে ওঠে সুরতিয়া। বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে শিবানার মুখে চেয়ে বলে:

—শিবানী দিদিমণি, তুমি!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি রে সুরতিয়া, আমি। তোর শিবানী দিদিমণিকে আজ রাতেই এ হোষ্টেল ছেড়ে, গুয়াহাটী শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে।

—কিন্তু ওরা যদি তোমায় রাস্তায় একলাটি পেয়ে বে-ইজ্জৎ করে?

—তবু আমায় যেতে হবে রে, তবু যেতে হবে।

উদ্রিক্ত শিবানী দৃঢ় প্রত্যয়ে কথাটা বলে টেবিলে ভর দিয়ে আনত মুখে দাঁড়িয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে ওঠে।

—জানিস সুরতিয়া, কাল রাতে সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা দেখবার পর থেকে সর্বক্ষণ আমার মন দারুণ এক অমঙ্গল আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপছে। তুইই বল সুরতিয়া—কোন নারীর ইজ্জৎ বড় না পুরুষের জীবন?

উদ্বেজনে উদ্বেল হয়ে প্রশ্ন করে শিবানী। সুরতিয়া প্রশ্নটা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠিকই ত যে পুরুষের জন্য নারীর ইজ্জৎ বাঁচিয়ে রাখা; যে পুরুষ তার নারী জীবনের একমাত্র উপভোক্তা—

সেই যদি না রইলো—তবে কি হবে এ ইজ্জৎ নিয়ে? নিশ্চুপ সুরতিয়ার কাছ থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে শিবানী নিজেই তার উত্তর দেয়:

—কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও নোয়াখালির দাঙ্গার পর ঠুনকো মন নিয়ে নারীর ইজ্জতের বিচার যারা করবে, তাদেরই প্রশ্ন করি—যে ক্লীব শাসন, যে ক্লীব সমাজ দুর্বৃত্তের হাত থেকে নারীকে রক্ষা করতে পারে না তাদের কী অধিকার আছে নারীর ইজ্জৎ বিচারের?

—রাম জানে কি হোবে। তবে তোমার মত অবস্থায় পড়লে হামিও বোধ হয় এই ভাবতাম। কিন্তু রাতে ত' দারোয়ান কিষেণজিৎ বাহারকা গেটমে তালা মারিয়ে দেবে। বাহার যাবে কি করে?

—আমার নিজের দিদি নেই সুরতিয়া। যদিও আমায় তুই দিদিমণি বলিস, কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে ও সম্মান তোরই প্রাপ্য—তোর বোনের এতবড় বিপদে কি এ ভার তুই নিবিনে? বল সুরতিয়া?

সুরতিয়ার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে আকুল আবেদন জানিয়ে বলে শিবানী।

বহিন! হ্যাঁ বহিন বই কি। ভারতের যত জেনানা, লেড়কি, সবই ত' পরস্পর বহিন, যত মর্দ্দানা, যত পুরুষ, সবই ত' পরস্পর ভাই। তবু কেন এই ভ্রাতৃঘাতি হনন যজ্ঞ? আসাম প্রদেশে যখন এমনি ভ্রাতৃমেধ যজ্ঞের হাহাকার উঠেছে আকাশে বাতাসে তখন বিহারী এক বোনকে এক অসমীয়া মেয়ে ভগ্নীত্বের রাখিবন্ধনে করল আবদ্ধ। আনন্দে, খুশিতে উপহত সুরতিয়ার চোখের কোণে জল টলমল করে। উচ্ছ্বসিত হয়ে আর্দ্র স্বরে ও বলে:

—হাঁ হাঁ শিবানী বহিন, কিঁউ নেহি, হামি সব ঠিক করিয়ে দেব, সব ঠিক করিয়ে দেব।

—সত্যি, তুই আমার দিদি সুরতিয়া, সত্যি আমার দিদি—

বলে সুরতিয়াকে শিবানী সাগ্রহ বাহু বাড়িয়ে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে।

বেশ কিছুটা দূরে কোন মেয়ের চপ্পলের শব্দ শুনে ওরা দু'জনে সতর্ক হ'য়ে আলিঙ্গন থেকে বিযুক্ত হয়। আর সুরতিয়া গলার স্বর স্বাভাবিক করে কপট স্বরে বলে ঃ

—মন খারাপ হয়েছে তাতে ভাত কি দোষ করল বল। বাঙ্গালী লোক ত যত গুস্‌সা করবে ভাতের ওপর, লেকিন তুমহি অসমীয়া লেড়কী, তুমি কেন রাগ করে ভাত খাবে না।

বাইরে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে খোলা দরজার কাছে থেমে বিরজা সুরতিয়ার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে একটু। আর তখন সুরতিয়ার উপস্থিত বুদ্ধিতে মুগ্ধ শিবানী তার দিকে পেছন ফিরে হাসি চাপবার প্রাণপণ চেষ্টায় নিরত।

মেয়েটি চলে যেতে সুরতিয়া স্বর নামিয়ে নরমকণ্ঠে বলে ঃ

—হাঁ চলিয়ে গেছে। এবার চল ত চটপট দুটি খেয়ে লিবে।

শিবানী ঘুরে দাঁড়িয়ে সুবোধ বালিকার মত অনুসরণ করে সুরতিয়াকে। এগিয়ে যায় ওরা দুটিতে ডাইনিং হলের উদ্দেশ্যে।

রাত নিঝুম। হোষ্টেল বাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে অতন্দ্র সুষুপ্তির অতলান্তে। মেয়েদের সবকটি কামরার জানালা ও দরজাপথে বাইরে আসা আলোর অস্তিত্ব আর নেই। ঠাকুর, চাকর, বেয়ারা, ঝি থেকে সবাই তখন গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কেবল জেগে আছে সুরতিয়া—মনে ভয়—কিন্তু অন্তরে একটা মহৎ কাজ করার সঙ্কল্প।

আর প্রবল উৎকণ্ঠায় বুকের প্রতিটি নিঃশ্বাস ভরিয়ে জেগে আছে উন্নিদ্র শিবানী। ইতিমধ্যে সে তার মাঝারি সুটকেশটায় গুছিয়ে নিয়েছিল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। অনেকদিন পর সুটকেশের একেবারে তলা থেকে শুভ্রেন্দুর ফটোটা বের ক'রে অনেকক্ষণ চোখের

সামনে তুলে ধরে রইলো। ফটোটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখের কোলে জল এসে পড়েছিল। স্ফুরিত অধরে অস্ফুট স্বরে বলছিল ঃ

—হ্যাঁ, অভিসারিণী আমি তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো—এই এত যোজন দূর থেকে। যত ঝড় ঝঞ্ঝা বাধা বিঘ্ন আসুক—তোমার নাম নিয়ে সব বিপদ কাটিয়ে আমি আসছি গো, আসছি !

সুটকেশ গুছাবার সময় একবার ওর মনে হয়েছিল যদি ওর এক সেট মেখলা-চাদর থাকত তবে ভাল হ'ত। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মন একটা দৃঢ়তায় ভরে যায়। ভেবেছিল লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মেয়ে এই আসামে যে বিপদ বরণ করে নিচ্ছে শাড়ি পরার হাস্যকর অপরাধে, সেই বা পারবে না কেন সে বিপদ বুক পেতে নিতে।

দূরে থানার পেটা ঘড়িতে এগারোটা বাজবার ঘণ্টা পড়ল। এক দুই তিন করে শিবানী গুণল সবকটি আওয়াজ মনযোগ দিয়ে। ওর হাতেও অবশ্য একটা রিষ্টওয়াচ ছিল—যেটা ওকে শুভ্রেন্দুই দিয়েছে আই-এ পরীক্ষার ফল ভাল করেছিল বলে। ব্যস্ততায় সেটা দেখতে ভুলে গেছে ও এতক্ষণ।

এগারোটার ইঙ্গিতেই ও যেন উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। এগিয়ে গিয়ে অতি সন্তর্পণে খুলল দরজা। লম্বা বারান্দার দু'মাথায় দুটি কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। ও ওর ঘরের দরজার ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে আড়ালে রেখে গলা বাড়িয়ে অপর প্রান্তে চাইলো একতলায় নামবার সিঁড়ির দিকে। না, কোন সাড়া শব্দ কোথাও নেই এই এতবড় হোষ্টেল বাড়িতে। একতলার সিঁড়ি দিয়ে বলের মত একটা কালো মাথা ক্রমশ তার সারা দেহ নিয়ে প্রকাশ পেল সিঁড়ির শেষ মাথায়। হ্যাঁ সুরতিয়া। বারান্দায় উঠে সে সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে প্রথমে সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিল। তারপর এদিক ওদিক চাইতে চাইতে সন্তর্পণে এগিয়ে এসে দ্বিতীয় আলোটারও সুইচ তুলে দিল ওপরের দিকে। গভীর কালো

এসে গ্রাস করল সারাটা বারান্দা। সুরতিয়া একটা ছায়ামূর্তি হয়ে এগিয়ে এলো নির্দিষ্ট দরজায়। কামরায় ঢুকতে গিয়ে শিবানীর সংগে সে ধাক্কা খেলো। সংগে সংগে তাকে দু'হাতে ধরে সামলে নিল। চাপা গলায় বলল :

—সব আলো বুতিয়ে দিয়েছি দিদিমণি, আখুন চল।

শিবানী শোনামাত্র তার সুটকেশটা হাতে তুলে নেয়। ক'পা এগোতে পায়ের লেডি সু'র আওয়াজ হতে সেটা পা থেকে খুলে ফেলে। সুরতিয়া সেটা হাতে তুলে নেয়। ওরা দুজনে ঘরের বাইরে আসে। সুরতিয়া দোরটা টেনে দেয় শব্দ না করে। তারপর টিপিটিপি পা ফেলে এগিয়ে চলে একতলার সিড়ির দিকে। ওদের চোখ ততক্ষণে আঁধার-সওয়া হয়ে গেছে। দুটি নারীমূর্তি সতর্ক দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে চাইতে চাইতে সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলে একতলার দিকে।

অবশেষে ওরা একতলায় নামে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কিষেণজিতের ঘরের দিকে। একটু এগিয়ে সুরতিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলে :

—দিদিমণি, তুম্‌হি ঐ থামটার আড়ালে একটু ডাড়াও। হামি আগে দারোয়ানকে ডাকিয়ে লিই। হঠাৎ তোমাকে দেখিয়ে সোর করে উঠবে ত বহুত মুস্কিল হোবে।

সুরতিয়ার কথামত শিবানী বড় একটা থামের ছায়ার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। সুরতিয়া পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় কিষেণজিৎ-এর ঘরের দিকে। কপাটের কাছে এসে আঙ্গুলের পিঠ দিয়ে দরজায় টোকা মারে। এই একটু আগেও তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছিল কিষেণজিৎ। সবে শুয়েছে বলা চলে। তখনও চোখের সংগে নিদ্রার বোঝাপাড়া শেষ হয়নি। এমন সময় দরজায় আবার কে টোকা মারে রে বাপু। এত রাতে কোন কাজে বাইরের হানাহানির মধ্যে গিয়ে পাছে কোন ঝামেলায় পড়তে হয়—তাই

ও ভাবে সাড়া দেবে না। কিন্তু আবার যে টোকা পড়ে, হ্যাঁ আবার। না, আর চুপ করে থাকা যায় না। যদি সুপারিণ্ঠনই তলব করে থাকে। তাই বাধ্য হয়ে সাড়া দেয় সে ঃ

—কৌন ?

—হামি, সুরতিয়া।

চাপা গলায় বলে সুরতিয়া।

—শোনা মাত্র যেন শক খায় কিষেণজিৎ। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে উঠে বসে কম্বলের ওপর। আনন্দ-উদ্বেল গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে বলে ঃ

—সাচ্ ?

পরমূহূর্তেই উঠে পড়ে। খাটিয়া থেকে নেমে খুট্ করে দরজার ছিটকিনি খুলে ডাল রোটি খাওয়া দশাসই চেহারা নিয়ে কিষেণজিৎ একেবারে সুরতিয়ার ঘাড়ে এসে যেন পড়ে।

—আ মল যা! গায়ে আসিস্ কেন ?

—ক্যা ?

—চাবিটা লিয়ে এসো। বাহারকা গেট খুলতে হোবে।

রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে যেন কথা বলে সুরতিয়া।

—কাঁহে ?

—কাজ আছে হামার।

—অডর নেহি।

—ও সব অডর ফডর বুঝি না দারোয়ানজী, এত রাতে পর জেনানার সাথ বাতচিত্ত করছ—আব তার কথায় দরজাটা খুলবে না।

—আরে বাবা, সুপারিণ্ঠন জানতে পারলে নৌকরি লিয়ে লিবে।

—আ-হা-হা, কি বুদ্ধি মিনসের ? দরওয়াজা খুললে নৌকরি লিয়ে লিবে আর ভর রাত পর-জেনানার সাথে বাতচিত্ত করলে নৌকরিতে বসিয়ে রাখবে। খুলবে ত খোল নইলে হল্লা করব আমি—হামাকে বে-ইজ্জত করছ বলে।

—হায় রামজি। এ সুরতিয়া, মেরা বাত তো শুন?

কিষণজিতের মিয়োনো গলায় অনুনয় ঝরে।

—বাত ফাত যা বলবার পরে বলবে দারোয়ানজী, এখন দরওয়াজা খোল। নইলে আখুনই চেঁচিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে বলব হামার সঙ্গে মস্করা করছিলে তুমি। সুপারিণ্ঠেন বুলাইছে বলিয়ে হামারে ঘর থেকে লিয়ে এসে বে-ইজ্জৎ করছ।

—লেকিন এ সুরতিয়া, মেরা বাত তো শুন, দরওয়াজা খুলে কি নাফা হোবে তোর?

—নাফা হোক লুসকানি হোক হামি বুঝবো, পহেলে খোল দরজা।

জেদি কণ্ঠে বলে সুরতিয়া।

সুতরাং নৌকরি বাঁচাবার নাযান্যঃ পন্থা হিসাবে কিষেণজিৎকে ট্যাঁক থেকে চাবির গোছাটা বের করতে হ'ল। সে এগিয়ে গেল মেইন গেটের দিকে। আর সুরতিয়াও এই অবসরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে থামের আড়াল থেকে শিবানীকে ডেকে নিয়ে এলো।

শিবানীকে দেখে কিষেণজিৎ ভূত দেখার মত চমকে ওঠে।

—দিদিমণি, আপ!

—উঁহু, কোই বাত মত কর দরোয়ানজী, আখুন যেতে দাও দিদিমণিকে।

শিবানী ও সুরতিয়া গেটের বাইরে এগোয়। সুরতিয়া হতবাক কিষেণজিতকে বলে:

—উঁহু, ওটি হোবে না দারোয়ানজী, তুমিও বাহার চলো, নইলে হামি বাইরে থাকলম আর গেট বন্ধ করিয়ে দাও আর কি?

কিষেণজিৎও আর কথা না বাড়িয়ে যন্ত্রচালিতের মত বাইরে আসে ওদের সংগে। কিন্তু সংগে সংগে ওদের চোখে পড়ে দূর থেকে উর্দ্ধশ্বাসে একটা গাড়ী তীব্র হেড-লাইট জ্বেলে এগিয়ে আসছে হু হু করে। সুরতিয়া ভীতকণ্ঠে বলে:

—দিদিমণি, আখুন বাহার না থাক, কার্ফু আছে ত, মিলিটারী গাড়ী হোবে।

শোনামাত্র শিবানীর সারা গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওরা তিনজনে গেটের ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই মিলিটারী ভ্যানটা সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যায় রাস্তার বুক বেয়ে। গাড়ীর চাকা ও পথের ঘর্ষণে ওঠা শব্দ মিলিয়ে গেলে বাইরে আসে ওরা। শিবানী সুরতিয়ার হাত থেকে জুতোটা নিয়ে নিতে নিতে ভেজা গলায় বলে ঃ

—সুরতিয়া, চলি'রে, তোর ঋণ জীবনে শোধ হবে না। সত্যিই বুঝি আগের জন্মে তুই আমার দিদি ছিলি।

শুনে সুরতিয়ার চোখে জল এসে যায়। ধরা গলায় বলে ঃ

—ভগওয়ান তোমার ভালা করুক দিদিমণি।

কথাটা বলে সুরতিয়া মনে মনে রামজির করুণা মাগে। কালো শাড়িতে দেহ সুষমা আবরিত শিবানী আর কালবিলম্ব না করে কার্ফ্যুর কালো আঁধার রাস্তায় মিশে গিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলে। পেছনে পড়ে থাকে সুরতিয়ার মত মহৎ মনের এক মেয়ে, পড়ে থাকে ধাঁধাঁ খাওয়া কিষেণজিৎ আর নিঝুম স্তব্ধ বোবা হোষ্টেল বাড়ীটা।

খানিকটা এগোতে না এগোতেই বোধ হয় সেই মিলিটারী গাড়ীটা উর্দ্ধশ্বাসে গতি ফিরিয়ে আবার ছুটে আসছে দেখতে পায় শিবানী। ভয়ে, উৎকণ্ঠায়, উদবেজনে ওর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড দুটো যেন পরস্পর ঠোকাঠুকি সুরু করে দেয়। হঠাৎ যেন ওর মাথায় আসে না—কি করে ঐ দ্রুত ছুটে আসা নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে; রক্ষা করবে শুভ্রেন্দুর ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎকে। হঠাৎ সামনেই একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখে—তার গুড়ির আড়ালে অতি সন্তর্পণে দ্রুত গিয়ে দাঁড়ায় সে। গাড়ীটা ছুটে গাছটার পাশ দিয়ে পথ বেয়ে বেরিয়ে যেতে না যেতে ও তড়াক করে অপর দিকে নিয়ে যায় নিজের দেহটাকে।

গাড়ীটার শব্দ শোঁ শোঁ করে দূরে মিলিয়ে যেতে ও একটা নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলে। নাঃ, আর দেরী নয়, আর বড় রাস্তা দিয়েও নয়, হন হন করে হেঁটে সামনের একটা গলিতে ঢুকে পড়ে শিবানী। মনের সবটুকু জোর দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলে। বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে শিবানী এগিয়ে চলে ওর গন্তব্যের দিকে রেল ষ্টেশনের দিকে।

ষ্টেশনের আর বড় বাকী নেই। কেননা হঠাৎ একটা ইঞ্জিনের তীব্র তীক্ষ্ণ সিটি ওর কানে আসে। শিবানী মনে মনে ভগবানের উদ্দেশ্যে নতি জানাতে যেতেই রাত্রির নিস্তব্ধতা খান্ খান করে একটা বিকট কণ্ঠের কুকুর ঘেউ ঘেউ শব্দে পাড়া মাত করে চীৎকার করে ওঠে। শোনামাত্র দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে সুরু করে ভীষিত শিবানী। কিন্তু কুকুরটা পথের নয়, পোষা কুকুর। একটু পরেই প্রভুর কথায়—শান্ত হয় সে। ভাবিত শিবানী কিন্তু তখনও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতেই থাকে। অবশেষে ও যখন গতি শ্লথ করে, তখন গতিহারা ইঞ্জিনের বিলম্বিত শ্বাস কানে আসে ওর।

প্ল্যাটফর্মে ঢুকে দ্রুত পায়ে ও এগিয়ে যায় টিকেট উইণ্ডোতে। ফোঁকরের মধ্যে টাকাসহ হাত গলিয়ে গন্তব্যস্থল বলতেই বাঙ্গালী বুকিং ক্লার্ক সঙ্গে সঙ্গে বলে :

—এই ত দাঁড়িয়ে আছে আপনার গাড়ী ; এখুনি ছাড়বে। দ্রুত হাতে টিকিটটা নিয়ে ফেরতা পয়সা না গুণেই শিবানী ছুট দেয় গাড়ীর উদ্দেশে। কামরায় উঠে বাথের একটা অংশ অধিকার করে বসে ও যেন হাঁফ ছাড়ে। সংগে সংগে ঘণ্টা পড়ে, বাঁশী বাজে গার্ডের মুখের—ফু-র্-র্-র্। সিটি দেয় ইঞ্জিন—বিশ্রাম ছেড়ে নড়ে চড়ে উঠে চলতে থাকে বগিগুলো।

(নেহ্রু, তুমি কি অস্বীকার করতে পার, বাংলা দেশই জাতীয় আন্দোলনে পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় নিজের বিপ্লবী সত্তারূপ পাঁজর দিয়ে তৈরী করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বজ্র ? স্বাধীনতা সংগ্রামের বহুতর অস্ত্রের মধ্যে সেই বজ্রই বৃটিশকে ভাবিয়ে তুলেছিল বেশী। বাঙ্গালীর বজ্র হেনে স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করে আজ কি সেই বাঙ্গালীকেই অবশিষ্ট ভারতের সুখ সুবিধা থেকে বঞ্চনার বেড়াজালের বাইরে ঠেলে দিতে চাও তোমরা ? বহু বাঙ্গালীর মুখে এ অভিযোগ শুনলেও মতিলাল-স্বরূপরাণীর আদরের তুলাল, মহাত্মা গান্ধীর খাঁটী জওহর যে এতটা খাদে নেমে যাবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। বিশ্বাস করতে হলে আমার মনকে বড় ছোট করতে হয়। মনুষ্যত্বকে, যা সবচেয়ে বড় মনে করি, ধূল্যবলুণ্ঠিত করতে হয়। তোমার সম্পর্কে আমার কেন, জাতীয়তাবাদী প্রকৃত ভারতবাসী মাত্রেরই একটা স্বপ্ন আছে। সে স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ক এ আমি চাই না। তাই আমি মনে মনে ভাবি, তোমার ভাঁজ ভাঙ্গা চোগাচাপকান ও বাটন-হোলের লাল গোলাপ পলিটিক্স-এর পঙ্কিলতায় কালো হবার আগেই কেন তুমি মন্ত্রীর মসনদ ছেড়ে জনতার হৃদয়ের নেতার মসনদে গিয়ে বস না নেহ্রু।

যে জওহরলাল আজ আসামে ঘটা বর্বরতা ও নৃশংসতার নিন্দা প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত—সে সাজানো জওহরলালের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।

গাড়ী ভিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যাল ছাড়িয়ে ভ্রান্ত উপপ্লবে মত্ত গৌহাটীকে পেছনে ফেলে ছুটে চলল প্রান্তরের বুক চিরে। শিবানী এতক্ষণ যেন কি এক নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে ছিল। ক্রমশঃওর চিন্তা, অনুভূতি স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। উন্মজ্জনে মনটা ওর হ'ল বাস্তবমুখী। কামরার মানুষগুলোর মুখে চেয়ে ওর মনে হ'ল অসমীয়া ও বাঙ্গালী যাত্রীরা যেন দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। অসমীয়াদের মুখেচোখে নিশ্চিন্ততার দ্যুতি আর বাঙ্গালী যাত্রীদের মুখ চোখে সেখানে শঙ্কা ও অনিশ্চয়তা। ভয় ও ত্রাসের একটা অদৃশ্য কালো আবরণে যেন তাদের মুখের স্বাভাবিক সচ্ছন্দ ভাবটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ও দেখল কয়েকজন অসমীয়া তরুণ যাত্রী তার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে কি যেন আলোচনা করছে অনুচ্চস্বরে। শিবানীর মনে হল—অন্ততঃ আজকের জন্য মেখলা-চাদর পরে এলে সে ভাল করত। মানুষের পরিচয় যেখানে পোষাকের পরিচয়ে নির্ণেয় সেখানে একমাত্র পোষাকই তার সম্ভ্রম বাঁচাতে পারত। এতক্ষণে যেন বুঝতে পারে ও মেখলা-চাদর না পরবার ব্যাপারটায় ভাবালুতা করা তার উচিত হয় নি। তার না হয় নাই ছিল মেখলা-চাদর কিন্তু সুরতিয়াকে দিয়ে ত কেনাতে পারত। যা'হক, যা হয়ে গেছে, যে তীর হাত থেকে ছুটে গেছে তা নিয়ে আফশোষ করে কোন লাভ নেই। শিবানীর চোখজোড়া অবাধ্য হয়ে আবার সেই তরুণদের দিকে পড়লে কি এক অস্বস্তির খোঁচায় তার মন হ'ল ক্ষতবিক্ষত। কেননা ও বেশ বুঝল যে সে নিজেই ওদের আলোচনার বিষয়। তাই কামরার ভেতরে দৃষ্টি রেখে ওদের প্রশ্রয় না দেবার ইচ্ছায় ও জানালা পথে ওর দৃষ্টিকে বাইরের আঁধারে মেলে ধরল। মনে মনে ভাবল কি একটা বাংলা উপন্যাসে পড়েছিল আঁধারেরও একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে—আজ সে কি বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে সে রূপ নিরীক্ষণ করতে পারবে ?

কামরার সেই অসমীয়া তরুণ ক'জন বাইরের দিকে চেয়ে হঠাৎ

উল্লসিত হয়ে উঠল। শিবানী তাদের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেখল আসাম ট্রাঙ্ক রোডের ওপরের আকাশ আজ লেলিহান অগ্নিশিখায় লাল হয়ে উঠেছে। তরুণদের সোল্লাস আলোচনা থেকে বুঝলো, ও আগুনে বাঙালীদের ভাগ্য পুড়ছে আর পুড়ছে আসামের সুনাম। গাড়ী চলার স্বাভাবিক শব্দকে ছাপিয়েও মাঝে মাঝে ভয়ার্ত নারী-পুরুষ-শিশুর মিলিত বুকফাটা আর্তনাদ ভেসে আসছে বাতাসে ভর করে আর ভেসে আসছে উন্মত্ত মানুষ পশুগুলোর হুঙ্কার।

শিবানীর মনটা বেদনার্ত হ'ল। চোখ ফিরিয়ে আনল কামরায়। বাঙ্গালী যাত্রীদের মুখের দিকে যেন আর তাকান যায় না। বাইরের দৃশ্য দেখে এক কিশোরী কন্যা ভয় পেয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে মায়ের বুকে মুখ লুকালো।

শিবানীকে ভাবনায় পায়। থেকে থেকে শুভ্রেন্দুর কত কথা মনে পড়ে। এক সময় ওর মন যেন হারিয়ে যায় তারই চিন্তায়। চলন্ত গাড়ীর চলমান চাকার সঙ্গে সঙ্গে যেন ওর মনটা গড়িয়ে যায় ব্রহ্মপুত্রের তীর ছোঁওয়া এক গাঁয়ে। যে গাঁয়ে প্রকৃতি অকৃপণ ভাবে প্রাকৃতিক শোভার প্রাচুর্য ঢেলে দিয়েছেন তাঁর দু' হাতের অঞ্জলি ভরে। চারদিকে শাল, শিশু, আর শিমূল গাছের সারি। লাল শিমূলের কিঞ্জলকোষে যখন কোন পাখি চঞ্চু ডুবিয়ে মধু খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন এক কিশোরের হাতের গুলতি অব্যর্থ তাক করে তাকে—কিন্তু তার পাশে ছায়াসঙ্গিনীর মত চলা কন্যকা তার হাত চেপে ধরে ব্যাকুল হয়ে বলে :

—না-না লক্ষ্মীটি, মেরো না, মেরো না ওদের।

অখণ্ড মনযোগে গুলতির ছিলা টানতে গিয়ে ছেলেটি থেমে যায়। বিরক্ত কণ্ঠে বলে :

—কাল থেকে তোকে সঙ্গে আনবো না।

—ইস্, কেন ?

—কেন কি, ও পাখিটাকে আমি ঠিক তাক করতুম—তোর জন্যেই ত' হ'ল না।

—ওঃ, ভারি বাহাদুর, ওদের পাখির প্রাণ কতটুকু বল ত! তাকে ত যে কেউ মারতে পারে।

ছেলেটির মনে ঘা মারে কথাটা। তাই ত! ওদের মারাটায় ত এমন কিছু বাহাদুরী নেই। নিতান্ত অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় গুল্‌তি। মেয়েটি এবার ছুটে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে আনে। বলে :

—ও; রাগ হ'ল ত বাবুর। নাও, নাও না বাবা, আচ্ছা ঘাট মানলুম, আর বলব না।

ছেলেটি কিন্তু তবু ছোঁয় না সে গুলতি, উপহত কণ্ঠে বলে :

—নারে আর মারব না ওদের—ভগবান ওদের কি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন! ওদের মারা মানে ভগবানের বিরুদ্ধে যাওয়া।

সেদিন থেকে পাল্‌টে গেল যেন ডান্‌পিটে ছেলেটি।

দিন যায়। মাস যায়। যায় বর্ষ। বেশ কটি বসন্ত ছাপ ফেলে যায় ছেলেটির বয়সের কোঠায় আর উদ্ভিন্ন যৌবনা মেয়েটির দেহের সৌন্দর্যের ভাঁজে ভাঁজে।...

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কোলাহলে শিবানীর চিন্তায় ছেদ পড়ে। কি একটা ষ্টেশনে এসে তাদের গাড়ীটা ইন করতে না করতেই একদল লোক লাঠি সোটা নিয়ে হৈ হল্লা করতে করতে মার মার রবে ওদের কামরায় ঢুকলো। ওদের দেখে সেই কিশোরী মেয়েটি কেঁদে উঠে মায়ের গলা আঁকড়ে ধরল। পাশের আর এক মায়ের কোলের দুধের শিশু পরিত্রাহি চীৎকার সুরু করে দিল। দুর্বৃত্তরা বাঙ্গালী যাত্রীদের সঙ্গের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে তছ্‌নচ করে দিল। এক ভদ্রলোককে শাসিয়েও হাঁতের দামী ঘড়িটা না খোলাতে পেরে তার বুকে বসিয়ে দিল আমূল শাণিত ছোরা। বুক-ফাটা চিৎকার করে উঠল সে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো। দাপাদাপি সুরু করে দিল দেহটা। তার স্ত্রী "ওগো আমার কি

সর্বনাশ হল গো, ও-হো-হো,হো” বলে স্বামীর দিকে এগুলে, একজন দুর্বৃত্ত তার চুলের গোছা ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মারল যে তার মাথাটা গিয়ে সজোরে ঠুকে গেল কামরার সঙ্গে। বউটি জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

সে সবই হচ্ছিল শিবানীদের বিপরীত দিকের জানালার বার্থে। এবার ওরা ওদের দিকে এগিয়ে এলো। প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই কিশোরীটির ওপর—সে প্রাণপণে তার মায়ের গলা জড়িয়ে আছে—'ওরা আমায় মেরে ফেলবে, মা গো আমায় ওদের কাছে দিও না' বলে কিশোরী আকুল করুণ কান্না কাঁদতে লাগল। অভাগী জানে না ওর মায়ের শক্তি কত সীমিত। ভেবে শিবানীর চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল। কিন্তু সে জল ওর দুর্ভাগ্যকে রোধ করতে পারল না। গুণ্ডাদের একজন ওর হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে কামরা থেকে নামিয়ে নিল, অন্য মা'টির কোলের শিশুটিকে আছড়ে ফেলল ওরা কামরার মেঝেতে। তার গলার হাড়ছড়া ছিনিয়ে নিল তীব্র আকর্ষণে।

ভীত বিহ্বল শিবানী মনে মনে তখন তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর কাকে যে ডাকছে আর ডাকছে না তার ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু কিছুতেও কিছু হ'ল না। বেশ তাগড়াই চেহারার একটা লোক ওর সামনে এসে বজ্র মুঠিতে ওর ডান হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেল্‌ল। হিড় হিড় করে টেনে নামালো প্ল্যাটফর্মে। তারপর ওর যথাশক্তি বাধাকে উপেক্ষা করে প্রচণ্ড আকর্ষণে ওকে টেনে নিয়ে গেল একটা ছোট ঘরে। যার মাথায় লেখা ছিল Lamp room. ঘরে ঢুকেই শিবানী শিউরে উঠলো। সেই কিশোরীটিকে ঘিরে তখন চলছে ওদের নারকীয় উল্লাস। ওকে ওরা ততক্ষণে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে ফেলেছে। একজন ওর পা'দুটো মেঝেতে চেপে ধরে আছে, আর একজন ধরে আছে ওর মাথা, তৃতীয় জন ওর পেটের ওপর বসে হাতের ধারাল ছোরা দিয়ে ওর সমতল বুকে সগু

জাগা স্তন দুটির একটিতে চালাতে যাচ্ছে হাতের শাণিত ছুরিকা।

এ বীভৎস দৃশ্য দেখে শিবানী শিহরিত হয়। পায়ের তলার পৃথিবী কাঁপছে, মাথা টলছে, দেহটা দুলছে। শিবানী তার ধিক্কার-দৃষ্টিতে দেখলো গুণ্ডারা মেয়েটির একটি কর্তিত স্তন ছুঁড়ে দিল অন্যজনের হাতে। সে সেটা জহ্লাদের উল্লাসে লুফে নিয়ে বাইরে প্রচণ্ড স্বরে ওদেরই প্রতি ভর্ৎসিত হ'য়ে চীৎকার রত কুকুরটার মুখে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিল। হতভাগিনী কিশোরী ততক্ষণে স্তব্ধ হয়ে গেছে, নিঃসার হয়ে গেছে, হারিয়ে ফেলেছে জ্ঞান। শিবানীরও তখন জ্ঞান হারাবার বেশী বাকী ছিল না। প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তিতে সে তখন চেষ্টা করছে নিজের জ্ঞান না হারাতে। কেননা ও বুঝে ফেলেছে যে যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে ততক্ষণই সে ওর দেহের শেষ শক্তিটুকু আরোপ করেও নিজের নারী দেহের শুদ্ধতা রক্ষা করবার চেষ্টা করতে পারবে। যদিও ও জানে মানুষের খোলস পরা ঐ পশুগুলোর সঙ্গে ওর পক্ষে এঁটে ওঠা দুঃসাধ্য, তবু শেষ শক্তিতে লড়ে দেখতে দোষ কি। অন্ততঃ কোন আফশোষ থাকবে না—নিজেকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করেনি বলে—মনের মাঝে নিজের প্রতি কোন ধিক্কার উঠবার অবকাশ পাবে না।

মেয়েটির ঐ হাল্ করে ষণ্ডা মার্কা লোকটি এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে শিবানীর ওপর। প্রথমেই উল্লসিত হয়ে সে ওর বুকের ব্লাউজটা ধরে এমন জোরে টান দিল যে টিপ-বোতামগুলো ছিঁড়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। আবার যখন লোকটা ওর উরস উপলক্ষ করে হাত বাড়াতে যাচ্ছে তখন তাকে শরীরের শেষ শক্তিতে দু'হাতে ঠেলে দিল শিবানী। অচিন্তপূর্ব হঠাৎ পাওয়া সে আঘাতে লোকটা দেয়ালের ওপর সশব্দে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শিবানী স্পষ্ট অসমীয়া ভাষায় বলল ঃ

—আমি কি দোষ করেছি যে এমন করছ তোমরা আমার ওপর ?

—পাপ করেছ বঙ্গালী হয়ে, দোষ করেছ শাড়ি পরে।

লোকটা নিজেকে সামলে নিয়ে ঘৃণা মিশ্রিত স্বরে বলে। কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ দিয়ে উৎকট একটা গন্ধ বেরিয়ে আসে ভক্‌ভক্ করে। মদের গন্ধ বোঝে শিবানী। ইচ্ছে থাকলেও নাকে আঁচল চাপা দিতে পারে না ও। বলে ঃ

—মিথ্যে কথা, আমি বঙ্গালী নই।

—সুন্দরী, বিপদকালে সব মেয়েই অমন বলে। এই ক'দিনে কম করেও বিশ পঁচিশটি মেয়ে প্রথমে ঐ কথাই বলেছিল—তারা বঙ্গালী নয়।

লোকটি কথা শেষ করে হাঃ হাঃ করে বিকট হাসি হেসে আবার দুর্দমনীয় রিরংসায় এগিয়ে যায় শিবানীর দিকে। শিবানী ওর হাতে ধরা না পড়বার ব্যর্থ চেষ্টা পেয়ে পিছোতে থাকে। ঠিক এমন সময় এক যুবক ছুটে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকেই শিবানীকে ঐ অবস্থায় দেখে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মদগর্ব লোকটিকে বলে ঃ

—খবরদার। ওকে ছেড়ে দাও।—"ও হাণ্ডিকুই গার্লস কলেজ"এ পড়ে। সত্যি ও অসমীয়া মেয়ে।

আধ চেতন আধ অচেতন অবস্থায় শিবানী চিনল ছেলেটিকে—কটন কলেজের ছাত্র—ছাত্র আন্দোলনের সংঘঠনের ব্যাপারেই একবার যেন এসেছিল ওদের হোস্টেলে। ছেলেটির ঐ কথাকটা মন্ত্রের মত কাজ করল—গুণ্ডারা ল্যাম্পরুম থেকে তখনি বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলেটিও।

শিবানী কি জ্ঞান হারাচ্ছে? মাথাটা যে টলছে, গাটা যে গুলাচ্ছে, পৃথিবীটা যেন দুল্‌ছে, কাঁপছে। হ্যাঁ, মাথাটা ঘুরে গেল, একটা অবলম্বন কি ও পেতে পারে না ? হাত বাড়িয়ে দেয়াল ধরতে

যায় ও, কিন্তু তার আগেই ওর দেহটা জ্ঞান হারিয়ে এলিয়ে পড়ে মেঝেতে।

শিবানীর যখন জ্ঞান ফিরল তখন ও ওর বার্থে শুয়ে। জ্ঞান হওয়ামাত্রই সেই কিশোরীটির বুক ফাটা আর্তনাদ কানে আসে।

—মা, মা, ঐ, ঐ ওরা আসছে। মা, মা-আঃ আঃ!

চীৎকার ক'রে আবার জ্ঞান হারায় সে।

সারা শরীরের অসহ্য ব্যথা সহ শিবানী উঠে বসে ওর বার্থে। ছোরা মারা ভদ্রলোকের স্ত্রী মুমূর্ষু স্বামীর শিয়রে বসে অঝোরে ঝরিয়ে দিচ্ছে চোখের জল। এই ক'দিন আগেই না স্বরু হয়েছে তাদের মিলিত জীবনের দ্বৈত যাত্রা। আর এর মধ্যেই কি সব শেষ হয়ে যাবে? কত আশা, ঈপ্সা, ভবিষ্যতের কত পরিকল্পনা। সবই কি ফুরিয়ে যাবে একটি মানুষের ছুটি চোখের চারটি পাতা পরস্পর আবদ্ধ হবার সঙ্গে?

শিবানী বার্থ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায় ব্যথাহতা নবোঢ়া বধূটির কাছে। বধূটি ভাষাহীন শূন্য দৃষ্টিতে তাকায় শিবানীর মুখের দিকে। মুহূর্ত মধ্যে যেন শিবানী পাঠ করে ফেলে তার মনের হাহাকার। মাথা আপনি নীচু হয়ে আসে ওর। মনে মনে ভাবে মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট পশু বোধ হয় জীবজগতে আর কেউ নেই।

শিবানীর কেমন যেন ইচ্ছা জাগে বধূটির মাথায় একটু সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিতে। মাথায় হাত রাখতেই চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। শিবানীর চোখেও জল ছাপিয়ে আসে। আঁচলের খুঁটটা চোখে ঘষে নিয়ে ও এগিয়ে যায় পরিত্রাহি চীৎকারে আর্তনাদ রত শিশুটির কাছে। মা তাকে শত চেষ্টাতেও শান্ত করতে পারছে না। শিবানী মায়ের কোল থেকে শিশুটিকে নিয়ে নানা ভাবে শান্ত করতে চেষ্টা পেল। নতুন মানুষ, নতুন কোল, নতুন মুখ—শিশু কান্না ভুলে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল

শিবানীর মুখে। শিবানী তার কচি ঠোঁটে চুমু এঁকে দিল। ভুলল শিশু। শান্ত হল সে, স্তব্ধ হ'ল কান্না। ঘুম, ঘুম নেমে এলো তার আঁখির আসনে। ক্লিশ্যমান শান্ত শিশুকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে শিবানী এগিয়ে গেল কিশোরীর কাছে। সিত সুন্দর কচি কিশোরীর মুখে জগতের সব ভয় এসে যেন জমাট বেঁধেছে। জ্ঞান ফিরে আসামাত্র আবার সে ভীত করুণ আর্তনাদ করে উঠছে। দু'হাতে পরম আশ্বাস পেতে মায়ের গলা আঁকড়ে ধরছে।

তিনটি ষ্টেশন পরে যে ষ্টেশনটা আসবে সেখানে একটা অক্সিলিয়ারী হসপিট্যাল আছে। সেখানে আহতদের নিয়ে যাওয়া যায় কিনা, সে নিয়ে বাঙ্গালী যাত্রীদের মধ্যে পরামর্শ হল। কিন্তু পাছে আবার তাদের আর কোন বীভৎসতর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়, এই ভেবে সেখানে না নামাই সাব্যস্ত করে সকলে।

শিবানী ফিরে আসে নিজের বার্থে। জানালায় চোখ পেতে আবার বাইরে তাকায়—অন্ধকারের বুকে এখানে ওখানে জ্বালিত ঘর বাড়ী চোখে পড়ে ওর। আসাম ট্রাঙ্ক রোডের বাড়িগুলো যেন কালানলে পুড়ছে। ক্রমে ওর মন আচ্ছন্ন হয়ে আসে শুভ্রেন্দুর চিন্তায়। মনে মনে ভগবানের দরবারে একান্ত আর্জি পেশ করে ঃ

—ভগবান, কানাই কাকতি যেন ওর কিছু অকল্যাণ করে না বসে।

আর ক'টাই বা ষ্টেশন—মাত্র চারটে। তারপর পৌঁছে যাবে ও ওদের গ্রাম সন্নিহিত ষ্টেশনে। হঠাৎ ওকে দেখে সবাই অবাক হবে—বাবা অবাক হবে—মা অবাক হবে, জ্যাঠামণি অবাক হবে, জ্যেঠিমা অবাক হবে। আর শুভ্রেন্দু? হ্যাঁ, তার কাছ থেকে সে পাবে তার দুঃসাহসিকতার জন্য তিরস্কার, সে তিরস্কার যেন তারই মঙ্গল সংবাদের মাধ্যমে শিবানীর মাথায় পুরস্কার হয়ে বর্ষিত হয়।

দূরে তখন আসন্ন একটা ষ্টেশন। সিগন্যাল ডাউন হয়েছে।

ষ্টেশনের টিমটিমে কেরোসিন আলোগুলো ভূতুড়ে আলোর মত দেখাচ্ছে। ষ্টেশন ইয়ার্ডটা কেমন যেন ছায়া ছায়া—রহস্যময় মনে হয় শিবানীর। ট্রেণটা ষ্টেশনে ইন করছে যখন ঠিক তখনই খানিকটা দূর থেকে বেশ কটি মশাল তার লেলিহান শীষ সর্বস্ব শিখার আলো ছড়াতে ছড়াতে দ্রুত এগিয়ে আসে ষ্টেশনের দিকে। গাড়ী থামতে না থামতেই গুণ্ডারা ট্রেণের কামরাগুলো আক্রমণ করে তছনচ করতে সুরু করে। শিবানীদের কামরায় উঠেই দরজার বাঁ দিকের বার্থে ওকে পেয়ে ওর হাত ধরে আকর্ষণ করে—। কিন্তু শিবানী শক্ত হাতে জানালার ফ্রেম ধরে থাকায় দু'জন দুর্বৃত্ত তার পা ও মাথা ধরে মড়া নেবার মত করে শূন্যে শূন্যে ওকে নিয়ে উধাও হয়।

শরীরের সমস্ত শক্তিতে চেষ্টা করেও পশু শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে না ও। ওরা ওকে লেডিস ওয়েটিং রুমের মেঝেতে একান্ত অবহেলায় নামিয়ে দেওয়ামাত্র ওদের পেছন থেকে ততোধিক ভীষণ দর্শন একটা লোক এগিয়ে এসে কর্কশ কণ্ঠে ওদের বলে :

—তোরা যা, নতুন মাল দেখ গে, এটার ব্যবস্থা আমি করছি।

লোকদুটি আদেশ মত ওরা বেরিয়ে যায়। বিগ্ন শিবানীও তড়িৎ উঠে প্রস্থান করতে যায় ওদেরই সঙ্গে; কিন্তু ততক্ষণে একটা বলিষ্ঠ হাত অবলীলাক্রমে ওর গলা ধরে পেছনে হেঁচকা টান মেরেছে। বিধূনিত শিবানীর মনে হ'ল লোকটার শক্ত হাতের চাপে বুঝি ওর গলার হাড়গুলো এখুনি মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে যাবে। ক্রীড়ণীয় পুতুলের মত শিবানীকে ছিটকে ফেলে দিয়ে লোকটা দ্রুত হাতে দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিল। তারপর সে যখন তার লাল ভাঁটার মত চোখ দুটির শিকারী লোলুপ বাঘের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শিবানীর দিকে নিবদ্ধ করল তখন তার অন্তরাত্মা থরথর করে কেঁপে উঠল। ভীষণ সে দৃষ্টিতে তখন কামনার আগুন ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে। সে তার দুটি বলিষ্ঠ সবল বাহু বাড়িয়ে কুটিল

ভঙ্গিতে বিকরাল মূর্তিতে যেন শিবানীকে গ্রাস করতে আসছে। আরও আরও কাছে; এইবার কোপিত কলুষ পশু-শক্তির কাছে শিবানীর অনাঘ্রাত কুমারী কুসুমের মত পবিত্র নারীত্ব হবে কীটদুষ্ট। মুহূর্তে সঙ্কল্প স্থির করে দুর্মনা শিবানী। দেহের সবটুকু শক্তি ও নিয়ে যায় ডান পা টায়—তারপর মনের দৃঢ়তার নির্দেশে সেই পায়ে প্রচণ্ড এক আঘাত হানে লোকটার পেটে। 'কুঁই' করে শব্দ হয় একটা।

—'ইয়া আল্লা'।

বলে ও পড়ে যায় মেঝেতে। এই সুযোগ! মুহূর্ত মধ্যে যদি ছিটকিনি খুলে পালাতে না পারে—তবে তার ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে ওঠে শিবানী। ত্বরিৎ ছুটে যায় ও দরজার কাছে। হাত রাখে ছিটকিনিতে—তুলে ফেলে সেটা। হ্যাঁ একটা পাল্লা একটু ফাঁক করতে পেরেছে—ঠিক এমনি সময় ওর বাঁ পায়ের পাতার ওপরের সরু অংশটা ধরে টান মারে প্রতিপক্ষ। পড়ে যেতে যেতে দরজা ধরে ঝুলে নিজেকে সামলে নেয় শিবানী। লোকটা বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়ে দরজায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। শিবানীর সরু কোমর জাপটে ধরে পরক্ষণেই ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আবার তুলে দেয় ছিটকিনি।

একটি শাড়ি পরা মেয়েকে যে গুণ্ডারা লেডিস ওয়েটিং রুমে নিয়ে গেছে ষ্টেশন মাষ্টার বরণীয় বসু তা লক্ষ্য করেছে। আর মেয়েটির ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠেছে। ঐ অসহায়া নারীর নারীত্ব রক্ষার জন্য তার কি কিছুই করণীয় নাই? আছে।

কিন্তু যদি জানতে পারে গুণ্ডারা যে মিলিটারীতে সে ফোন করেছে, তবে?···হ্যাঁ বিপদ তার হবে। তাই বলে ত' সে পশুত্বের পরওয়ানা নিয়ে যারা নারীর ধর্মকে করছে লাঞ্ছিত তাদের প্রশ্রয় দিতে পারে না। মনের উপজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ হয়ে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে পার্শ্ববর্তী বড় ষ্টেশনে ফোন করে।

– ষ্টেশন ইয়ার্ড এবং রেলের কামরায় কামরায় তখন চলেছে গুণ্ডাদের উন্মত্ত উল্লাস। ভয়ার্ত পুরুষের ব্যর্থ বাধা দান, ভীষিত শিশুর আর্তনাদ, লাঞ্ছিতা নারীর করুণ কান্নায় গোটা পরিবেশটা হয়ে উঠেছে নারকীয়।

ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে ঢুকে পড়ে দুর্বৃত্তরা টিকিট বিক্রী করে পাওয়া পয়সাকড়ি ছিনিয়ে নেবার আশায়।—এমন সময় তাকে ফোনের রিসিভার ও স্পীকার যথাক্রমে কানে ও হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে প্রচণ্ড ক্রোধে শানিত ছোরা নিয়ে আক্রমণ করে গুণ্ডাদের একজন। বুকফাটা আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে যায় মাঝ বয়েসী ষ্টেশনমাষ্টার। যন্ত্রণাকাতর দেহ তার কাটা পাঁঠার মত গড়াগড়ি যায়। গুণ্ডারা হেসে ওঠে ভয়াল অট্টহাসি।

লেডিজ ওয়েটিং রুমে নারীত্ব রক্ষার অটুট সঙ্কল্পবদ্ধ এক নারী আর কামোন্মাদ মানুষ পদবাচ্য এক দ্বিপদ পশুর মধ্যে চলেছে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। শিবানীর পরণের শাড়িটা ফাতাফাতা হয়ে হেলায় পড়ে আছে ঘরের এক কোণে। ভয়েলের পাতলা ব্লাউজের অস্তিত্ব তখন ঊর্ধাঙ্গে অবশিষ্ট আছে সামান্যই। বডিস্‌-এর ইলাষ্টিক বেল্টটা ক্রুদ্ধ আক্রোশে ছিড়ে ফেলেছে পশুটা। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে বিবসন প্রায় শিবানীর। কি একটা অদৃশ্য প্রচণ্ড তেজ যেন ওতে ভর করছে। ওতে ভর করা সেই শক্তিই এতক্ষণ ধরে যেন যুঝে যাচ্ছে এই ক্ষেপা পশুটার সঙ্গে।

আসামের এক শ্রেণীর শিক্ষিত নেতা ও ছাত্র, যারা জনগণের বৃহৎ অংশের আস্থাভাজন—তারা বাপুজানকে লেলিয়ে দিয়েছে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে। বাঙ্গালীকে ভিটেছাড়া কর, বাঙ্গালী মেয়েদের বে-ইজ্জৎ কর, পুরুষদের কোতল করা মাথা নিয়ে গেণ্ডুয়া খেল। পুরস্কার? হ্যাঁ পুরস্কার পাবে বাঙ্গালীর যত সম্পত্তি। তবে তুমি যে ভাষায়ই কথা বল না কেন আদমসুমারীতে তোমাদের অসমীয়া ভাষাভাষী বলে পরিচয় লিখে দিতে হবে।

তা দিতে হয় হোক। মদান্ধ বাপুজান স্বপ্ন দেখেছে বাঙালী রিফিউজিদের সব জমিতে লাঙ্গল চালাবে। আসামের হিন্দু নেতারাই যখন এইভাবে উস্কিয়েছে—সে ত' নিমিত্ত মাত্র। এমন কোন পাপ তাকে স্পর্শ করবে না যাতে তাকে দোজকে যেতে হতে পারে। বরং তার একাজ এক শ্রেণীর নেতার কাছে তার 'কুদরত' বলে বিবেচিত হবে।

বাপুজান শরীরের শেষ শক্তি আরোপে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিবানীর ওপর। ইস্পাত-শক্ত হাতটা দিয়ে জাপটে ধরে শিবানীকে। তার প্রবল আকর্ষণে ক্লিশিত শিবানী নিজের মন ও শরীরের শেষ শক্তিতে চেষ্টা করে পশুতুল্য প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করতে। নাঃ, আর বুঝি পারে না—প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রূরকর্মার সঙ্গে সামান্য এক নারী কতক্ষণ বুঝতে পারে? কতক্ষণ যোঝা তার সম্ভব? বাপুজানের সবল শক্ত জাপটে ধরা হাতের আকর্ষণে মেঝেতে পড়ে যায় শিবানী। কপালে চোট লাগে। রক্ত ঝরে। লজ্জার আভরণ হিসাবে দেহে তার তখন মাত্র কটিদেশের সায়াটা। এক হাতে শিবানীর দুটি হাত সুদ্ধ উর্ধাঙ্গ শক্ত বাঁধনে জড়িয়ে ধরে বাপুজান আর অন্য হাতে তার শিকারের অধোঅঙ্গ উলঙ্গ করবার প্রয়াসে সায়াটা তুলতে যায়। শিবানী প্রবলভাবে দেহ আন্দোলিত ক'রে ছিটকে পড়ে মুক্ত করে নিজেকে।

বাপুজানও ততক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেছে। এত প্রচণ্ড শক্তি যে কোন অবলা নারীর দেহে থাকতে পারে তা' তার ধারণার বাইরে। এই দাঙ্গা সুরু হবার পর এই নিয়ে দশটি নারীর দেহে এঁকে দিয়েছে সে লাঞ্ছনার কেলেঙ্কার—কিন্তু কোথাও এর আগে এমন প্রতিবন্ধকতা ত পায় নি।

হাঁফিয়ে উঠেছে শিবানীও। প্রতিপক্ষের দূরত্ব বাঁচিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেও ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। চোট লাগা কপাল থেকে রক্তের একটা সরু রেখা গড়িয়ে নাক, গাল ও ঠোঁট বেয়ে

নেমে আসছে। চোখদুটো তারও এতক্ষণে প্রবল উত্তেজনায় জবার মত লাল হয়ে উঠেছে। আপেল-লাল গাল দুটো ফেটে যেন এখুনি রক্ত বেরিয়ে পড়বে। যুদ্ধমান শিবানী উত্তেজনায় নীচের ঠোঁটটা কামড়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে ক'বার।

কিছুটা দম নিয়ে নবোদ্যমে বাপুজান আবার শিবানীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার শক্ত হাতে ওর দেহে একমাত্র আবরণ সায়াটা তুলে ফেলে তাকে দেয়ালে ঠেসে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে। ঠিক এমন সময় দরজায় অশান্ত আঘাত সুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলার আদেশ আসে ঃ

—দরওয়াজা খোল ?

পরক্ষণেই দমাদম ভারি বুটের লাথি পড়ে তাতে। কথাটা শোনামাত্র শিবানীকে জাপ্টে ধরা উদ্রিক্ত বাপুজানের বলিষ্ঠ হাতের বাঁধন কেমন যেন শিথিল হয়ে আসে। উদ্বেজনের ছায়া পড়ে তার চোখে মুখে। হাতের শিকার ছেড়ে দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে যেন পলায়নের পথ খোঁজে। কিন্তু লোহার শিকসহ জানালা ও এক দরজার ঘরে ত' তেমন কোন সুযোগ নেই। হতাশায় মিইয়ে যায় যেন বাপুজান।

দরজায় তখনও প্রচণ্ড আঘাত বর্ষিত হচ্ছে। পাল্লাগুলো কাঁপছে থরথর করে। পরক্ষণেই একটা পাল্লা ছিটকে পড়ল পাশে। সঙ্গে সঙ্গে দু'তিনজন মিলিটারী ভারি পায়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। বাপুজান শেষবারের মত পালাবার চেষ্টা করতেই ওদের একজন তার বুকে সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরল।

মনে কর নেহ্‌রু নোয়াখালির দাঙ্গার কথা। মহাত্মা গান্ধী দুস্কৃতকারীদের মানসিক পরিবর্তন সাধনের জন্য সারাভারতের সব কাজ ফেলে রেখে নোয়াখালিতেই সকল activity নিযুক্ত করেছিলেন। আর তুমি ভ্রান্ত উপপ্লবে উদ্বুদ্ধ আসামে অমন বীভৎস হননযজ্ঞ চলাকালে, বর্তমান ভারতের ভাগ্যবিধাতা হয়েও সময় করে দুটো সান্ত্বনার কথাও শোনাতে পারলে না। জালিয়ান-ওয়ালাবাগে নিরস্ত্র এক জনতার উপর যে বর্বর আক্রমণ চালায় "জেনারেল ডায়ার" তার প্রতি প্রচণ্ড ধিক্কারে গোটা ভারতীয় জাতির সংগে তুমিও ত' 'ছিঃ ছিঃ' করে উঠেছিলে। কিন্তু আজ আসামে ঘটে যাওয়া অভূতপূর্ব বর্বরতার বিরুদ্ধে তোমার কণ্ঠ কেন বাণীহীন? শিক্ষিত বাঙ্গালী ও বাংলা তোমার কাছে "নাইটমেয়ার" বলেই কি তোমার মুখে অসমীয়াভাষীদের অনাবশ্যক প্রশংসা?

স্বাধীনতা অর্জনের পরেই বিহারের দাঙ্গার সময় যে জওহরলাল রক্তচক্ষু দেখিয়ে বিমান থেকে বোমা ফেলবার হুম্‌কি দিয়েছিল—সেই জওহরলাল আজ কটন কলেজ-হোষ্টেলে ৪ঠা তারিখের গুলি চালনার ব্যাপারে নিহত রঞ্জিৎ বড়পূজারীর মৃত্যুতে মুহ্যমান। অথচ কত বাঙ্গালী যে প্রাণ দিল ঐ ছাত্রটির শবসহ দু'শত পঞ্চাশ মাইল ব্যাপী মৃত্যু-মিছিলের বলি হয়ে, তাদের জন্য একটু সমবেদনাও তুমি জানালে না নেহ্‌রুজী। তোমার এ আচরণের একমাত্র কারণ কি পলিটিক্স? যাকে বাংলা ভাষায় বলা হয় কূটনীতি? যদি তাই হয়, যদি তুমি নেতৃত্ব থেকে সামান্য পলিটিশিয়ান-এর

পদে পদোন্নতি (!) করে থাক, তবে শোন পণ্ডিত নেহরু, ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই আমি বলছি—মায়ের সংগে ব্যাভিচারে লিপ্ত সন্তানকে আমি যতটা ঘৃণা করি তার চেয়েও অনেক বেশী ঘৃণা করি আমি তাদের, যে সব পলিটিশিয়ান দেশ-মাতৃকার স্বার্থের সংগে করে বিশ্বাসঘাতকতা। কেননা এইরূপ তথাকথিত পলিটিক্স-এর কালকূটেই একদিন ভারতের সকল ভবিষ্যৎ হবে ভরাডুবি।

আরোহিনী ক্লিশ্যমান শিবানীকে বয়ে নিয়ে সাইকেল রিক্সাটা হু হু ক'রে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলল। খানিকটা যেতেই দু' একটি দগ্ধশেষ বাঙ্গালীবাড়ী ওর চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। তা হ'লে এত দূরের গ্রামেও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ডাক এসে পৌছেচে। কুলদূষক কানাই কাকতি তবে সত্যিই শুভ্রেন্দুর ভাষায় নেতা হ'তে চলেছে? ভেবে ওর অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। ঐ পোড়া বাড়িগুলোর মত ওর কপালও পোড়েনি ত'! অক্ষত দেহে আছে ত' এখনও ওর নারী জীবনের বৃত্যপুরুষ শুভ্রেন্দু। ভয় ও অমঙ্গল চিন্তার ষ্টিমরোলার যেন ওর নারী মনের ওপর দিয়ে নির্মম গতিতে আগুপিছু যাতায়াত করে।

রিক্সা ওদের বাড়ী পর্যন্ত যায় না। বেশ কিছুটা আগে যান ছেড়ে নেমে পড়ে উদ্বেগাকুল শিবানী। ভাড়া চুকিয়ে সুটকেশটা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলে ও। পায়ে গায়ে ওর একটুও বল নেই যেন। নেশা করেছে বুঝি—সেই রকমই টলতে টলতে এগিয়ে চলে ও। বুকের মধ্যেটার ঢিপঢিপানি বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ড ছুটো যেন দাপাদাপি করে।

নিজেদের বাড়িতে না ঢুকে শুভ্রেন্দুদের বাড়িতে ঢোকে বিধুনিতমনা শিবানী। এই সকালটায় মমতাময়ী ওকে দেখে ভূত দেখার মত চম্‌কে ওঠেন। শিবানী প্রণাম ক'রে উঠতেই

ওর চিবুক ছুঁয়ে স্নেহচুম্বন করতে গিয়ে থেমে যেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলেন ঃ

—এ কি, কি হয়েছে রে মা কপালে ?

—কপাল জ্যেঠিমা ! গুণ্ডারা গাড়ী আক্রমণ করেছিল। তাই আমায় বাঙ্গালী মেয়ে বলে ভুল করে অসমীয়া মেয়ের কপালেই অসমীয়াদের দেওয়া এ কলঙ্ক টিপ।

—ওগো, দেখ শিবী এসেছে, তোমার মা-জননী !

বড় ঘরের কাছে গিয়ে একটু চড়া গলায় বলেন মমতাময়ী। শোনামাত্র নবেন্দুশেখর খড়মের দ্রুত শব্দ তুলে বেরিয়ে আসেন। শিবানী এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে।

—এ কি রে মা। কপালে তোর···

—আমিও ত তাই জিজ্ঞেস করলাম, তা ও বললে, 'কপাল জ্যেঠিমা'। গুণ্ডারা গাড়ী আক্রমণ করেছিল ; তাই অসমীয়া মেয়ের কপালেই অসমীয়াদের দেওয়া এ কলঙ্ক টিপ।

—হ্যাঁ মা, কপাল। এ ক'দিন তোর কথা বড় বেশী মনে পড়ছিল মা। তাই বুঝি নারায়ণ তোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চিন্তাক্লিষ্ট ব্যথিত স্বরে বলেন নবেন্দুশেখর।

—বাড়ি যাসনি বুঝি মা, তা এখানেই স্নান করে না হয়···

মমতাময়ীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শিবানী বলে ঃ

—আমি বাড়িতেই যাই জ্যেঠিমা, স্নান সেরে এসে চালভাজা খাবো, কাঁঠালের বিচি ভেজে রাখো।

—বেশ, তুই আয় স্নান সেরে। আমি ভেজে রাখছি।

শিবানী আর কথা না বাড়িয়ে সুটকেশটা হাতে তুলে শুভ্রেন্দুর ঘরের দিকে যায়। তা' দেখে মমতাময়ী একবার স্বামীর চোখে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

শুভ্রেন্দুর ঘরে ঢুকে শিবানী দেখল ঘরে কেউ নেই। ওর মনে

যেন হাতুড়ির ঘা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে রান্না ঘরে। শুধায় মমতাময়ীকে ঃ

—শুভ্রদা কোথায় জ্যেঠিমা ?

—ঐ কি 'শান্তি কমিটি' না কি হবে ; তারই মিটিংয়ে ডেকে নিয়ে গেছে কানাই।

শোনামাত্র চকিত শিবানীর মনের মধ্যে আশী মাইল বেগে চলা মেল ট্রেনের ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের ভারি চাকা যেন ক'বার পাক খেয়ে যায়।

—এ ভারি অন্যায়, এ অবস্থায় যে কেউ ডাকলেই যাওয়া ওর ভারি অন্যায়।

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বিরক্ত ঝরা কণ্ঠে বলে শিবানী।

—কি বলছে মা তোমায় অহমকন্যা ?

ওদের অলক্ষ্যে শিবানীর ঠিক পেছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে শুভ্রেন্দু। শোনামাত্র ঘুরে দাঁড়িয়ে শিবানী তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে দৃপ্ত স্বরে বলে ঃ

—হ্যাঁ, আমি বলছি—যখন তখন যেখানে সেখানে যে কেউ এসে ডাকলেই এখন যাওয়া চলবে না তোমার।

কথাটা শেষ ক'রেই দুম্‌দাম্ ক'রে পা ফেলে শিবানী খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে চলে যায় ওদের বাড়ির দিকে। জুতো জোড়া ওর পড়ে থাকে অবহেলায়। ওর যাওয়া-পথ পানে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্ষীণ একটু হাসে শুভ্রেন্দু। মনে মনে বোধ হয় ভাবে 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ ?'

শুভ্রেন্দু না জানলেও নারী হিসাবে নারীর মনের কথা আঁচ করতে পারেন মমতাময়ী। শিবানীর ক্রোধের কারণ বুঝে তাই ছেলেকে বলেন ঃ

—হ্যাঁরে শুভ্র, শিবী ঠিকই বলেছে—এখন যেখানে সেখানে যাওয়া তোর উচিত নয়। কার মনে কি আছে বলা ত' যায় না।

কথাটা নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে চিন্তিত শুভ্রেন্দু ধীর পায়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

পায়ে কার আলতো স্পর্শ পেয়ে মুদিতনেত্রা রুণীবালা হাতের মালা ফেরাতে ফেরাতে চম্‌কে উঠে চোখ খোলেন। আর সামনেই শিবানীকে দেখে হাসিমুখে বলেন ঃ

—এ কি, কার সংগে এলি ?

—একাই।

—সে কি ! দেশজোড়া মারামারি হানাহানি চলছে ; তার মধ্যে মেয়েছেলে হ'য়ে তুই একা পথে বেরুলি ?

—তোমার ত' মা ছেলে বলতেও আমি, মেয়ে বলতেও।

—তা তোদের ওখানে নাকি অসমীয়াদের রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়েছে বঙ্গালীরা ?

—কে এ খবর দিল মা তোমায় ?

কুঞ্চিত কপালে প্রশ্ন করে শিবানী।

—কেন, আমাদের কানাই।

—কানাইদার কোন কথায় কান দিওনা মা।

দৃঢ়স্বরে বলে শিবানী।

—তবে কি সব মিথ্যে ?

—এই দেখ মা তোমার নিজেরই মেয়ের কপাল, এ ত' আর মিথ্যে নয় ?

—দেখি দেখি,—

বলে মেয়ের কপালটা দু'হাতে ছানিপড়া চোখের কাছে তুলে ধরে রুণীবালা শঙ্কিত কণ্ঠে বলেন ঃ

—এ যে অনেকটা কেটে গেছে !

—হ্যাঁ, আর আমায় বাঙ্গালী মেয়ে ভেবে—এ কীর্তি করেছে অসমীয়া গুণ্ডারাই।

—এ কি রে মা, তুই এলি কি করে ?

বলতে বলতে খিড়কি দিয়ে এগিয়ে আসেন শিবানীর বাবা সরযুপ্রসাদ।

শিবানী প্রণাম করে বাবাকে। হাল্কা স্বরে বলে :

—এই ত একাই চলে এলাম।

—সে কি, তোদের ওখানে নাকি বঙ্গালীরা অসমীয়াদের রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিয়েছে। পুলিশও বাঙ্গালীদের পক্ষ নিয়ে গুলী চালিয়েছে ?

—ও সব সাজানো কথা বাবা।

বলে নিজের ঘরের দিকে চলে যায় শিবানী।

স্নান সেরে শিবানী শুভ্রেন্দুদের বাড়িতে এলো—তার আগেই মমতাময়ী ওর প্রিয় জিনিস ত্বটি বারকোসে বেড়ে রেখেছিলেন। এ বাড়িতে এসে প্রথমে ও যায় শুভ্রেন্দুর ঘরে। শুভ্রেন্দু ওর কপালের দিকে তাকিয়ে বলল :

—সে কি, তোমার কপালে আবার ও কিসের রক্ত-তিলক ?

—তবু ভাল, নজরে পড়ল।

—পড়বে কি করে বল, আমাকে দেখা মাত্র ত' হেঁয়ালির পংকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলন্ত একটা প্রহেলিকার মত চলে গেলে।

—প্রহেলিকা ত' প্রহেলিকা। মেয়েদের উচিত নয় নিজেকে একেবারে পরিষ্কার করে পুরুষের কাছে মেলে ধরা। প্রহেলিকা হয়ে থাকাই ভাল।

—এ আবার কোন থিওরী ?

—যে কোন মেয়ের সবটুকু জানা হয়ে গেলে পুরুষ জাতটা অন্য নারীতে আকৃষ্ট হতে পারে। থিসিস নিয়ে আছ তাই থাক, এ থিওরিতে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।

কৌতুক কণ্ঠে কথা শেষ করে শিবানী তাকের কাছে গিয়ে বেঞ্জিনের শিশিটা হাতে তুলে নিল।

—ওকি, ওটা ত' আমি নেব ভাবছিলাম !

—কেন ?

—তোমার কপালে লাগাবো বলে।

—এই নাও।

বলে শুভ্রেন্দুর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরে। শিশিটা দিতে গিয়ে শুভ্রেন্দুর আঙ্গুলের ছোঁয়া লাগতেই শিবানীর শিরায় শিরায় একটা সুন্দর অনুভূতির শিহর খেলে যায়। শিশিটা হাতে নিয়ে বরিক কটনে ভরিয়ে নিতেই শিবানী শুভ্রেন্দুর সামনে কপালটা পেতে দেয়। যথাযথভাবে বেঞ্জিন ভরানো তূলো ক্ষতস্থানে লাগাতে শুভ্রেন্দু কৌতূহলী হয়ে বলে :

—এটা হ'ল কি করে ?

—তোমার জন্য।

—আমার জন্য !

—নয় ত কার জন্য ? এমন শিক্ষিত বিদ্বান মানুষটা, এই কাটাকাটি হানাহানির মধ্যে কেন এলে কলকাতা ছেড়ে ?

—বারে, আমার বাড়িতে আমি আসবো না ?

—না, আসবে না।

দৃঢ় স্বরে বলে শিবানী।

—বাবা-মা রয়েছেন, ওদের জন্য একটা চিন্তা নেই আমার ?

—তোমার তাদের জন্য চিন্তা থাকতে পারে আর কারও যেন তোমার জন্য কোন চিন্তা নেই না ?

বলতে বলতে রাগে অভিমানে গলাটা ধরে আসে শিবানীর। ছলছলিয়ে ওঠে ডাগর দু'টি চোখ।

—এই দেখ, ওমনি মুখ ভার হ'ল ত ?

—না, হবে না। যা খুশি তাই করবে একজন, আর আমি কিছু বলব না।

—যা খুশি করেছি আমি ?

—নয় ত কি ? কানাইদা ডাকলে তুমি কেন যাও ? চারদিকে এই অবস্থা, সব সময় আমার বুকের ভেতর দুরুদুরু। তা বাবু যেখানে সেখানে···

কথা শেষ না ক'রে প্রচণ্ড অভিমানে রাগতভাবে পা ফেলে কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে রান্নাশালে মমতাময়ীর কাছে চলে যায় শিবানী।

সারা দুপুর শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যথা জর্জর দেহ নিয়ে ঘুমিয়ে কাটায় শিবানী। সন্ধ্যার আগ দিয়ে ওর ঘুম ভাঙ্গে। কুয়োতলায় গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আয়না চিরুনী, তেলের বাটী, চুলের ফিতে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বসে। হাসি মুখে বলে ঃ

—চুল বেঁধে দেবে না আমার ?

—দিতে কি সাধ যায় না ? তোমার আবার পছন্দ হ'লে ত' ?

—কি করে হবে—অমন টান টান করে চুল বাঁধলে বিশ্রী দেখায় যে। দেখনি জ্যঠিমা কেমন সুন্দর ক'রে বেঁধে দেন এ্যালবার্ট কেটে !

—বেশ তবে জ্যেঠিমার কাছেই যা। কি 'গুণ'ই যে করেছে তোকে দিদি ?

—গুণ যার থাকে সেইত গুণ করতে পারে !

বলে উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজের রসিকতায় নিজেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠে ছুটে চলে যায় শিবানী খিড়কি দিয়ে। গন্তব্য তার শুভ্রেন্দুদের বাড়ি।

মমতাময়ী সুখদুঃখের নানা কথা বলতে বলতে শিবানীর মাথার চুলে তেলে ডোবানো আঙ্গুল চালিয়ে যান। বেশী কথাই বলেন তিনি কলুষমনা কানাইরা কিভাবে এখানকার বাঙ্গালীদের শাসাচ্ছে ও নির্য্যাতন করছে, সেই নিয়ে। বলেন ঃ

—পরশু দিন যখন একদল গুণ্ডা এসে আশপাশের বাঙ্গালী বাড়ীগুলো পুড়িয়ে দিল তখন কানাইকে অনেকেই দেখেছিল তাদের সংগে। কি দুর্ভাবনায় যে আছি মা, তা আমিই জানি আর জানেন ঐ ওপরে যিনি আছেন।

মমতাময়ীর কথা শুনতে শুনতে শিবানীর মনের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা উৎকণ্ঠা হাত পা ছড়িয়ে আবার জেগে ওঠে। বুক খালি করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও।

—ওরা বলে আমরা নাকি বিদেশী, বঙ্গাল। কিন্তু তোরা ত জানিস, কর্তার ঠাকুরের ঠাকুর্দা যখন এ অঞ্চলে এসে বসতি গড়ল তখন তোর ঠাকুর্দা তাঁকে 'পান তাম্বুল' দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিল। তিনিই ত' এ অঞ্চলে বন কেটে বসতি করলেন। তার পর না এলো আর সবাই। আর ওরা এখন সেই আমাদেরই বলছে কিনা বিদেশী।

—তা ছাড়া এখানকার ইস্কুল, পোষ্ট অফিস সবই ত তোমার শ্বশুর মশাই করেছেন জ্যেঠিমা। কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তিনিই ত এখানকার সবাইকে ডাক দিয়েছিলেন।

—তুইই বল মা।

এমন সময় শুভ্রেন্দু তার ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের পাশ দিয়ে বাইরে যেতে পা বাড়ায়। তাকে দেখে শিবানী শুধায় ঃ

—কোথায় যাচ্ছ, শুভ্রদা ?

—নদীর ধারে।

—আমি সঙ্গে যাব, দাঁড়াও !

—তুমি যাবে,—

চিন্তিত স্বরে বলে শুভ্রেন্দু ঃ

—আচ্ছা এসো।

চুল বাঁধা ততক্ষণে হ'য়ে গিয়েছিল। চিরুণী ও আনুসঙ্গিক জিনিসগুলো হাতে তুলে নিয়ে শিবানী বড় ঘরে ঢোকে। দর্পণে দৃষ্টি

ফেলে দেখে নিজের মুখখানা—কাল রাত্রির ক্লান্তির ছাপ এখনও লেগে আছে। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ওগুলো রেখে টুলটা টেনে আয়নার সামনে বসে ও। আঙ্গুলের ডগায় একটু স্নো ভরিয়ে মুখে ঘষে নেয়। তার ওপর মুখে গলায় বুলিয়ে নেয় পাউডারের পেলব পাফটা। এ্যালবার্টটা চিরুণী দিয়ে আরও ফাঁফিয়ে দেয়। আয়নায় ঝুঁকে পড়ে নিজেই নিজের চোখে চেয়ে ফিক্ করে আপন মনে একটু হেসে উঠে পড়ে ও। কাঁধের আঁচলটা হাতে নিয়ে টেনে টুনে শাড়িটা ঠিক করে পরে নিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। শুভ্রেন্দুর পাশে এসে তার মুখে চেয়ে মৃদু হেসে বলে ঃ

—চল।

—তুমি আগে চল, লেডিজ ফার্ষ্ট!

—আহা!

মুচকি হেসে বলে লজ্জাতুরা শিবানী আগে আগে পা ফেলে এগিয়ে চলে। অবশ্য পথে এসেই আবার পিছিয়ে পড়ে সে। শুভ্রেন্দুর পাশাপাশি ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসে পড়ে।

সূর্য্যদেব তখন পশ্চিমের আকাশ আঙ্গিনায় ঢলে পড়েছেন। পথ দিয়ে রাখাল ছেলেরা গরু, ছাগল তাড়িয়ে বাড়ি ফিরছে। গরুগুলিকে পাশ কাটিয়ে শিবানী ও শুভ্রেন্দু পাশাপাশি পথ চলে। কারও মুখে কোন কথা নেই। পথের ছ' দিকের পরিচিত গাছগুলো ওদের ছুটিকে দেখে মাথা দোলায়। ছ'জনের মনেই যুগপথ শৈশব-বাল্য-কৈশোরের কত কথা, কত স্মৃতি ভীড় করে আসে। মনের মধুর চিন্তায় ওরা সেগুলো রোমন্থন করে চলে।

চলতে চলতে এক সময় ওদের কানে এসে পৌছয় ব্রহ্মপুত্রের জলকল্লোল। চোখ তুলে দেখে সামনেই নদী-তীর! চারিদিকে নয়ন বিমোহন সায়ন্তন শোভা। ওদের মুগ্ধ চারটি চোখ চেয়ে চেয়ে দেখে সে শোভা। দূরে অপর পাড়ের কালো তটরেখা দেখা যায়। উদার আকাশে ছুটি গাঙচিল হলুদ ঠোঁটে খুশীর শব্দ ক'রে দীঘল ডানা

আন্দোলিত করে উড়ে বেড়াচ্ছে। ওরা দু'জন মনের পাখায় ভর করে যেন ওমনি উড়তে থাকে। এক সময় স্থির দৃষ্টিতে দু'জনের চোখে চায় দু'জনে। পাশের ঝুরি ঝোলা বিরাট বট গাছটার মোটা মোটা শিকড়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করে শিবানী বলে ঃ

—একটু, বসবে এখানে ?

—তুমি বসো। আমি পায়চারি করি।

—না মশায়, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে ?

হাল্কা স্বরে বলতে বলতে শিবানী খপ করে শুভ্রেন্দুর হাতটা ধরা মাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। বলে ঃ

—একি, তোমার গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে !

—ও কিছু নয়। মাথাটা একটু ধরেছে বলেই ত' নদীর ধারে বেড়াতে এলাম।

—বললেই হ'ল কিছু নয় ?

বলতে বলতে উৎকণ্ঠিতা শিবানী শুভ্রেন্দুর সামনে ঘন হয়ে এসে ওর কপালে হাত রেখে তাপ পরীক্ষা করে। তারপর শাসনের স্বরে বলে ঃ

—চল, এখুনি বাড়ী ফিরে চল।

—দোহাই তোমার, please, একটু বেড়াতে দাও এখানে। কত দিন আমরা এখানে আসি না বলত ? আর ছোট বেলায় ত' এই জায়গাটাই ছিল আমাদের বাড়ীঘর।

—এমন মুখ চোরা ছেলে আমি দুটি দেখিনি। জ্বর হয়েছে— তারপর এই দুর্বল শরীর ; এখন অন্যায় অত্যাচার হ'লে আর রক্ষে আছে ?

—রক্ষে থাক না থাক এই আমি বসলাম গুড়িটার ওপর।

যা বলা করাও তাই। বাধ্য হয়ে শিবানী ওর সামনে গিয়ে একটা হাত হাতে নিয়ে আকর্ষণ করল, কিন্তু শুভ্রেন্দুকে সে নড়াতে পারলো না। পরন্তু তার আকর্ষণে ওকে তার পাশে বসে পড়তে হ'ল।

শিবানী শুভ্রেন্দুর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটু পর বলে :

—লক্ষ্মীটি, কথা শোন, ঠাণ্ডা লাগলে বাড়বে যে অসুখ।

কিন্তু ও পক্ষকে যেন বৈরাগ্যে পেয়েছে।

—কি চুপ করে আছ যে? না শুনলে কিন্তু এই গুড়িতে মাথা কুটতে শুরু করব।

অবশেষে শিবানীর শাসন শুনে শুভ্রেন্দুকে ফিরতে হ'ল। বাড়ীতে ঢুকেই সে মমতাময়ীর কাছে নালিশ পেশ করল :

—দেখ জ্যেঠিমা, তোমার গুণধর ছেলের কি বুদ্ধি, গায়ে জ্বর নিয়ে বাবু গেছে কিনা নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়াতে!

—সে কি!

বলতে বলতে ত্বরিৎ ছেলের কাছে এসে কপালে হাত ছোঁয়ান তিনি।

—তাইত, গা যে পুড়ে যাচ্ছে তোর খোকা।

—তোমাদের মেয়েদের একটুতেই যত বাড়াবাড়ি।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে শুভ্রেন্দু।

—বাড়াবাড়ি ত বাড়াবাড়ি।তুমি ঘরে এসো, তোমায় বিছানায় শুইয়ে তবে আমি ওষুধের ব্যবস্থা করতে যাব।

সুতরাং শুভ্রেন্দুকে সুবোধ বালকের মত ওর ঘরে যেতে হ'ল শিবানীর পিছু পিছু। ঘরে ঢুকে শিবানী দ্রুত হাতে অগুছালো বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিল। টেবিল, চেয়ার সেল্‌ফ-এর বইগুলোর অনেক কটাই বিছানায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। গজগজ করতে করতে সেগুলো সরিয়ে চাদরটা তুলে ঝেড়ে আবার পেতে, বালিশ জোড়া ঠিকঠাক করে শিবানী শুভ্রেন্দুর দিকে চেয়ে হেসে বলে :

—এইবার গুডবয়ের মত শুয়ে পড় দিকিনি?

না শুলে রক্ষে নেই বুঝে শুভ্রেন্দু গায়ের জামাটা খুলে আলনায়

রাখতে যাচ্ছিল কিন্তু শিবানী সেটা ত্বরিৎ হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল। শুভ্রেন্দু শুয়ে পড়লে শিবানী পাশের ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে থারমোমিটারটা নিয়ে এলো। সেটা দু'চারবার ঝাঁকিয়ে ওর হাতে দিয়ে বলল :

—টেম্পারেচারটা দেখ ত' কত ?

জ্বর অবশ্য থারমোমিটারের পারা ঠেলে খুব বেশী উঠল না। মাত্র নিরানব্বুই। তাই মনে একটু জোর পেয়ে শুভ্রেন্দু হেসে বলল :

—কি, আমি বলিনি ওকিছু নয়।

—নয় থেকে হয় হতে কতক্ষণ ? ভারি অসুখের পর সাবধানের মার নেই। ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে ; না কি কলকাতা থেকে সেখানকার প্রেসক্রপশানমত কিছু এনেছ ?

—এনেছি—ঐ ত তাকে সাজানো রয়েছে সারবন্দি।

—উফ্। ওষুধগুলোর এক দাগও পেটে পড়েনি !

চিবুকে আঙ্গুল ছুঁইয়ে ভঙ্গী করে বলে শিবানী।

—না, মানে, এই ভুলে গিয়েছিলাম খেতে।

—এমন ভুলো মনের মানুষ যদি ভূভারতে দুটি থাকে। কবে যে তুমি আমায় পর্য্যন্ত ভুলে যাও, তাই আমার ভয়।

কথা বলতে বলতেই শিবানী আলমারী খুলে ওষুধের একটা শিশি বের করল। তারপর শিশিটা চোখের কাছে তুলে sake the bottle before use কথাটা পড়ে তা ঝাঁকিয়ে ছোট্ট গ্লাসটায় একদাগ ঢেলে খাইয়ে দিল শুভ্রেন্দুকে। ওষুধটুকু গলাধঃকরণ করে ঝাঁজ ও স্বাদের জন্য মুখ বিকৃত করে শুভ্রেন্দু। শিবানী তা লক্ষ করে হেসে কুজো থেকে একটু জল গড়িয়ে দিল তাকে।

শুভ্রেন্দু জলটুকু মুখে ঢেলে দিলে শিবানী গ্লাসটা ফিরিয়ে নিয়ে টেবিলে রাখে। তারপর বলে :

—চুপচাপ শুয়ে থাক, আমি বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।

কথা শেষ করে শিবানী দোরগোড়ায় গিয়ে একবার ফিরে

চেয়ে একটু হেসে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। পাকশালে গিয়ে শিবানী মমতাময়ীকে বলে যায় লক্ষ্য রাখতে, যাতে শরীরের প্রতি সদা উদাসীন শুভ্রেন্দু বিছানা ছেড়ে উঠে না পড়ে।

বাড়ী ফিরে শিবানী দেখল ওদের গোয়ালিনী মাসী দাওয়ার নীচে বসে বাট টেনে টেনে গরুর দুধ দোয়াচ্ছে। আর রুণীবালা বাছুরটাকে সামনে ধরে আছেন। গাভীটা একান্ত বাৎসল্যভরে সন্তানের গা চেটে যাচ্ছে। শিবানী গোয়ালিনীর পিছনে গিয়ে বলল ঃ

—উঁহু, সবটা দুইও না মাসী, আমি একটু দুইবো।

গোয়ালিনী মাসীকে অতীতে বহুবার শিবানীর এ আব্দার মানতে হয়েছে। সুতরাং তাকে এবারও মানতে হল। দুধের ভাঁরটা নিয়ে গাভীর বাঁটের নীচে বসে নিপুণ হাতে চাঁই-চুঁই শব্দ তুলে দুধ দুইয়ে শেষ করল শিবানী। তারপর দুধের ভাঁড়টা মায়ের সামনে এনে দিয়ে হেসে বলল ঃ

—এই নাও।

পশ্চিমের আকাশের অপর পারে ততক্ষণে অরুণদেব অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ছাই ছাই আঁধারে আবৃত হয়েছে পৃথিবী। দিন-উপবাসী চামচিকেগুলো সারাদিনের উপবাসের পর আহার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছে। এমন সময় শিবানী রুণীবালার অনুমতি চেয়ে বলল ঃ

—মা, আমি একটু আসছি।

বলেই কিন্তু মায়ের অনুমতির অপেক্ষায় না দাঁড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। রুণীবালা একবার ভাবলেন যে এই ভর সন্ধ্যেবেলায় সোমত্ত মেয়ে কেন বাড়ির বাইরে যাচ্ছে শুধান। কিন্তু খেয়ালী মেয়ে শিবানীর চাল চলন বরাবর এই রকমই। রুণীবালার ধারণা লেখাপড়া শিখেছে বলেই বোধ হয় শিবানী অমন ভয়লেশহীন হয়ে পড়েছে। তাদের পুরাতন ধ্যান ধারণা ও চালচলনকে ঠিক অনুসরণ করে চলছে না সে। তা ছাড়া

একটি মাত্র সন্তান ও—তাই তাদের স্বামী স্ত্রীর স্নেহের ধারা অব্যাহত ভাবেই তায় বর্ষিত হয়। ফলে সোহাগটা সাকুল্য পায় সে, শাসনটা তোলা থাকে অপ্রযোজ্য হ'য়ে।

শিবানী কিন্তু শখের সফর করতে পাড়ায় বের হয় নি। মনে মনে সারাদিন ধরে একটা মতলব এঁটে রেখেছিল সে। আর সে মতলবটা হল কানাইদের বাড়িতে গিয়ে তার সাংগপাংগদের 'এ্যাকটিভিটি ষ্টাডি' করা। তারকিত আকাশের নীচ দিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে ও এগিয়ে চলে কানাইদের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

কানাইয়ের মা মিণিবালা শিবানীকে সানন্দে স্বাগত জানাল। কেননা শিবানীর মত হুটি পাশ দেওয়া মেয়ে এ অঞ্চলে আর একটিও নেই। এমন কি তার ছেলে কানাইও কবার হাঁটু ভেঙ্গে পড়বার পর না একটা মাত্র পাশ দিয়েছে। তবু কানাইয়ের শিবানীর প্রতি যে একটা দুর্বলতা আছে তার কারণ অন্যত্র। পিতার অবর্তমানে পাওয়া বিরাট কাঠের ব্যবসাতে সে সুপ্রতিষ্ঠিত; মাস গেলে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা ঘরে আনে কানাই। পড়াশুনায় তার বুদ্ধি ভোঁতা হলে কি হয় ব্যবসাতে তেমন নয়। তাই মা সরস্বতীর করুণা লাভ না করলেও মা লক্ষ্মীর কৃপা সে অকৃপণ ভাবেই লাভ করেছে। এই কারণেই কানাইয়ের একটা দাবী ছিল শিবানীর উপর। সে দাবীর পেছনে মায়ের প্রশ্রয়ও কম ছিল না। পল্লী গাঁয়ের মায়েরা নিজের ছেলের গুণগুলি বরাবরই বড় করে দেখে থাকে—কানাইয়ের মা মিণিবালাও সে স্বভাবের বাইরে নন।

মিণিবালা শিবানীকে অপ্যায়ণের আয়োজন করতে উদ্যত হলে, ও তাকে বাধা দিয়ে জানালো যে এখন কোন কিছু খাবার প্রবৃত্তি তার নেই। বরং আর একদিন এসে সে খুব ভাল করে খেয়ে যাবে। এই কথা বলে উঠে পড়ল শিবানী। মিণিবালাকে জিজ্ঞেস করল:

—কানাইদা কোথায় খুড়ি মা?

—ঐ ত বৈঠকখানায়।

শোনামাত্র শিবানী চুপিসাড়ে এগিয়ে গেল বৈঠকখানার দিকে। কানাইয়ের বৈঠকখানা অন্দর থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কাছে গিয়ে শিবানী দেখল বৈঠকখানার দরজা জানলা সব বন্ধ। মনে মনে ও চিন্তিত হ'ল—তাই ত! কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য, পরক্ষণেই কানাইয়ের উত্তেজিত অথচ চাপা কণ্ঠ তার কানে এলো ঃ

—কিসের ভয়, কিসের সঙ্কোচ, আমি চাই শুভ্রেন্দুকে জন্মের মত জব্দ করতে। আজ এখুনি গিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করা হবে বলে আলোচনা করার আছিলায় তাকে ডেকে নিয়ে এসো এখানে। তারপর কোন এক ছুতায় মতান্তর করে গণ্ডগোল বাধিয়ে দেওয়া। সেই সুযোগে আমাদের কেউ শুভ্রেন্দুকে ছোরা মেরে খতম করে বসবে।

কানাইয়ের কথাগুলো শোনামাত্র শিবানীর মনের মধ্যে আশঙ্কার হিমেল ঝড় বইতে শুরু করে। সেই সঙ্গে ওদের দু'জনের মিলিত ভবিষ্যতের আকাশ চৌচির করে যেন সশব্দে চমকায় নিষ্ঠুরতার বিদ্যুৎ।

—কেন, ছোরা মেরে কি হবে কানাই দা—আপনার কাছে ত রিভলভার রয়েছে—তাই দিয়েই দিন না সাবাড় করে।

অপর একটি কণ্ঠ বলে। কথাটা শোনামাত্র শিবানীর নারী মন হাহাকার করে ওঠে। কাল বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। মনে মনে ভেবে পায় না মানুষ তারই সমজীবন অপর মানুষকে মারবার পরিকল্পনা এত সহজে কি করে নেয়। প্রথমে ও দ্রুত পায়ে হন্‌হনিয়ে হেঁটে চলে, তারপর দৌড়তে থাকে, শেষ পর্যন্ত উর্দ্ধশ্বাসে ছোটে শিবানী। ওর মনে কেবলই ভয় কানাইয়ের কোন চর সাইকেল যোগে গিয়ে মুহূর্ত মধ্যে না নিয়ে আসে সরল, অকুটিল মনের শুভ্রেন্দুকে। আর যদি নিয়েই আসে তবে যে অঘটন ঘটবে; তারপর আর শিবানী নামের

মেয়েটির কোন ভবিষ্যৎ অবশিষ্ট থাকতে যে পারে না সে বিষয়ে তার মনে কোন দ্বিধা নেই। তাই শুভ্রেন্দুর জীবনের এই আসন্ন দুর্বিপাককে প্রতিহত করতে হবে তাকে। ছুটে চলে শিবানী।

থেকে থেকে কেঁপে ওঠে ছুটন্ত শিবানীর মন। নির্জন প্রান্তরে ভূতের ভয়ে পালাতে পালাতে লোকালয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার মত শিবানী শুভ্রেন্দুর ঘরের সামনে এসে হাঁফ ছাড়তে যায়। কিন্তু তার বিছানায় চেয়ে সেখানে তাকে না দেখে হঠাৎ ওর মনে যেন সশব্দে আশঙ্কার বজ্রপাত ঘটে। হৃদপিণ্ডের অশান্ত দপদপানি সহ দ্রুত ছুটে যায় ও রান্নাশালে মমতাময়ীর কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে শুধায়:

—শুভ্রদা কোথায় জ্যেঠিমা?

—এই মাত্র ত শুয়ে দেখলাম, ছাতে গেল না ত?

শোনামাত্র উৎকণ্ঠিতা শিবানী তর্‌তরিয়ে ছুটে যায় ছাতের সিঁড়ির মুখে। ছুটতে ছুটতেই ও সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম ক'রে ছাতে ওঠে। শুভ্রেন্দুর ভবিষ্যতের মতই অন্ধকার ছাতের একটা কোণে এগিয়ে গিয়ে হারাধন পাওয়ার মত তাকে দু'হাতে জাপ্টে ধ'রে ওর বুকে মাথা রাখে শিবানী।

সদাসংযত শিবানীর এরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে শুভ্রেন্দু অবাক হয়। তাই ত' হয়েছে কি মেয়েটার? তাই শুভ্রেন্দু তার দুহাতে কোমরে বেষ্টিত শিবানীর বাহু ছাড়াতে ছাড়াতে বলে:

—এই, এটা কি হ'ল বল ত!

দুর্মনায়মান শিবানীর পক্ষ থেকে কোন সাড়া আসে না। শুধুমাত্র ফোঁপানর শব্দ ছাড়া। তাই বাধ্য হয়ে শুভ্রেন্দু ডান হাতে ওর চিবুক ধরে মুখখানা তুলে ধরে। অল্প আলোকে দেখে শিবানীর ডাগর দুটি বন্ধ চোখ থেকে অবিরলধারে অশ্রু ঝরছে।

—কি রে মা, তোর শুভ্রদাকে পেলি?

সিঁড়ির নীচ থেকে মমতাময়ীর সাড়া আসে। শিবানী তখন

নিশ্চিন্ততার আনন্দে, এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে তার গলা দিয়ে কথা বের হয় না। তার হয়ে শুভ্রেন্দুই উত্তর দেয় ঃ

—হ্যাঁ মা, আমি এখানে আছি।

—উঃ, তোকে নিয়ে আর পারি নে, জ্বর গায়ে এই ঠাণ্ডায় আবার ছাতে গিয়েছিস ?

মমতাময়ীর কণ্ঠ সরে যায় রান্নাশালের দিকে। শুভ্রেন্দু শান্ত গলায় শুধায় ঃ

—আচ্ছা, অমন করে ছুটে এলে কেন বলত ?

—ভয়ে।

—ভয় !

—হ্যাঁ ভয় ! ভীষণ ভয় ! এত ভয় যে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না ! যে ভয় আমাদের হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ললিতাদির ভয়কে জ্রূকুটি কেটে, হোষ্টেল পালিয়ে আমায় এখানে তোমার কাছে ছুটিয়ে এনেছে।

বিহ্বল স্বরে বলে শিবানী।

—কিন্তু এমন মারামারি হানাহানির মধ্যে তুমি কেন পালিয়ে এলে ? তারা কি ভাবছে বলত ?

—ভাবুক। তাদের ভাবায় আমার কিছু আসবে যাবে না—কিন্তু সেখানে পড়ে থাকলে তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমি দম আটকে হার্টফেল করতুম।

—কিন্তু আমার জন্যে গুণ্ডাদের অত্যাচার সয়ে অত কষ্ট পেয়ে তুমি না এলেও পারতে।

—না, পারতাম না। কেননা তুমিই যে আমার সব।

অদ্ভুত এক তৃপ্তি ভরে বলে ও।

—মাঝে মাঝে আমার মনে হয় শিবানী, তোমার মত এক অসামান্যার উপযুক্ত হবার মত কি গুণ আমার আছে।

—"কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন"।

—এমন সিরিয়াস্ কথার মধ্যেও রসিকতা করতে ইচ্ছে যায় তোমার ?

—রসিকতা নয়—এই আমার জীবনের খাঁটী কথা। তুমি ছাড়া আমি আর কিছু বুঝি না, কাউকে বুঝি না। তুমি আমার মনের ঠাকুর, প্রাণেরও। ভালবাসার ক্ষেত্রে আমি wild. আমার প্রেম বন্য। কোন বাধা, কোন ভয় আমি মানতে রাজি নই।

শিবানীর কথায় অসীম দৃঢ়তা।

—তুমি আমায় অবাক্ করলে।

—হ্যাঁ, করলুম—কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি—পথে গুণ্ডাদের হাতে পড়েছিলাম আমি—কত কিছুই ত করতে পারে তারা আমাকে নিয়ে—তোমার মনে কোন প্রশ্ন নেই এ জন্যে ?

—না। আমি ছোট হতে পারি, কিন্তু আমার মন অত ছোট নয় শিবানী। আমি জানি—তুমি, তোমার দেহ, তোমার মন, সব কিছু মিলিয়ে যে তুমি সে তুমি খাঁটী সোনার মতই কষিত। তুমি কাঞ্চনশুদ্ধা।

শিবানীর মনের মধ্যে মধুর একটা এষণা সুন্দর একটা শিহরণ বইয়ে দিলে শুভ্রেন্দুর একথা। আঁচলটা গলায় জড়িয়ে হঠাৎ ও প্রণাম করে বসল শুভ্রেন্দুকে।

—এ আবার কি ?

—একটা প্রণাম করলাম। বলছিলে না তুমি ছোট, প্রণাম করতে করতে মনে মনে বললাম তোমার মত ক্ষুদ্রের কাছে ক্ষুদ্রতর হয়ে যেন থাকতে পারি জীবন ভর।

শিবানীর কথা শেষ হতে না হতেই একটি অপরিচিত কণ্ঠ বাড়ীর সামনের দিক থেকে হাঁকে :

—শুভ্রদা, বাড়ী আছেন ?

ডাকটা শোনামাত্র শিবানীর মনের মধ্যেটা ছ্যাঁক্ করে ওঠে।

—দেখি কে যেন ডাকছে আমায়।

বলে শুভ্রেন্দু সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে যায়, কিন্তু শিবানী দুহাত প্রসারিত ক'রে তাকে বাধা দিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে :

—না, তোমায় যেতে হবে না, যেতে দেব না। যা বলবার আমি বলছি গিয়ে।

কথা শেষ করেই শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় উদ্‌ভাসিতা শিবানী।

যে লোকটি শুভ্রেন্দুকে ডাকতে এসেছিল তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায় সে। তার মুখের দিকে চেয়ে বলে :

—কি চাই ?

—আমাদের শান্তি কমিটির মিটিং হবে, তাই শুভ্রেন্দুবাবু যদি একবারটি·········

কথা শেষ হ'তে দেয় না শিবানী তার, রহস্যপূর্ণ স্বরে তীর্যকভাবে চেয়ে বলে :

—শুভ্রেন্দুবাবুর নিজেরই দেহে শান্তি নেই ত' শান্তি কমিটিতে যাবেন কি করে। তিনি বিশেষ অসুস্থ।

—ওঃ, আচ্ছা, কানাইদাকে গিয়ে তাই বলিগে।

—হ্যাঁ তাই বলবেন।

সাইকেলে উঠে শাঁ করে বেরিয়ে যায় লোকটি। শিবানী ছাতের সিঁড়ির মুখে ফিরে এসে দেখে শুভ্রেন্দু নেমে আসছে। সে নেমে এলে রোষকণ্ঠে বলে :

—তোমায় না পইপই করে বলে গেলাম বিছানায় শুয়ে থাকতে, উঠে পড়েছ কেন ?

মমতাময়ী ততক্ষণে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, শিবানীকে সমর্থন করে সে বলে :

—ঠিকই ত'। এই একটা ভারি অসুখ গেল, আর আজই যদি অত্যাচার সুরু করিস—

—না মানে মাথাটা একটু ধরেছিল কিনা তাই ছাতে গিয়েছিলুম।

বলতে বলতে অপরাধীর মত ধীর পায়ে শুভ্রেন্দু এগিয়ে যায় নিজের ঘরের দিকে। শিবানী ইতিমধ্যেই ঘরে গিয়ে বিছানা বালিশ ঠিকঠাক ক'রে দিয়েছে। শুভ্রেন্দু শুয়ে পড়লে সে আর একবার থারমোমিটার দিয়ে জ্বর পরীক্ষা করে দেখে জ্বর আর বাড়ে নি। যা ছিল তাই আছে। তাপযন্ত্র আলমারিতে যথাস্থানে রেখে দিয়ে শুভ্রেন্দুর দিকে চেয়ে শিবানী দৃঢ় স্বরে বলে :

—কানাইদাদের শান্তি কমিটিই তোমাকে শেষ করবে, এই আমি বলে দিলুম।

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ওরা আমায় মেরে ফেলবে?

—হ্যাঁ, সেইটাই আমি সন্দেহ করি।

দৃঢ় স্বরে বলে শিবানী।

—'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'!

হেসে হাল্কা স্বরে বলে শুভ্রেন্দু।

—মরণে যদি অত সাধ অধ্যাপক মশাইয়ের আমাকে নিয়ে মিলিত জীবন সুরু করার স্বপ্ন দেখেছিলে কেন?

কণ্ঠস্বরে ঝাঁজ মিশিয়ে বলে শিবানী। এ কথা শুনে শুভ্রেন্দু বোঝে যে সে চটেছে। তাই চুপ করে যায়। কিন্তু শিবানী চুপ করে না। বলে :

—আবার যদি দেখি বিছানা ছেড়ে উঠে ছাতে বেড়ানোর বিলাসিতা করছ, তবে আমি ঠিক দেয়ালে মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব, হ্যাঁ।

কথা শেষ করে শিবানী রাগত পায়ে ঘর ছেড়ে উঠানে নামে, উঠান ছেড়ে খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে যায় ও। অন্ধকার গ্রাম্যপথ বেয়ে হন হন করে ও আবার এগিয়ে চলে কানাইদের বাড়ীর উদ্দেশ্যেই।

ও যখন কানাইদের বাড়ীর খিড়কীর কাছে আসে তখন কানাইয়ের শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে

মিণিবালাকে। ছেলেকে রাত্রির আহার সেরে নেবার তাগিদ দিতে এসেছিল সে।

—অ কানু, আয় বাবা খেতে। সব যে জুড়িয়ে গেল।

—আঃ বলছি ত' এখন বিরক্ত করোনা—

জড়ানো অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে কানাই।

—তুমি যা রান্না করেছ, ওসব বাজে জিনিস খেয়ে সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই।

—কি জানি, কি যে সব ছাই পাঁশ খাস।

বলে গজ গজ করতে করতে মিণিবালা নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। ঠিক এই অবসরই খুঁজছিল শিবানী। সে কানাইকে একলা পেতে চায় একটু—বুঝতে চায়—বোঝাতে চায় তাকে কিছু। কানাইয়ের ঘরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ও অন্ধকার একটা ধাড়ি ছুঁচোর ঘাড়ে পা দিয়ে শিউরে ওঠে! আঘাত পেয়ে সে জীবটা 'চিক্ চিক্' শব্দ করতে করতে কুতকুতে পায়ে ছুটে পালায়। শিবানীর গাটা ঘিন ঘিন করে। চারিদিকের বাতাসে বিশ্রী একটা গন্ধ। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে ও এগিয়ে যায় সন্তর্পণে। বেশ উঁচু দাওয়ার ঘর কানাইয়ের। তিনটে সিঁড়ি ভেঙ্গে বারান্দায় উঠতে হয়। এগিয়ে যায় ও দরজার কাছে। তাতে চাপ দেবার আগে একটু থমকে দাঁড়ায়। ভাবে, ঘরের ওধারে এক মাতাল মানুষ, তার মত এক সোমত্ত মেয়ে যে স্ব-ইচ্ছায় যাচ্ছে তার কাছে, এতে কতটা মনের জোর থাকা উচিত, কতটা সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত তার। মুহূর্তের অসতর্কতায় কী না হতে পারে। ড্রেস দিয়ে পরা শাড়ির আঁচল খুলে পিঠ বুক ঢেকে এনে প্রান্তটা গুঁজে দেয় বাঁ হাতের নীচে কোমরে। হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ওঠা নামা নিয়ে ও এগিয়ে গিয়ে চাপ দেয় ভেজানো দরজার পাল্লায়। কজায় 'কিঁ কিঁ' শব্দ হয়—শুনে বুঝি ভেতরের মানুষটা উৎকর্ণ হয়—নেশার মধ্যেও জড়ানো স্বরে বলে ঃ

—কে বাবা আবার ?

দরজাটা খুলে ফেলে শিবানী পরমুহূর্তেই। চৌকাঠের ফ্রেমে যে সুন্দর নারীমূর্তিটি দেখে কানাই কাকতি তার নেশা-ঘোর চোখে—তার সে রূপ কত সময়ই ত' তার সারাটা মন জুড়ে থাকে। কিন্তু রক্ত-মাংসের শরীরে সেই শিবানী আজ তারই ঘরে এই রাতে অভিসারিণী হয়ে এসেছে নাকি? সত্যি না স্বপ্ন? বাস্তব না কল্পনা? কায়া না সবটাই মায়ার ছলনা? দু'হাতের পিঠ দিয়ে চোখটা ঘষে নেয় কানাই। তাতেও চৌকাঠের ফ্রেম থেকে শিবানীর মূর্তি মুছে না যাওয়ায় ডান হাত দিয়ে সে বাম হাতে চিমটি কেটে দেখে যে তার এখনও স্বাভাবিক জ্ঞান আছে কিনা। কানাইয়ের মনের ভাবান্তর যেন শিবানী তার চিন্তার দর্পণে দেখে ফেলে। মনটাকে সে আরও প্রত্যয়দৃঢ় করে। এগিয়ে একটি পা রাখে ঘরের মধ্যে, তারপর আর একটি। দুহাতে দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে তাতে পিঠ রেখে দাঁড়ায়। মিষ্টি হেসে বলে ঃ

—অবাক হচ্ছ, না কানাইদা ?

—আঁ-আঁ-হ্যা—না-না।

—বসতে বলবে না আমায় ?

—মাইরী, সে কি না বলে পারি। বস বস।

বলতে বলতে কানাই তার বিছানার পরিষ্কার চাদরটা দুহাতে সাফ ক'রে দেয় সাত্‌তাড়াতাড়ি।

—না থাক, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি ঐ চেয়ারটাতেই বসি।

যথা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে বলতে বলতে অপর পক্ষের সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে শিবানী চেয়ারটায় তার নিতম্ব রক্ষা করে।

—আমি ঠিক এখনও বুইলে, বিশ্বাস করতে পারছি না শিবানী যে তুমি—আমার ঘরে—এত রাতে। মানে……

—তুমিই বল কানাইদা, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তুমিও কি এই ভাবে আমি কোনদিন আসবো তোমার কাছে—আশা করনি?

শোনামাত্র একটা হিক্কাসহ হেসে ওঠে কানাই। বলে:

—হ্যাঁ, তা অস্বীকার করব না। বুইলে, সত্যি তা করেছিলাম।

—তবে আর অবাক হচ্ছ কেন? তোমার ইচ্ছাশক্তিরই আজ জয় হল—মনে করছনা কেন।

—আচ্ছা, তুমি জান, শুভ্রেন্দুর কি জ্বর হয়েছে?

—ওর নাম আর মুখেও এনো না—শুনলেও পাপ। হাজার হ'লেও ওরা বিদেশী—ওরা বঙ্গাল। আমাকেই ও তোমার ভয়ে শিখিয়ে দিয়েছিল জ্বর হয়েচে বলে বলতে।

কথাকটা বলে শিবানী কানাইয়ের মুখে সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। আর শিবানীর মুখে শুভ্রেন্দুর নিন্দা শুনে আনন্দে কানাইয়ের ছাতফাটানো অট্টহাসি হেসে উঠতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা না করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলে:

—সেই বুঝলে তুমি, কিন্তু কত দেরীতে।

—ভুল ত মানুষেই করে কানাইদা, তবে সে ভুল শোধরাবার সুযোগ দেবে না আমায়?

—তুমি করবে ভুল, এ হতেই পারেনা। না না, ঠিকই ত' ও তোমার উপযুক্ত পাত্রই ছিল—বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমার চেয়ে অনেক অনেক বড় ও। কিন্তু ঐ এক দোষ—মানে এক ভাঁড় দুধে এক কৌটা চোনা—ও যে বঙ্গাল।

—আমি না হয় ভুল করেছি—কিন্তু ও আমার নানা কথায় ভুলিয়ে কেন ওর প্রতি আকৃষ্ট করল? কি বল্‌ব কানাইদা, আমি যদি একটা ছোরা পেতাম……

দাঁতে দাঁত ঘষে বলে শিবানী।

—সত্যি? মাইরী! ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না—ও কাজ আমিই সেরে নেব।

বলতে বলতে বিছানার তোষকটা তুলে লোহার যে কালো জিনিসটি বার করে কানাই, তা' দেখে শিউরে ওঠে শিবানীর সারা দেহ-মন। বিস্ময় কণ্ঠে বলে ঃ

—রিভালভার!

—হ্যাঁ, রিভালভার। আজই আমি ওর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু কাপুরুষটা এলো না শরীর অসুস্থ বলে।

শোনামাত্র শিবানীর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমপ্রবাহ মাথা থেকে যেন পা পর্য্যন্ত নেমে মাটিতে মিশে যায়।

—আমার একটা কথা রাখবে কানাইদা?

—একটা? তোমার একশ'টা কথা রাখতে হ'লেও রাখবো। বুঝলে, কানাই কাকতির দিল আছে—সে বঙ্গাল শুভ্রেন্দুর মত কাপুরুষ নয় শিবানী।

বুকে দু'বার চাপড় মেরে বলে কানাই।

—ওকে যদি মারতেই হয় আমি মারব—আমার বুকে যে কি জ্বালা কানাইদা, একটা বঙ্গালকে কিনা আমি……

—বেশ, তুমি যদি আমার কাজটা করে দিতে চাও, কথা দিচ্ছি, করবে। কিন্তু তুমি রিভালভার ছুঁড়তে ত জান না।

—না জানি, শিখে নেব তোমার কাছ থেকে।

—তবে কাল সন্ধ্যায়—নদীর ধারের শিমুল গাছটার কাছে যেখানে বঙ্গাল শুভ্রেন্দু আর তোমার ছোট বেলার খেলাঘর ছিল, চলে যেও। সেখানে তোমাকে শিখিয়ে দেব রিভালভার ছোঁড়া।

—বেশ, তাই যাব।

বলে হাত বাড়িয়ে বিছানা থেকে শিবানী রিভালভারটা তুলে নিল।

—ওকি, ওটা নিয়ে যাচ্ছ কেন?

—আমার কাছেই থাক না, কাল নিয়ে যাব শাড়ির আড়াল করে।

আবেশমাখা স্বরে কি সুন্দর করে বলে শিবানী।

—বেশ বেশ তাই নিয়ে যেও।

হেসে দরাজ স্বরে বলল কানাই। যেন এ মুহূর্তে শিবানী চাইলে গোটা পৃথিবীটাই সে তাকে দান করে দিতে পারে।

কানাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে ঝিঁঝিঁ ডাকা অন্ধকার গ্রাম্য পথে জোনাকীর আলোয় পথ দেখে সম্মোহিতের মত ছুটে চলে শিবানী। এতক্ষণে তার মনে হয় যে সে কি দুঃসাহসিক কাজ সমাধা করে এল। এ কথা মনে হতেই সারা গায়ে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম বেরোতে থাকে। ভয়ানক ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে।

বাড়ীতে এসে সন্তর্পণে নিজের ঘরে ঢোকে ও। সুটকেশ খুলে তাতে রিভালভারটা চালান করে দিয়ে চাবিটা আঁচলে বেঁধে নেয়। তারপর ঘর থেকে বেরুতেই রুণীবালা অনুযোগ করে :

—কিরে আবার কোথায় চললি ? সেই এসে অবধি কোথায় যে টো টো করে ঘুরছিস ?

—শুভ্রদার আবার জ্বর এসেছে যে মা। তাই একবারটি দেখে আসি গে।

উদ্বেগকণ্ঠে অনুনয় করে বলল শিবানী।

—এতক্ষণ তবে কোথায় ছিলি ?

—এতক্ষণ ত পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম।

কানাইদের বাড়ী যাবার কথা গোপন করে বলে ও।

—আচ্ছা মেয়ে যা হ'ক, তোর কি ভয়ডর বলে কিছু থাকতে নেই।

—আমার মনে ইয়া মস্ত বড় একটা যে ভয় আছে না মা যাতে ছোটখাটো ভয়কে ভয়ই মনে করিনে।

দুহাত প্রসারিত ক'রে হেসে বলে মায়ের কথাটার গুরুত্ব লাঘব করে শিবানী আবার শুভ্রেন্দুদের বাড়ীর পথে অন্ধকারে অপসৃত হয়ে গেল।

শুভ্রেন্দুর ঘরে ঢুকে তার কপালে হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করে দেখে শিবানী। মনে হয় বেশী বাড়েনি। জ্বরের তাপ কিছুটা কমেছেই বুঝি। আশ্বস্ত হয় সে। হাতটা সরিয়ে নিতে গিয়ে বাধা পায়। ততক্ষণে শুভ্রেন্দু তার হাতটা দিয়ে শিবানীর হাত চেপে রেখেছে।

—এই, কি হচ্ছে ?

—কী ঠাণ্ডা তোমার হাত ! কপালটা জুড়িয়ে গেল।

অনেকটা সময় এইভাবে বয়ে গেল। শিবানী বলে ঃ

—লক্ষ্মীটি, না, আর নয়। ঘুমিয়ে পড়।

বলে হাত সরিয়ে শুভ্রেন্দুর গায়ের চাদর ভাল করে টেনে দেয়। মশারী ফেলে, তোষকে গুঁজে দেয় তার প্রান্ত। হ্যারিকেনের শিখাটা কমিয়ে দিয়ে দোর ভেজিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

যে নেহ্রু আসাম পরিদর্শন শেষে বিবৃতি দেয় "আমি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হ'লে অনেক আগেই হাঙ্গামার পরিণতিকে প্রতিহত করতাম," সেই পণ্ডিত নেহ্রুকে আমি প্রশ্ন করি নিজে তুমি প্রধান-মন্ত্রী হয়েও কি ম্যাজিষ্ট্রেটরা যা করতে পারেনি তা করতে পেরছ? পারনি—পার্টি স্বার্থের স্বার্থান্ধতায় ন্যায় বিচারে প্রবৃত্ত না হওয়ার দোষে কি তুমি নিজেও দুষ্ট হওনি পণ্ডিত নেহ্রু?

যে রঞ্জিৎ বড়পূজারীর মৃত্যুতে তোমরা—অনেক নেতাই শোকের বন্যা বইয়ে দিয়েছ, তারা পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে Law & Order maintain করার ব্যাপারে যে দৃঢ়তা দেখায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী, তার তো মোটেই প্রশংসা করনি। এ কোন্ নীতিতে তুমি চলেছ নেহ্রু—তুমি কি শুধ্ অসমীয়া ভাষীদেরই প্রধানমন্ত্রী, বাঙ্গালীদের নয়? তবে বাংলা ও বাঙ্গালীদের সম্পর্কে তোমার এমন বিমাতৃসুলভ আচরণ কেন? সংবাদপত্রের ওপর তুমি অতিরঞ্জনের দোষ চাপিয়েছ, কিন্তু ভিন্ন প্রদেশের যে সব সংবাদপত্র এত বড় একটা ঘটমান সংবাদ সম্পূর্ণ চেপে গেছে, যে শাসন হাঙ্গামায় প্রকৃত হতাহতের সঠিক সংখ্যা আজও পর্য্যন্ত দিতে পারে নি—তার ত কোন নিন্দাবাদ তুমি করনি? সংবাদপত্রকে সঠিক সংবাদ দেবার দায়িত্ব কি সরকারেরও পালনীয় নয়? তাই বলি পণ্ডিত নেহ্রু তুমি ভুল করছ—ভুলই করছ।

শুভ্রেন্দুর অসুখে উৎকণ্ঠিতা শিবানী কোনক্রমে রাতের আহার শেষ করে। তারপর নিজের ঘরে এসে শয্যা নেয়। অবেলায়

ঘুমিয়েছে বলে সহজে ঘুম এলো না তার চোখের পাতায়। কাল রাতে তার দেহের ওপর দিয়ে যে পশুতার প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে তার রেশ এখনও কাটেনি। সারা গায়ে ওর অসহ্য ব্যথা চাগিয়ে উঠছে থেকে থেকে। শরীরের কোষে কোষে যেন ব্যথার পীড়ন। ব্যথাহত শিবানীর মনে ভেসে উঠল নেশাতুর কানাইয়ের মুখটা। মনে পড়ল কানাইকে বলা কথাগুলো। মনে হতেই শিউরে উঠল ও। না-না, এ হ'তে পারে না। শুভ্রেন্দু যে তার নারীজীবনের একমাত্র ঈশিত ধন!

শুভ্রেন্দু যেবার অনার্স নিয়ে বি, এ পাশ করে চৈত্র-শেষে দেশে এলো খুব ধুমধাম করে সেবার ওরা "রঙ্গালী বিহু" উৎসব পালন করে। এটাই শিবানীদের বড় উৎসব। ও তখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। বিধিমত নববস্ত্রে বরতনু ঢেকে সকল গুরুজনকেই প্রণাম করেছে ও মায়ের নির্দেশ মত। শুধু একজন মাত্র তখনও বাকী—সে শুভ্রেন্দু।

সকাল থেকে বই মুখে বসে আছে ছেলেটা তার ঘরে। এই বেশে ওঘরে যেতে, ওর সামনে যেতে, তার কৈশোর অতিক্রমা কুমারী মনে সে কী লজ্জা! অনেকক্ষণ চৌকাঠের ওদিকে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল যেন ও—to go or not to go. ঠিক এমনই সময় কি একটা কাজে রুণীবালা এ বাড়ীতে আসেন। তাঁর চোখে পড়ে যায় দ্বিধাজড়িত, লজ্জাবিধুরা মঞ্জুলমুখী শিবানী। তাই তিনি চেঁচিয়েই বলেন ঃ

—ও কিরে, শুভ্রর ঘরের কাছে অমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

সঙ্গে সঙ্গে মমতাময়ীর উদ্দেশ্যে রুণীবালা হেঁকে বলেন ঃ

—ও দিদি, দেখ এসে মেয়ের কাণ্ড! যার সঙ্গে ন্যাংটোপুটো থেকে কিল-চড়-চুলোচুলি দিয়ে ভাব—তার কাছে যেতে, তাকে প্রণাম করতে লজ্জা কি মেয়ের?

মায়ের এমন কথায় শিবানী তাকে একটা ভেংচি কেটে দিয়ে বিধুনিত মনে ত্রস্তে শুভ্রেন্দুর ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তারপর ধীর পায়ে, নতমুখে এগিয়ে গিয়েছিল শুভ্রেন্দুর সামনে।

শুভ্রেন্দু নতুন শাড়ির খস্‌খস শব্দ শুনে ও ঘ্রাণ পেয়ে চোখ তুলে বই থেকে শিবানীর মঞ্জুল মুখে চাওয়ামাত্র মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সহসা শুভ্রেন্দুর মুখ দিয়ে যে কথাটা বেরিয়ে এসেছিল, তা হ'ল :

—সুন্দর!

কথাটা শোনামাত্র শিবানীর শরীরের শিরায় শিরায় যেন কি এক সুরমূর্চ্ছনার শিহর বয়ে গিয়েছিল। আর এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে না থেকে শুভ্রেন্দুর পায়ের কাছে ঢিপ্‌ করে একটা প্রণাম ঠুকে ও এক ছুটে পালিয়ে এসেছিল। ত্বরিৎ নিজেদের বাড়ীতে ফিরে বড় ঘরে ঢুকে পড়ে দোর ভেজিয়ে দিয়েছিল। কম্পিত বক্ষে এগিয়ে বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে নিজের রূপ দেখে নিজেও অস্ফুটে বলেছিল :

—সুন্দর।

পরক্ষণেই এক মধুর উন্মাদনায় ও বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল। সারা গায়ে কি যেন এক শিরশিরানি। জীবনে এর আগের অন্য কোন 'রঙ্গালী বিহু' পার্বণে ও এবারের মত এত খুশী হয়নি। বুকের মধ্যেটায় একান্ত এক ধুক্‌পুকুনি। কত না ভাল লাগা সে কাঁপন।

ঐ বছরই পৌষ সংক্রান্তিতে "ভোগালী বিহুর" দিনও সকালে স্নান করে, আগুনে তিল চাল অর্পণ করার পর দ্বিতীয়বারও সেই কাপড়টা পরে। তারপর সেই আগের মত লাজুক মন ও মুখ নিয়ে ঢুকেছিল গিয়ে শুভ্রেন্দুর ঘরে। শিবানীকে দেখে ঠিক আগের মতই শুভ্রেন্দু মুগ্ধ চোখে চেয়ে নরম স্বরে বলেছিল :

—সুন্দর।

আর ঐ সুন্দর কথাটা শুনেই ও যখন চঞ্চল পায়ে পালাতে যাবে ঠিক তখুনই শুভ্রেন্দু অস্ফুট স্বরে আর একটা কথা বলেছিল :

—এই, শোন ?

—উঁ।

এক অক্ষরের উত্তর সহ শিবানী ওর ডাগর ভাষাময় চোখ তুলে চকিতে চেয়েছিল। শুভ্রেন্দুর চোখের কৌতুকের ইসারায় পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল তার প্রায় নাগালের কাছে। শুভ্রেন্দু হাত বাড়িয়ে ওর এক হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ ধরে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নিয়েছিল ওকে। তারপর ওর সাবানঘষা ফর্সা সুন্দর হাতটা হাতে নিয়ে তাতে এঁকে দিয়েছিল একটা আলতো চুম্বন। সঙ্গে সঙ্গে শিবানীর হৃদয়তন্ত্রীতে সে কি চাঞ্চল্য! হঠাৎ যেন সারা রোমে রোমে অনুভব করেছিল ও প্রথম যৌবনের জাগরণ! মুহূর্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একছুটে ও তক্ষুনি বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আর আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতে শুনেছিল এক সুন্দর সঙ্গীতের রেশ। হঠাৎই যেন দিনের আলো উজ্জ্বলতর হয়েছিল। পৌষের সে দুপুরেও অকালে কি মিষ্টি করেই না ডেকে উঠেছিল উঠানের আমগাছে একটা কোকিল।

ছুটে এসেছিল ও নিজের ঘরে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন নতুন করে চিনেছিল। ওর মনে হয়েছিল কিশোরী মেয়েটি যেন মিলিয়ে গেছে, লীন হয়ে গেছে সদ্যজাগা যুবতীর দেহে। মিষ্টি একটু হেসে নিজের ডান হাতটা আস্তে আস্তে মুখের কাছে তুলে ঠিক শুভ্রেন্দুর এঁকে দেওয়া চুম্বনের জায়গাটায় ছুঁইয়েছিল নিজের সরু রাঙ্গা ঠোঁট। প্রতি অঙ্গে অঙ্গে যেন কিসের এক উন্মাদনা। কি এক আবেশ যেন ছড়িয়ে পড়েছিল ওর দেহের কোষে কোষে।

এরপর 'ভোগালী বিহু' উৎসবের অঙ্গ প্রার্থনায় বসে ওর বাবা সরযূপ্রসাদ যখন বলেছিলেন :

—"হে দেব সোনা রায়, তুমি বর দিয়া যাতে ঘর-গিরী ধনে বংশে চন্দ্র সূর্যর দরে জিলিকি উঠে। কারণ তুমি সত্য, তুমি সুন্দর, তোমার দয়াত বিশ্বব্রাহ্মাণ্ড চলি আছে। তুমি ইচ্ছা করিলে সকলো করিব পারা।"

ও কিন্তু তখন মনে মনে প্রার্থনা করেছিল ঃ

—হে দেব সোনা রায়, শুভ্রদা যেন চিরদিন আমাকে আজকের মতই ভালবাসে। আমাদের ভালবাসা যেন চন্দ্র সূর্যের মত বিকশিত হয়ে ওঠে। সুন্দর হয়ে ওঠে। সত্য হয়ে ওঠে। সার্থক হ'য়ে ওঠে ··

বিছানা ছেড়ে নেমে শবানী ওর ট্রাঙ্কটা খুলল। ডালাটা তোলা মাত্র উপরেই রাখা রিভালভারটা ওর ছ'চোখে যেন তীব্র যন্ত্রণার এক ঝাপ্‌টা মারল। ও চোখ বুজে অস্ত্রটা জ্যান্ত সরীসৃপ ধরার মত ধরে তুলে ছুঁড়ে দিল বিছানায়। তারপর ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে অতি যত্নে বের করল শুভ্রেন্দুর ফটোটা।

ফটোটা নিয়ে বিছানায় ফিরে এলো শিবানী। চোখের সামনে সেটা ধরে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইলো তার দিকে। দেখে যেন আশা মেটে না ওর। পাশে পড়ে থাকা রিভালভারটা হাতে নিয়ে মনকে শক্ত করে ফটোটার দিকে সেটা তাক করে ধরামাত্র হাতটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠে অস্ত্রটা খসে পড়ল।

এই শুভ্রেন্দুকে হত্যা করতে চায় কানাই কাকতি। যে শুভ্রেন্দুকে সে পেয়েছে বুঝি জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলস্বরূপ। সেবারই দুর্গা-পূজার সময় মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দেখে ও যখন দল-ছাড়া হয়ে ফিরছিল শুভ্রেন্দুদের বাড়ীর সুমুখ দিয়ে প্রকৃতিতে তখন সন্ধ্যার আবছায়া। হঠাৎ কোথা থেকে কানাই ছুটে এসে খ্যাপা পশুর মত জাপ্টে ধরেছিল তাকে আর সেও সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিল কানাই-এর গালে পাঁচ আঙ্গুল বসানো ঘৃণার চড় কষে। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ ওর ঘিনঘিনিয়ে উঠেছিল।

প্রায় সারা রাত ভাবনা-চিন্তায় জেগে কা য়ে সকালের দিকটায় চোখের পাতা এক করল শিবানী।

রুণীবালার প্রতিদিন ঘুম ভাঙ্গে নবউষার আভা প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়বার আগেই। আজও আবছায়া অন্ধকারে তিনি উঠোনে গোবর-জলের ছিটে দিচ্ছিলেন—ভাঙ্গা হাঁড়িটা হাতে নিয়ে। এমন সময় শিবানীর বুকফাটা আর্তনাদ কানে এলো তাঁর। চমকে ওঠায় হাত থেকে পড়ে গেল গোবর-জলের পাত্র। ভেঙ্গে গেল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন মেয়ের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে। করাঘাত হানলেন দোরে। শিবানীর বাবারও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে তাঁকেও দেখা গেল ত্রস্তে মেয়ের ঘরের সামনে ছুটে আসতে। বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে উদ্বেগভরে ডাকলেন ত্বজনে দ্বৈত কণ্ঠে:

—খুকী? খুকী?

সাড়া মিলল শিবানীর। সঙ্গে সঙ্গে দরজাও খুলল সে। বাবা-মা ত্ব'জনেই মেয়ের চোখের দিকে চেয়ে দেখলেন—মুখে চোখে তার বিহ্বল ভাব। কি এক আতঙ্কের ছাপ। কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম।

—কি হল রে?

—স্বপ্ন। খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলাম মা!

রুণীবালা বিছানা থেকে পাখাটা নিয়ে এসে ঐ হাতেই মেয়ের মাথায় বাতাস করতে লেগে গেলেন। শিবানী তখনও স্বপ্নাচ্ছন্ন। সেই সেদিনের মত বিশ্রী স্বপ্ন—ঘনকালো আঁধারের মধ্যে মা কালীর হাতের নৃমুণ্ডের মত শুভ্রেন্দুর ধড়ছাড়া মুণ্ডটা ভেসে বেড়াচ্ছে—গলা থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটছে রক্ত!

একটু পরে হাত বাড়িয়ে শিবানী মায়ের হাত থেকে পাখাটা নিয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বলে:

—তুমি কাজে যাও। আর হাওয়া করতে হবে না।

রুণীবালা পাখা রেখে অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে চলে যান।

সাত সকালে গৃহাঙ্গন পবিত্র করতে গিয়ে বাধা পড়ায় মনে মনে একটা কিছু অমঙ্গলের আশঙ্কা ক'রে চিন্তিত হন।

দুঃস্বপ্ন দিয়ে দিন সুরু হওয়ায় শিবানীর মনেও ভাবনার অন্ত নেই। সুটকেশ খুলে টুথ ব্রাশটায় পেষ্ট ভরিয়ে নিয়ে কুয়োতলায় গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিল ও। তারপর ঘরে এসে শাড়িটা ঠিকঠাক করে পরে নিয়ে রুণীবালার সামনে এসে বলল :

— জ্যেঠিমাদের বাড়ী যাচ্ছি মা।

—কিছু মুখে না দিয়েই যাবি ?

—শুভ্রদার যে জ্বর কাল থেকে।

উদ্বেগকণ্ঠে বলে উত্তরের অপেক্ষায় না দাঁড়িয়ে খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে গেল শিবানী।

শুভ্রেন্দুদের বাড়ীতে এসে দেখল মমতাময়ী প্রতিদিনের মত কুয়োতলায় প্রাতঃস্নান সেরে নিচ্ছেন—আর জ্যাঠামণি বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে তামাকু টেনে যাচ্ছেন পরম তৃপ্তিতে। ওকে দেখে মুখ থেকে নলটা বের করে বললেন :

—এই যে মা-জননী, শুভ্রর জ্বরটা দেখ ত' গিয়ে।

—দেখছি জ্যেঠামণি।

বলে শিবানী শুভ্রেন্দুর ঘরের দরজায় গিয়ে হাত ছোঁয়াতেই সেটা নিঃশব্দে খুলে যায়। ঘরে ঢুকে দেখে মশারীর ভেতর চোখ বুজে নির্জীবের মত পড়ে আছে সে। মুখে-চোখে রোগ-যন্ত্রণার চিহ্ন সুস্পষ্ট। দেখে উদ্বিগ্ন হ'ল শিবানী। উদ্বেগভরে শুভ্রেন্দুর কপালে হাতের পিঠ রেখে দেখল এখনও জ্বর আছে। ওর হাতের ছোঁয়া পেয়ে চোখ খুলল শুভ্রেন্দু। শিবানী বলল :

—কেমন আছ ?

—মাথাটা বড্ড ভার ভার মনে হচ্ছে। যন্ত্রণাও আছে সেই সঙ্গে।

—বলেছিলাম না সাবধানের মার নেই।

বলতে বলতে ও আলমারি থেকে থার্মোমিটার বের করল। তারপর সেটা খাপ থেকে খুলে শুভ্রেন্দুর হাতে দিল। টেবিলের টাইমপিস্‌টার দিকে চেয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তে সেটা চেয়ে নিয়ে চোখের কাছে তুলে দেখল শিবানী জ্বর যেমন ছিল তেমনি আছে।

—কি, জ্বর কমেছে ?

প্রশ্ন করে শুভ্রেন্দু।

—না।

—তবে ?

—যা ছিল তাই আছে।

—ওঃ।

—এখন মুখ-হাত ধোবে না দেরী হবে ?

—যেমন বলবে !

নির্লিপ্ত স্বরে বলে শুভ্রেন্দু।

শিবানী কুয়োতলায় গিয়ে দড়ি-বালতি নামিয়ে জল তোলে। বালতি ভরা জল ও ঘটি নিয়ে এসে শুভ্রেন্দুর ঘরের সামনে বারান্দায় রাখে। তারপর ঘরে গিয়ে টেবিল থেকে ব্রাশ নিয়ে তাতে পেষ্ট ভরিয়ে দিতে দিতে বলে ঃ

—উঠে পড় এবার।

শুভ্রেন্দু গায়ের চাদরটা একপাশে সরিয়ে উঠে পড়ে বিছানায়। মেঝেতে নেমে পায়ে শ্লিপার গলিয়ে নিতেই শিবানী তার হাতে ব্রাশটা গুঁজে দেয়। শুভ্রেন্দু চলে যায় বারান্দায়—শিবানী এই অবসরে পরিত্যক্ত বিছানাটা পরিচ্ছন্ন করে দেয়। টেবিল ও সেল্‌ফটার জিনিসগুলো গুছিয়ে নেয়। তারপর ও চলে যায় রান্না-শালে মমতাময়ী তখন উনানে চায়ের জল চাপিয়ে আনাজের ঝুড়ি নিয়ে বঁটি পেতে বসেছিল। ঘরে ঢুকে ও মমতাময়ীকে বলে ঃ

—আমি কুটছি তরকারী, কতদিন যে বঁটিতে বসিনে জ্যেঠিমা। ভুলেই গেছি বুঝি।

—তুই কুটবি ? আচ্ছা আয়।

বলে বঁটি কাত করে রেখে উঠে পড়েন মমতাময়ী। এগিয়ে যান বাষ্প ওঠা কেত্‌লির দিকে। সাঁড়াশী দিয়ে ধরে সেটা নামিয়ে নেয়। চায়ের কৌটো থেকে টি পটে চা দিয়ে তাতে জল ঢেলে ঢাকনা আটকিয়ে দেয়।

—শুভ্রদা কি খাবে জ্যেঠিমা ?

—দুধ দোয়ানো হ'লে এখন ত এক কাপ দুধ দে ওকে।

কথা বলতে বলতে মমতাময়ী চা ঢালে কাপে। শিবানী একমনে কুটনো কুটে যায়। মনের মধ্যে তখন ওর কেত্‌লির জলের মতই চিন্তা যেন টগবগিয়ে উঠছে। ভাবে ও কাল কানাইদার বাড়ীতে গিয়ে অতটা দুঃসাহস না দেখালেই হ'তো। কিন্তু না যদি যেত ও ওদের ঐ ঘন ঘন শান্তি কমিটির মিটিংয়ের অছিলায় শুভ্রেন্দুকে ডেকে নেবার রহস্যটাকে ত' জানতো না। কিন্তু জেনেই বা কি করতে পারে সে। আর কিছু না হক অন্ততঃ একদিনের জন্য ওদের প্রধান হাতিয়ার রিভালভারটা নিয়ে ত এসেছে। কিন্তু এনেই বা লাভ হ'ল কি। সেই সঙ্গে নিজের ওপর কতটা ঝুঁকি নিয়েছে। সন্ধ্যার আবছায়ায় ও যখন যাবে রিভালভার ছোঁড়া শিখতে তখন কানাই কাকতি একলাটি পেয়ে যদি কিছু করে বসে তা'ছাড়া ক'দিনই বা সে কানাইকে নিরস্ত করতে পারবে। কদিন সে পারবে শুভ্রেন্দুর জীবন-প্রদীপের শেষ হ'য়ে আসা সলতেটা চাতুরির কাঠি দিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে যেতে।

এ সব ভেবে বড় অসহায় মনে হয় ওর নিজেকে। বুকের ভেতরটায় গুমরে ওঠে একটা ব্যথা, অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা একটা অপ্রতিরোধ্য অসহায়তা, উপায়হীনতার একটা আক্ষেপ। নিজের অজান্তেই এক সময় ওর চোখের কূল ছাপিয়ে জল এসে যায়।

চা তৈরী শেষ করে মমতাময়ী ওর দিকে চেয়ে অবাক হ্য়ে যায়। তাই ত! কাঁদে কেন মেয়েটা, কি হ'ল এমন, এরই মধ্যে? শ্রাবণের মেঘের মত মুখটা থম্‌থমে দেখেছিল বটে, কিন্তু সে মেঘ যে চোখের জলের বৃষ্টি হয়ে ঝরবে এতটা আশা করেনি মমতাময়ী। মনে মনে ভেবেছিল শুভ্র বলতে ও যা অজ্ঞান তার অসুখের জন্যই বুঝি উৎকণ্ঠিত।

—কি রে, কি হ'ল মা তোর?

অপ্রস্তুতের একশেষ শিবানী! তাই ত', সত্যিসত্যি চোখে যে ওর জল! যে জল কিনা ও মুছতেও পারে না হাত বাড়িয়ে বা রুখতেও পারে না সংযমের শাসনে। করে কি এখন শিবানী! কারণ হিসাবে সে কি বলবে মমতাময়ীকে? ধরা পড়ে গেছে যে!

—কি রে মা চোখে জল কেন? কি হ'য়েছে।

মাথা নাড়ে শিবানী, কথা সরে না মুখে। একটা বোবা অনুভূতি যেন কণ্ঠ অবধি ওর সব উঠে কথা আটকে ধরে।

—লক্ষ্মী মা আমার, যে জন্য তোর চোখে জল, এই হঠাৎ কান্না, আমায় বল?

কি জবাব দেবে শিবানী? মনের সব হাহাকার কি বাইরে প্রকাশ করা যায়? তার ছোট্ট মনের পরিধিতে এ ক'দিন ধরেই ত' সমানে চলেছে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের ঝড়। তা' কি বলা যায় কাউকে, সে সব যে তারই একান্ত কথা। শিবানী মনে মনে ভাবে সে বলবে—এমনিই। কিন্তু বলতে গিয়ে ভাবাবেগে কিছুই বলতে পারে না। ঠোঁট দুটো শুধু কাঁপে বারকয়। চোখ টল্‌টল্‌ ক'রে ক'ফোঁটা জল রূপোলী রেখা হয়ে গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে।

মমতাময়ী ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে ওর কাছটিতে এসে সেটা নামিয়ে সান্ত্বনার স্বরে বলেন;

—আমায় বল মা, কি হয়েছে।

শিবানী যেন প্রাণপণে তার অন্তরের উদ্বেল উচ্ছ্বাসকে সংযত

করবার চেষ্টা করে। তারপর ভেজা কণ্ঠে বলে সেই দুঃস্বপ্নটার কথা—শুভ্রেন্দুর ধড়হীন মাথাটা মা কালীর হাতের নৃমুণ্ডের মত কালো আঁধারে ভাসছে। শুনে আঁতকে ওঠেন মমতাময়ী। ভীষিত কণ্ঠে বলেন :

—না-না-না, এ হ'তে পারে না, হতে দিতে পারি না আমরা। ওযে আমার একটি মাত্র অমাবস্যার সলতে রে মা।

কথা শেষ ক'রে ঝরঝর ক'রে মমতাময়ী কেঁদে ফেলেন। কথা ত নয় জননী হৃদয়ের হাহাকার যেন।

এবার শিবানীর পালা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার। কিন্তু তার আগেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়া মমতাময়ী উঠে পড়েন। রুদিত কণ্ঠে বলেন :

—ওগো শুনছো, শিবী কি বিশ্রী স্বপ্ন……

ব্যাপারটা নিয়ে একটা হৈ চৈ হোয়ে, কথাটা পাঁচ কান হোক এ কিছুতেই চায় না শিবানী। একটা দুর্বল মুহূর্তে মমতাময়ীকে মনের কথাটা বলে ফেলে সে ভুল করেছে। এর যে এমন একটা reaction হবে তা ও ভাবতে পারেনি। অনুশোচনায় ভরে যায় ওর মন। এ প্রসঙ্গ নিয়ে বাড়াবাড়ি একটা কিছু হ'বার আগে সে সেটা প্রতিহত করতে চায়। তাই সে মুহূর্তে দৃপ্তা হ'য়ে ওঠে, হ'য়ে ওঠে উজ্জ্বলিতা। ত্বরিৎ দাঁড়িয়ে উঠে ও দু' পা এগিয়ে মমতাময়ীর হাত ধরে ঝাকানি দিয়ে কঠিন স্বরেই বলে :

সে অস্বাভাবিক স্বর শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় মমতাময়ীর কান্না। ঘুরে দাঁড়ান তিনি।

—তুই বুঝিস না মা, ও যে আমার সারা জীবনের সাধনা।

—বুঝি জ্যেঠিমা, কিন্তু বুঝিনে সামান্য স্বপ্নটা নিয়ে অমন হৈ চৈ করার কারণ। তা ছাড়া তুমিই বলেছ একদিন—খারাপ স্বপ্ন পাঁচ কান হওয়া ভাল নয়।

—কিন্তু ও যে আমাদের—

—ও কি শুধু তোমাদেরই জ্যেঠিমা, আমার কেউ নয়, কিছু নয় ?

—বুঝেছি রে মা, কিন্তু তবু যে আমার মাথাটা ঘুরছে, মনটা উথাল পাতাল করছে। শিবী, মা, আমায় ধর ধর—

দু'হাত বাড়িয়ে মমতাময়ীকে বুকে টেনে নেয় শিবানী। শিশুর মত উচ্ছ্বসিত কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে থাকেন তিনি। শিবানীর চোখ দিয়েও গড়াতে থাকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল।

তুমি বোধ হয় জান না পণ্ডিত নেহ্‌রু একটা প্রবাদের কথা। সে প্রবাদটা হ'ল, এই স্বাতি নক্ষত্রের অশ্রুজল কোন শুক্তির ওপর ঝরে পড়লেই নাকি সেই জলবিন্দু রূপান্তরিত হয় মহামূল্য মুক্তোয়। যা মণিজগতের উজ্জ্বল রত্ন। মানুষের চোখের জলের ফোঁটাকে তাই কবিরা মুক্তোর সঙ্গে তুলনা করে। আসাম সরকারের চাকুরিয়া কোন এম-বি-বি-এস ডাক্তারের বোন সাত মাসের শিশু সন্তানসহ বিপদসঙ্কুল গভীর জঙ্গলে গিয়ে গুণ্ডাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে আশ্রয় নিয়েছিল; আশ্রয় পেয়েছিল সভ্য মানুষ আমরা অসভ্য বর্বর বলি যাদের সেই উপজাতীয়দের কুটিরে। তারপর ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে এসে সেই ভদ্রমহিলা শিলংয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ দিয়ে বলেছিল, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহ্‌রুর সহিত শিলংয়ে গত ১৮ই জুলাই দেখা করি। তিনি আমার ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা ও অত্যাচারিত মেয়েদের অবস্থা দেখিয়া চোখের জল ফেলিতে থাকেন। পণ্ডিত নেহ্‌রু, ভদ্রমহিলা যাকে বলেছে চোখের জল—আমি তাকে বলছি মুক্তো। মানুষের প্রতি করুণা, প্রীতি, সহানুভূতি জানাতে ব্যথিত মানুষের চোখে যে জল ঝরে সে শুধু জল নয়, মুক্তো। সেদিন যে নেহ্‌রুর চোখে ঐ মুক্তো ঝরেছিল, সে হয়তো মানুষ নেহ্‌রু, কিন্তু সেই নেহ্‌রুই দিল্লীতে ফিরে গেলে, রাজধানীর জলহাওয়া গায়ে লাগামাত্র হয়ে গেল পলিটিশিয়ান নেহ্‌রু। ফলে আসামের বর্বরতার, বীভৎসতার দুরপনেয় কলঙ্কের যারা নাটের গুরু তাদের

বিরুদ্ধে সেই নেহ্‌রুই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোন বিবৃতি দিতে পারল না।

শিলংয়ের নেহ্‌রুকেই বোধ হয় একদা দেখেছিলেন বাপুজী, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাই বোধ হয় বলেছিলেন, 'এ জওহর খাঁটী জওহর।' কিন্তু আজকের সখাদ পলিটিশিয়ান নেহ্‌রুকে তিনি দেখেননি। বেঁচে থাকলে এ নেহ্‌রুকে তিনি চিনতেন না। তাই বলি ভুলের মাশুল গুণতে গুণতে মানুষ নেহ্‌রুর বুঝি অপমৃত্যু হচ্ছে দিনের পর দিন।

মানুষ নেহ্‌রু বলেছিল 'কালোজারীদের ধরে ধরে ল্যাম্প পোষ্টে ঝুলিয়ে গুলি করা উচিত।" আর পলিটিশিয়ান নেহ্‌রুর রাজত্বে ব্ল্যাক মার্কেটিয়াররা অবাধে সমাজের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই বলি নেহ্‌রু, পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে তুমি যখন দেশময় ভূত দেখছ—দেখে আঁতকে উঠছ, তখন কেন ভেবে দেখছ না আজকের এই ভূতগুলো তোমার রাজত্বেই বংশবৃদ্ধি করে গায়ে-গতরে বড় হয়ে উঠেছে, উঠছে, উঠবে। উনিশ শ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ সালে এই ভূতেরাও মানুষই ছিল নেহ্‌রু। তাই আবারও বলি, নেহ্‌রু তুমি ভুল করছ, ভুল করছে তোমার ক্যাবিনেট।

পরন্ত বেলা পশ্চিম আকাশে তখন বিদায় গোধূলিতে ম্লান। প্রকৃতির প্রান্তে প্রান্তে যত আলো ছিল, যত জৌলুষ ছিল সবই কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবে অপর গোলার্দ্ধে। এ গোলার্দ্ধে নেমে আসবে সন্ধ্যার আবছায়া ; তারপর কালো কুটিল রাত্রি।

বেলা যতই গড়িয়ে যাচ্ছিল, শিবানীর মনের মধ্যে ততই একটা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের ছায়া পড়ছিল। মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেকে বারবার করছিল তিরস্কার। কিন্তু বিবেক তাকে মাঝে মাঝে যেন সমর্থন করছিল না। কেননা শিবানী যদি এই দুঃসাহস না দেখাতো তবে কানাই কাকতি নিশ্চয়ই শুভ্রেন্দুর শেষ পরোয়ানা

সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে যেত। আর সে সিদ্ধান্ত থেকে কানাইকে নিরস্ত করা সম্ভব হত না তার পক্ষে।

অবশেষে সন্ধ্যা নামে। ঘন কালো তমিস্রায় ডুবে গেল প্রকৃতি। শিবানী শুভ্রেন্দুর জ্বর দেখে, তাকে ওষুধ খাইয়ে চলে এলো নিজের ঘরে। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে স্যুটকেশের ডালাটা খুলল। চোখের ওপরে ভেসে উঠল ইস্পাতের তৈরী সেই নির্মম অস্ত্রটা। বুকের মধ্যে যেন যন্ত্রণার সাইরেন চেঁচিয়ে উঠল তীব্র স্বরে। কুণ্ঠিত হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিল হাতে। তারপর শাড়ির আড়ালে দ্রুত হাতটা লুকিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে নেমে.পড়ল উঠানে। পরক্ষণেই একটি ছায়ামূর্তি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল। জোনাকী জ্বলা গ্রাম্য পথে নদী তীরের দিকে হন-হন করে এগিয়ে চলল সে।

নির্দিষ্ট সেই শিমূল গাছটার কাছে যত এগিয়ে আসতে লাগল শিবানী ততই ওর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটো অতি দ্রুত দাপাদাপি করতে লাগল। এখানে ওখানে ঝিঁঝিঁগুলো একটানা শব্দ করে যাচ্ছে, জোনাকীগুলো তাদের স্বল্পজ্বলা আলোয় অন্ধকারকে আরও বেশী কুৎসিত করে তুলছিল। নির্দিষ্ট গাছটার আড়ালে এসে অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল কানাই কাকতি। মনে মনে ওর একটা জয়ের ভাব কাল রাত থেকে সঞ্জীবনীর মত ক্রিয়া ক'রে চলেছে। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে ও ভাবছিল যে খুব চরম একটা মুহূর্তে ওর কাছে ওকে সারাজীবন ধরে হারিয়ে দেওয়া শুভ্রেন্দু হেরে যেতে স্বরু করেছে। আর শিবানী যখন এতটা এগিয়ে এসেছে তখন তার মনেও নিশ্চয়ই বাঙ্গালী বিদ্বেষ চাগিয়ে উঠেছে। নইলে শুভ্রেন্দুর এতবড় অকল্যাণ সে কিছুতেই হ'তে দিত না।

কানাই তার আঁধার-সওয়া চোখে লক্ষ্য করছিল সায়ুধ শিবানীর ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে অন্ধকারের বুক চিরে। হ্যাঁ, ঐ ত এগিয়ে এসে এদিকে ওদিকে চেয়ে বুঝি তারই অস্তিত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা

করছে শিবানী। গলা খাকারি দিল কানাই। তা শোনামাত্র শিবানীর গা-টা ছম্‌ছম্ ক'রে উঠল। কানাই এগিয়ে এলো শিবানীর কাছে। আশ্বস্ত স্বরে বলল :

—তুমি এসেছ!

—হ্যাঁ এসেছি।

শ্লেষ মিশিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে নিজেকে মুহূর্তে সামলে নিল শিবানী।

—কই, মালটা বের কর?

মাল অর্থে যে কানাই রিভালভারকে বোঝাচ্ছে তা বুঝল শিবানী। শাড়ির আড়াল থেকে রিভালভার শুদ্ধ ডান হাতটা বের করল ও। সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছেই একটা শিয়াল হুক্কা-হুয়া-ক্কা-ক্কা-ক্কা স্বরে বিশ্রীভাবে ডেকে উঠল! শিবানীর শিরায় শিরায় আবার সেই হিঃ হিঃ করা ঝাকানি। উদ্বেজক মুহূর্তগুলোকে ওর মিনিট বলে মনে হয়।

কানাই রিভালভারটা চেয়ে নেয় শিবানীর হাত থেকে। তারপর ওর চোখের কাছে তুলে ধরে অস্ত্রটা। শিবানীকে বোঝাতে থাকে কোনটাকে ট্রিগার বলে, কিভাবে আঙ্গুল শক্ত করে ট্রিগার টানতে হয়, আর ঠিক যখন ট্রিগার টানতে যাবে তখনই যন্ত্রটা উপরে তুলে পেছন থেকে সামনে কি কৌশলে ঝাকানি দিতে হয়।

শেখানোর সুযোগে কানাই শিবানীর আরও গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। ওর মনটা ছিঃ ছিঃ করে ওঠে। কানাইয়ের কলুষ স্পর্শে কুণ্ঠিত হয়, দারুণ অস্বস্তি অনুভব করে শিবানী। যতটা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে না এলেও চলত তার চেয়েও যে বেশী ঘনিষ্ঠ হ'বার সুযোগ নিচ্ছে কানাই সেটা বোঝে ক্লিশ্যমান শিবানী। কিন্তু সে নিরুপায়। ইচ্ছা করেই নাচতে নেমেছে সে, ঘোমটা টেনে এখন আর আব্রু বাঁচাবার চেষ্টা করা বৃথা। অনুশোচনায় ভরে যায় ওর মন। কানাই শিবানীর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওর ডান বোগলের নীচ দিয়ে তার সবল

বাহুটা বাড়িয়ে ওর ডান হাত সহ রিভলভারটা ধরে কি ভাবে ঝাকানি দিয়ে ট্রিগার টিপতে হবে দেখিয়ে দেয়। এরপর হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে ঃ

—হ্যাঁ এবারে ছোঁড় দেখি।

—আমার ভয় করছে।

শিবানী ভয়ের ভাণ করে বলে। কিন্তু মনে ওর তখন অন্য চিন্তা। তাক সে ঠিকই করবে। তার মনের দৃঢ়তা তাকে ঠিকমত তাক করিয়ে দেবে। ও তখন ভাবছিল আগ্নেয়াস্ত্রর প্রথম প্রয়োগ সে অস্ত্রগুরুর ওপর করবে না কি! দেবে নাকি সমুচিত গুরুদক্ষিণা? কিন্তু না, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। কানাইয়ের সাঙ্গোপাঙ্গোরা ভাববে যে বাঙ্গালীদেরই কেউ খুন করেছে কানাইকে। ফলে তারা আরও ভয়ঙ্করভাবে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে উদ্রিক্ত।

—হ্যাঁ ছোঁড়?

শিবানীকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কানাই সাহস দিয়ে বলে ঃ

—ভয় কি? ছোঁড়।

—হ্যাঁ ছুঁড়ছি।

বলে হাতে ও মনে প্রস্তুত হয় শিবানী। তারপর মনের সকল দৃঢ়তা ডান হাতটায় নিবদ্ধ করে ঝাঁকি মেরে ট্রিগার টেপে। গুলির শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় সেই শান্ত নিস্তব্ধ নির্জন নদীতীর ও বনদেশে। সঙ্গে সঙ্গে 'কা-কা' করে শিশু গাছের এক ঝাঁক কাক ও শিরিষ গাছের বক-পরিবারগুলি কুলায় ছেড়ে ভয়ার্ত চিৎকারে আকাশে উঠে উদ্দেশ্যহীনভাবে উড়তে থাকে। ঘোর লাগা ঘুম ভাঙা দু'চারটে বিহ্বল পাখী ধপ্ ধপ্ শব্দে পড়েও যায় শিবানীদের আশে পাশে। দেখতে দেখতে শান্ত নদীতীর অশান্ত হ'য়ে ওঠে পাখীদের ভীতকণ্ঠের কলরবে।

—বাঃ চমৎকার !

বলে অনাবশ্যকই কানাই শিবানীর পিঠ চাপড়ে দেয়।

—সত্যি শিবানী, তুমি আমাদের এ গ্রামের গর্ব। শুধু গ্রামের কেন সারা আসামেরই গর্ব। এসো ঐ গুড়িটায় বসি একটু, তোমার রিভালভার আবার লোড ক'রে দিই।

শুনে কুণ্ঠিত হয় শিবানী। ঐ গুড়িতেই না সে ও তার নারী-জীবনের অন্নপ্রাণনকারী শুভ্রেন্দু কত সন্ধ্যা বসে কাটিয়েছে। এখানে বসেই না তার মনে উৎকীর্ণ হয়েছে শুভ্রেন্দুর মূর্তি। আর সেই গুড়িতেই ওর পাশে বসবে আজ কানাই কাকতি? ছিঃ! কিন্তু উপায় ছিল না, যতদূর এগিয়েছে আর পিছু হটবার উপায় নেই ওর। বাধ্য হ'য়ে কানাইয়ের পাশে গিয়ে বসে কুণ্ঠিত শিবানী। অস্ত্রটা তার হাতে তুলে দেয় কানাই সেটাতে গুলি ভরতে ভরতে আপন মনে বলে ঃ

—আমি জানতাম, একদিন তোমার ভুল ভাঙ্গবে। বঙ্গালীরা কত নীচ, কত ছোট, একদিন বুঝতে পারবে। আর সেদিন তুমি আমার পাশে এসে ঠিক এই ভাবে দাঁড়াবে।

শিবানী চুপচাপ শুনে যায়। শুনতে শুনতে কান দুটো রী-রী করে ওঠে। তবু কোন কথা বলে না। মনে মনে ভাবে, কানাই কাকতি কি মনে করেছে তাকে ?

—এই নাও, পুরো লোড করে দিলাম রিভালভার।

শিবানী হাত বাড়িয়ে অস্ত্রটা হাতে তুলে নেয়। কানাই মুহূর্তে গলার স্বর পরিবর্তিত করে দাঁতে দাঁত চেপে আবার বলে ঃ

—আজ রাতেই তবে শুভ্রকে······

—না না, আমি পারব না ! আমি পারব না কানাইদা !

আর্তনাদ করে ওঠে উপহত শিবানী। আর্তনাদ ক'রে ওঠে যেন ওর সারা দেহ-মন। পরক্ষণেই শিবানী যেন হায় হায় ক'রে ওঠে নিজের কথা শুনে নিজেই। এ সে কি করল !

—ওঃ, তা হ'লে কাল থেকে কি আমার সঙ্গে অভিনয় করছিলে ?

ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রূর কুটিল ভাঙ্গতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে কানাই কাকতি।

—না না, কানাইদা, আমায় ভুল বুঝো না। কথা আমি রাখবো—এই ব্রহ্মপুত্রের ধারে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলছি শুভ্রদাকে এ গ্রাম থেকে, তোমার নাগাল থেকে চিরতরে সরিয়ে দেবই। কিন্তু আজ নয়। আমার দিকটা ভেবে দেখ, এই ঘৃণিত কাজের পর কি করে মুখ দেখাবো জ্যেঠিমাকে, জ্যাঠামণিকে ?

কান্নার আবেগ চাপতে চাপতে বলে শিবানী। কণ্ঠে অনুনয় ঝরে।

—বেশ, এখানে না থাকতে চাও, যেখানে বলবে সেখানেই নিয়ে যাব তোমায়—যাতে ওদের কাছে তুমি লজ্জায় না পড়। তা ছাড়া এতে লজ্জার কি আছে ? বরং এ গৌরবের, এ যে অসমীয়া মেয়ের পবিত্র কর্তব্য।

কানাইয়ের একথা শুনে আবেগকণ্ঠে শিবানী বলে ঃ

—তুমি পারবে কানাইদা আমায় এখান থেকে, এ গ্রাম থেকে অনেক অনেক দূরে নিয়ে যেতে ! যেখানে আমায় কেউ চিনবে না —কেউ আমার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলবে না—দেখ, ঐ সেই সর্বনাশী মেয়ে যে ওর শিক্ষা দীক্ষার জন্য দায়ী মানুষটাকে খুন করেছে —যে কিনা ওকে সত্যিই একদিন ভালবেসেছিল !

শিবানীর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে কানাই গভীর স্বরে বলে ঃ

—তোমার জন্য আমি সব করতে পারি শিবানী। বিশ্বাস কর আমায়, তোমারই জন্য প্রয়োজন হলে ত্যাগ করতে পারি আমার বাড়ী, ব্যবসা, মা, আত্মীয়, স্বজন সব।

—মিথ্যে কথা !

অবিশ্বাসের স্বরে বলে শিবানী।

—তোমার হাত হাতে নিয়ে বলছি, তবু বিশ্বাস করবে না?

আন্তরিকতাভরা কণ্ঠে বলে কানাই।

—আমি সঙ্গে থাকলে জলে ডুবে মরতে পারবে, পারবে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে?

—পারবো।

—এমন কথা শুভ্রদাও বলেছিল—কিন্তু আমি জানি ওগুলো কথার কথা, কোন পুরুষই পারে না।

—উঃ, শিবানী তুমি ভুল করছ, শুভ্র বঙ্গাল, শুভ্র বিদেশী, আমি তোমার দেশের ছেলে—ও কথা না রাখতে পারে কিন্তু আমি রাখবো। টাকার আমার অভাব নেই। এত টাকা আমার আছে যে তোমার সারা গা সোনায় মুড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু পড়াশুনায় শুভ্রর সঙ্গে আমি কোনদিন পেরে উঠিনি। তাই যা কিছু আমি চেয়েছি—খ্যাতি, যশ, এমন কি সেই ফ্রকপরা অবস্থা থেকে যে তোমাকে মনে মনে চেয়ে এসেছি—সেই তোমাকেও ও ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাই আজ তুমি যখন আমার হতে যাচ্ছ, তখন তার জন্য যে কোন মূল্য আমি দিতে প্রস্তুত।

শুনে খিলখিল করে হেসে ওঠে শিবানী। এ বুঝি কোন রহস্যময়ীর হাসি, এ হাসি যেন শিবানীর নয়! এখন কানাই বুঝি তার কাছে ক্রীড়নীয় আর সে ক্রীড়ক বলে:

—তুমি যে কতবড় কথা বলছ কানাইদা' তা তুমি নিজেই জান না। সামান্য একটা মেয়ের জন্য কোন মানুষের সবকিছু ছাড়া সম্ভব?

—অন্য কোন মানুষের সম্ভব না হলেও কানাই কাকতির পক্ষে সম্ভব। বিশ্বাস না হয় প্রমাণ নাও। তুমি যে আমার কাছে সামান্যা নও, অসামান্যা।

—খুব ভাল করে ভেবে দেখ কানাইদা'। তোমার বুড়ি মা, বিষয় আশয়, ব্যবসা—সব ছেড়ে চলে যাওয়া……

শিবানী যেন সংসার অনভিজ্ঞ শিশুর সঙ্গে কথা কইছে।

—আমি ভেবে দেখেছি শিবানী—যে মা দু'দিন পরে মরে যাবেই—সে দু'দিন আগে মরলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। তা' ছাড়া মরবেই বা কেন। যে সব বুড়ো-বুড়ির-সন্তান-সন্ততি নেই তারা কি সব মরে গেছে ?

শুনে শিউরে ওঠে শিবানী। কি নিষ্ঠুর সন্তান! এই সন্তানকে নিয়েই কানাইয়ের মা মিনিবালার কত না গর্ব। মিনিবালার জন্য সমবেদনায় ওর মন ভরে যায়। কিন্তু অপচয় করার সময় ত' নেই তার হাতে। কথার পিঠে কথা বলতে হবে যে তাকে নইলে সন্দিগ্ধ কানাই নির্মম মতলবে শুভ্রেন্দুর জীবন প্রদীপের তেল দেবে উল্টে। তাই সে বলে ঃ

—তা' হ'লে কালই আমরা বেরিয়ে পড়ব কানাইদা। আর এখান থেকেই আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা স্বরু হবে। বেশ মজবুত করে একটা কলা গাছের ভেলা তৈরী করে এই ঘাটে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা করবে সন্ধ্যা রাতে। আর আমি রাত চারটের আগেই তোমার শত্রু, চিরশত্রু শুভ্রেন্দুকে খুন করে……

বুকে যেন একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে শিবানী, তাই কথাটা শেষ করতে পারে না। যেন হঠাৎ একটা চাগিয়ে ওঠা কালিক পেন।

—বল, থামলে কেন ?

কানাইয়ের আকুল জিজ্ঞাসা।

বাকি না বলা কথা গলায় ডেলা পাকিয়ে আসে যেন। ঢোক গিলে কোন ক্রমে শিবানী বলে ঃ

—হ্যাঁ, পালিয়ে আসব এখানে। দু'জনে সেই ভেলায় চেপে নিরুদ্দেশ যাত্রা করব। আর কোন লোক আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলতে পারবে না যে আমি আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে

অভিলষিত শুভ্রেন্দুকে, যে আমায় ভালবাসে, তাকে খুন করেছি কুটিল কানাই কাকতির পরামর্শে।

—কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের বুকে এখন ভেলায় চড়ে নিরাপদে ভেসে যাওয়া কি সম্ভব ?

—কেন নয় ? প্রয়োজন হলে পর পর পাঁচটা করে তিন সারিতে পনরটা কলাগাছ গেঁথে ভেলা তৈরী করবে। আর তাতেও যদি অজানা কোন দেশের তীর না পেতে তরী ডোবে—তবে সে মরণকে আমি ভয় করিনে—আর আশা করি তুমিও করনা কানাইদা, কেননা আমার জন্য প্রাণ দিতে পার—তুমিই ত' বললে একটু আগে।

—ওঃ এতদিনে আমার মনের সব আশা সফল হ'ল ! শিবানী তুমি সুন্দর, তুমি অদ্ভুত—কি চমৎকার বুদ্ধি তোমার।

বলতে বলতে কানাই হঠাৎ শিবানীকে সতর্ক হ'বার সুযোগ না দিয়ে দুহাতে জাপ্টে ধ'রে বুকে টেনে নেয়। শিবানী অনুভবে বুঝতে পারে কানাই কাকতির সিগারেট খাওয়া ভোটকা গন্ধের কালো পুরু ঠোঁটদুটো তার সরু পাতলা লাল ঠোঁটে এসে সজোরে লেপ্টে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী একটা জ্বলুনিতে যেন পুড়ে যেতে থাকে ওর ঠোঁট। জোর ক'রে কোনক্রমে নিজেকে কানাইয়ের বাহুমুক্ত করে উঠে পড়ে ও। বলে :

—তবে ঠিক ঐ কথাই রইলো—কাল ঠিক রাত চারটেয়। আর সন্ধ্যার মধ্যেই ভেলা তৈরী করে রাখবে। কাক পক্ষীতেও যেন টের না পায় এ কথা। তবেই সব পণ্ড।

—বঙ্গাল শুভ্রেন্দুর হতে পারে, কানাই কাকতির কথার নড়চড় হয় না।

কানাইয়ের এ কথা শেষ হতে না হতেই শিবানী দ্রুত পায়ে অন্ধকারে মিশে যায়। ওর ঠোঁট দু'টো তখন যেন জ্বলে যাচ্ছে। মনের সবটুকু রুচি যেন ঘিনঘিন করছে। নিজেকে যেন অশুচি

মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে নরকের পোকাগুলো বুঝি বুকে হেঁটে কিলবিলিয়ে বেড়াচ্ছে তার ঠোঁটের ওপর। দ্রুত পায়ে পথ চলে শিবানী ঃ

বাড়ী ফিরে প্রথমেই সন্তর্পণে ঢোকে ও নিজের ঘরে। সুটকেশের ডালা খুলে তাতে রিভালভারটা রেখে দেয়। তৎক্ষণাৎ দ্রুত হাতে তাক থেকে সাবানটা নিয়ে কূয়ো-তলায় যায়। বেশ ভাল করে মুখে সাবান ঘষে। একবার, দু'বার, তিনবার। এতক্ষণে যেন সেই জ্বলুনিটা কমেছে মনে হয়।

রুণীবালা মেয়ের সাড়া পেয়ে রান্নাশাল থেকে বেরিয়ে এসে বলেন ঃ

—কি রে, শুভ্রেন্দুর জ্বর কেমন দেখলি ?

—এখনও দেখি নি। এইবার গিয়ে দেখবো।

—ওমা, এতক্ষণ তবে ছিলি কোথায় ?

—মাকনীদের বাড়ী গিয়েছিলাম মা। ও শ্বশুর বাড়ী থেকে আজই এসেছে, তাই সেখানকার যত গল্প।

মিথ্যে করে বলে শিবানী। অবশ্য দুপুরের দিকে সে গিয়েছিল বান্ধবী মাকনীদের বাড়ী। রুণীবালা রান্নাশালে ঢুকলে শিবানী বারান্দায় সোপকেসটা রেখে তার পেছু পেছু এগিয়ে যায়। মনে পড়ে যায় ওর কানাইয়ের নির্মম কথাটা তার মা সম্পর্কে। বড় ঘনিষ্ঠ হতে ইচ্ছা করে মায়ের সঙ্গে। কত কষ্ট করে মানুষ করেছে ওকে তিনি।

ঢেকে রাখা একটা ব্যঞ্জন থেকে একটু আঙ্গুলে তুলে নিয়ে শিবানী জিভে ফেলে দেয় সেই ছোট্টটির মত ঃ

—কি সুন্দর হয়েছে না মা, আঃ।

মেয়ের ধরণ দেখে হেসে ফেলেন রুণীবালা। বলেন ঃ

—সুন্দর হয়েছে ত' আর একটু খানা।

—সবটা খাবো ?

—খাবিনে কেন যদি খেতে পারিস ? তোর বাপ ত আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে, এর স্বাদ কি কিছু বুঝবে ?

—আচ্ছা মা, ধর আমি যদি মরে যাই বা কোথাও হারিয়ে যাই, তুমি কাঁদবে ?

এ কথা শোনামাত্র রুণীবালার হাত থেকে খুন্তিটা কড়াতে পড়ে যায় সশব্দে। উদ্বেগকণ্ঠে বলেন ঃ

—ও কি অলুক্ষুণে কথা ?

মেয়ের একটা হাত ত্বরিৎ টেনে নিয়ে কড়ে আঙ্গুলটা দাঁতে কেটে তার অকল্যাণ দূর করেন । আবার বলেন ঃ

—ও কথা বলতে নেই।

রুণীবালার কাণ্ড দেখে হাসি পায় শিবানীর। সংস্কারের নিগড়ে কিভাবে বাঁধা এরা ! গৌহাটী থেকে আসতে তার দেহ ও মনের ওপর যে নিষ্ঠুর নিপীড়ন চলেছিল তার বিবরণ শুনলে বোধ হয় মা, জ্যেঠিমা সাতদিন সাত রাত কেঁদে ভাসাতো।

—আচ্ছা মা, সীতা বড় না সাবিত্রী বড় ?

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে শিবানী।

—আত্মীয় পরিজন, সুখ সম্পদ ছেড়ে সীতা স্বামীর হাত ধরে গিয়েছিল বনবাসে আর সাবিত্রী যম রাজের কাছ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। ওরা হল সতী, ওদের কি আমরা ছোট বড় বুঝি মা ?

বলতে বলতে সেই কোন্ অতীত যুগের দুই মহিয়সী মহিলার উদ্দেশ্যে বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের বৃদ্ধা রমণী রুণীবালা দু'টি প্রণাম নিবেদন করেন।

শিবানী তার যুক্তিবাদী মনে ভেবে দেখল যে মেয়েদের মহিয়সী হতে হলে স্বামী অনুসঙ্গ অবধারিত। অন্ততঃ ভারতীয় মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বুঝি চিরসত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। নইলে সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা কোন্ যুগে ছিল কি ছিল না অথচ তাদের কথা

ওর মায়ের মত অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলাও কী শ্রদ্ধায়ই না স্মরণে রেখেছেন। অতীত যুগ থেকে পুঁথি পুরাণেও এমন কোন মহিলার সুখ্যাতি বা সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পায়নি যে কিনা স্বামী অনুগামিনী না হয়েও সংসারের অন্যত্র তার জীবন উৎসর্গ করে হয়েছে বরেণ্যা। আশ্চর্য্য! বোধ হয় সমাজকে একটা বেষ্টনীর মধ্যে, একটা স্বার্থগোষ্ঠির মধ্যে আবদ্ধ রাখবার জন্য এর প্রয়োজন বুঝেছিলেন আমাদের পূর্ব পুরুষরা।

কিন্তু এ যুগেও কি পুরুষের কল্যাণ কামনা করার প্রয়োজন নারীর দিক থেকে ফুরিয়েছে? প্রশ্নটা আপনা হতেই ভেসে ওঠে শিবানীর মনে। ওর মন বলে, ফুরোয়নি। কেননা নারী হল সমাজ ও সংসারের ধাত্রী—ওরা প্রকৃতির প্রতিরূপ।

নারী যদি বারমুখো হয় পুরুষের কল্যাণ কামনা না করে, তার কর্ম ও মর্মসঙ্গিনী না হয়, তবে সে সংসার সুখের হতে পারে না। এ যুগের আলোকপ্রাপ্তা মেয়েরা নারী স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যা করে বলে বহুক্ষেত্রেই দীর্ঘশ্বাসকে সঙ্গী করে বাকী জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।

এলোমেলো কত কথাই না ভাবে শিবানী। ভাবতে ভাবতে এক সময় রুণীবালাকে বলে :

—আমার কিন্তু বেহুলাকে বেশ লাগে মা। কেমন মৃত স্বামীর সঙ্গিনী হ'য়ে অনির্দেশের পথে পা বাড়ালো। কি মনোবল, কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা, কি গভীর পতি-প্রেম!

—নে, ও সব কথা রাখ ত এখন। বেশ রাত হয়ে গেল। ছুটে গিয়ে শুভ্রর জ্বরটা দেখে আয়।

মায়ের কথায় শিবানী 'এই যাই' বলে উঠে পড়ে উঠোনে নেমে খিড়কির পথে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ঘাসের চটি পায়ে নিঃশব্দে শুভ্রেন্দুদের বাড়ীর উঠোন পেরিয়ে শিবানী নবেন্দুশেখরের ঘরের সামনেকার বারান্দায় গিয়ে উঠল।

জানালা দিয়ে দেখলো ভাগবতগীতা সামনে খুলে নিয়ে বসা জ্যাঠামণির অদূরে খাট ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জ্যেঠিমা। মমতাময়ী তখন বলছেন ঃ

—একটা কথা শুনবে ?

—আহা, পাঠের সময় আবার সাংসারিক কথা কেন ?

নবেন্দুশেখরের স্বরে বিরক্তি।

—না, মানে—রান্না করতে করতে কথাটা এইমাত্র মনে পড়ল কিনা, তাই চলে এলাম।

—বলে ফেল ঝটপট।

—বলছিলাম কি শুভ্র-শিবীর বিয়েটা এবার সেরে ফেল না।

—সারা-সারির আর কি আছে, ধর না কেন ওদের বিয়ে হয়েই গেছে।

—সে ত তুমি আমি জানি, তবু সামাজিক অনুষ্ঠান ত একটা করতে হয়।

—ও এক দিন ক'রে ফেললেই হবে। তবে শিবীর ফাইনালটা অবধি অপেক্ষা করা উচিত নয় কি ? বোঝই ত' বিয়ের পর কি আর মন দিয়ে পড়াশুনা করা চলবে ?

—কেন চলবে না, শুনি ?

—নাঃ, তুমি দেখি সব একেবারে ভুলেই গেলে। আমাদের যখন বিয়ে হল, তারপর মন দিয়ে পড়শুনা করতে পারতাম আমি ?

—পারতে না ?

পঁচিশ বছর আগেকার মত কৌতুক কণ্ঠে শুধান মমতাময়ী।

—পারব কি করে, সব সময় মন উড়ু উড়ু, কখন কোন্ ফাঁকে দেখবো তোমায়, একান্তে কাছে পাব, পাশ দিয়ে চলে যাবার সময়, ছায়া মাড়াবো বা লাগবে একটু ছোঁয়া।

—ইস্, বুড়ো বয়সে ভিমরতী। যাই বল না কেন ওটা সেরে ফেল এবার। যা হানাহানি কাটাকাটি চল্‌ছে—বল্‌তে নেই—কাগজ

কলমে যা দেখছি, এই আছি এই নেই। তখন আমাদের প্রতিশ্রুতির কথা যদি কোন পক্ষ না রাখে তবে পাতক হতে হবে যে। আহা, মেয়েটা আমার শুভ্র বলতে অজ্ঞান।

—তা বটে, প্রতিমার মত মেয়ে। এ যুগে এমন মেয়ে হয় না।

—যাক, যা হয় ভেবে চিন্তে স্থির ক'রে ফেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনতে শুনতে শিবানীর কানদুটো রাঙা হ'য়ে ওঠে। মননিভৃতে একটা ভাল লাগার হাওয়া দোল দিয়ে যায়। ভাবে, মমতাময়ী বেরিয়ে ওকে এখানে দেখলে লজ্জার অবধি থাকবে না। তাই ও চুপিসারে এগিয়ে গিয়ে ঢোকে রান্নাশালে। উনানে তখন চাপানো ব্যঞ্জন প্রায় লেগে ধরার অবস্থা। হঠাৎ জাগ্রত কর্তব্যবোধে অন্যমনস্ক শিবানী ত্বরিৎ কড়ার কানদুটো ধরে নামাতে গিয়ে 'উঃ মাগো' বলে আর্তনাদ করে ওঠে।

একটু পর ত্রস্তে ঘরে ঢুকে মমতাময়ী বলেন :

—কি হল? খালি হাতে কড়া ধরে হাতটা পোড়ালি বুঝি! দাঁড়া কি একটা ওষুদ এনেছে শুভ্র, নিয়ে আসি।

কথা শেষ করে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে চলে যান; পরক্ষণেই এসে শিবানীর হাতে অষুধটা ঘষে দেন মমতাময়ী। বলেন :

—তুই আবার হঠাৎ রান্নাশালে এলি কেন?

—না এলে তোমার তরকারির যা হাল হ'ত জ্যেঠিমা!

—হাল ত' হবেই। বুড়ি-থুত্থুড়ি হ'য়ে গেলাম। এবার তোর সংসার তুই বুঝে নিলেই আমরা দু'জনে চোখ বুজতে পারি।

—দেখ, ভাল হবে না কিন্তু।

রাগত কণ্ঠে বলে শিবানী।

—রাগিস আর যাই করিস, তুই রাগলেই কি যম ছেড়ে কথা কইবে রে।

ক্ষীণ হেসে বলতে বলতে মমতাময়ী হেঁসেলে ঢুকে কড়ার তরকারি বাড়তে লেগে যান।'[৭]

—যম ছাড়ুক না ছাড়ুক—তোমার তরকারির কিন্তু আর একটু হ'লেই গন্ধ ছাড়তো।

কথা শেষ করে শিবানী প্রস্থানোদ্যতা হতে মমতাময়ী শুধান :

—চললি কোথায় রে মা ?

—জ্যাঠামণির কাছে। ওর ভাগবত শুনি গে।

—তা' যাচ্ছিস যা, একটু পর এসে কিন্তু শুভ্রর দুধ-সাবুটা নিয়ে যাবি। কেমন ?

ঘাড় কাত্ ক'রে সম্মতি জানিয়ে উঠোন পেরিয়ে চলে যায় শিবানী। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢোকে নবেন্দুশেখরের ঘরে। নবেন্দুশেখর তখন সামনে খোলা গীতার পুণ্যশ্লোকে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন। শিবানী সোজা চলে যায় ঘরের এক দিকে সারি সারি সাজানো তাকের কাছে। অগুছালো তাকগুলো যেন ওর হাতের স্পর্শ পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। শিবানী আপন মনে তাক গুছোতে থাকে।

আজ নয়, আট বছর আগে বালিকা বয়সেই এ কাজটা সে হাতে তুলে নিয়েছে। এক সময় অসাবধানতায় ওর হাত থেকে একটা ছোট শিশি 'ঠুক' করে কাত হ'য়ে পড়ার শব্দ পেয়ে নবেন্দুশেখর চম্‌কে উঠে বলেন :

—হ্যাট্, হ্যাট্, হ্যাট্, কে, কে ওখানে ?

—আমি জ্যাঠামণি !

—ও, মা-জননী। তাই বল ! আমি একমনে পাঠ করছিলাম কিনা তাই ভাবলাম বেড়াল টেড়াল এসে ঢুকলো না ত' আবার।

কথা শেষ ক'রে নিজের বোকামিকে উপহাস করে নিজেই হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠেন। শিবানীও সে হাসির সঙ্গে যোগ দিল। সে হাসি রান্নাশালে মমতাময়ীয় কানে গিয়ে পৌঁছালো, পৌঁছাতো গিয়ে পাশের ঘরে শুভ্রেন্দুরও কানে যদি সে জেগে থাকত।

এ হাসি শুনে মমতাময়ীর মনে হ'ল বহুদিন তিনি স্বামীর

এমন প্রাণখোলা হাসি শোনেননি। হাসি শুনে তাই আস্তে আস্তে চলে এলেন সে হাসি উপভোগ করতে। স্ত্রী ঘরে ঢুকতেই অতি কষ্টে হাসি চাপতে চাপতে নবেন্দুশেখর বলেন :

—জানো, আমি শিবী মাকে বেড়াল ভেবে চম্‌কে উঠেছি !

কথাটা বলেই যতি পড়া হাসিতে আবার গতি জুড়লেন।

—ওমা, তা হাসির কি আছে এতে। না কিরে মা শিবী ?

—না জ্যেঠিমা, মানে, জ্যাঠামণি আপন মনে পড়ছিলেন কিনা তাই অমন ভেবেছেন, আর তাই দারুণ চম্‌কে উঠেছেন।

—তাই বলে পাশের ঘরে রুগী রয়েছে সেকথাটা ভাবতে হবে না ?

—চল জ্যেঠিমা, শুভ্রদার দুধ-সাবু বেড়ে দেবে, রাত অনেক হ'য়ে গেল যে।

বলতে বলতে মমতাময়ীর কাছে এসে তাঁর হাত ধরে রান্না-শালের দিকে এগোয় শিবানী। দরজার চৌকাঠটা পেরুবার সময় মমতাময়ীর অলক্ষ্যে নবেন্দুশেখরের দিকে চেয়ে চোখে চোখে কথা বলেও একটু হেসে নেয়। নবেন্দুশেখরও শিবানীর প্রতি ইসারায় ঘাড় নাড়েন, অর্থাৎ সে যে তাকে মমতাময়ীর হাত থেকে উদ্ধার করল সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন !

দুধ-সাবু নিয়ে কিছুক্ষণ পর শুভ্রেন্দুর ঘরে ঢোকে শিবানী। টেবিলের ওপর বাটিটা রেখে এগিয়ে যায় তার মাথার দিকটায়। মশারীর ভেতর দিয়েই দেখে যে তার চোখের পাতা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ। সন্তর্পণে ও গুটিয়ে ফেলে মশারীর প্রান্তগুলো। হ্যারিকেনের আলো চোখ থেকে আড়াল ক'রে রাখা পুরোণো পোষ্টকার্ডটা তুলে ফেলে। তারপর ঘুমন্ত শুভ্রেন্দুর কাঁধে হাত রেখে নাড়া দিয়ে বলে :

—এই, উঠে পড়। খাবার এনেছি যে।

দু'তিনবার নাড়া দিতে চোখ মেলে শুভ্রেন্দু। হাত দিয়ে হ্যারিকেনের তীব্র আলো আড়াল করে। এটা লক্ষ ক'রে শিবানী সে আলোর প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়ে বলে :

—দুধ-সাবুটুকু খেয়ে নাও।

একথা শোনামাত্র মুখ বিকৃত ক'রে শুভ্রেন্দু বলল :

—বড় লোভনীয় আহার্য্য এনেছ!

—আহা রে, সত্যি কি অন্যায়! কালিয়া নয়, কোর্মা নয়, কবিরাজী কাটলেট নয়, চম্‌চম্ নয়, রসোমালাই নয়, এমন কি কাব্যময় নাম লেডিক্যানিং সাহেবা পর্য্যন্ত নয়, স্রেফ কিনা দুধ-সাবু!

শিবানীর কথা বলার ধরণ দেখে হেসে ফেলে শুভ্রেন্দু। ঠিক এই সুযোগই খুঁজছিল শিবানী। বলে :

—একেবারে লক্ষ্মীমন্ত ছেলের মত খেয়ে নাও ত' এই সামান্য দুধ-সাবুটুকু। যে ছেলে বড় বড় কেতাব হজম করে প্লেস পেয়ে পাশ করে তার কাছে এ টুকু ত কিছুই না।

—দাও, কি দেবে।

বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে বিরক্তি ভরে বাটিটা নিয়ে একচুমুকে খেয়ে নেয় শুভ্রেন্দু। খালি বাটিটা শিবানীর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে রাগত কণ্ঠে বলে :

—যত জ্বালা। অসুখ হলে যেন আর কিছু খাবার নেই।

—রাগ নয় ত' লক্ষ্মী! এইবার চটপট শুয়ে পড়।

শুয়ে পড়ে শুভ্রেন্দু। হ্যারিকেনের আলোর তীব্রতা থেকে সবেজাগা চোখের তারাকে আড়াল করার জন্য চোখ বোজে। মশারীর চাঁদোয়ায় হাত তোলে শিবানী সেটা ফেলতে। কিন্তু ওর মনটা যেন একটা সুন্দর শিহরে শিহরিত হয়। মুদিত আঁখি শুভ্রেন্দুর মুখের দিকে অকারণ অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে লোভ হয় শিবানীর। ইচ্ছে হয় ওর, যদি যুগ যুগ ধরে এমনি করে চেয়ে থাকতে পেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিবানী মশারীর প্রান্তটা টেনে নামিয়ে যথাযথ ক'রে গুজে দিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। ভেজিয়ে দেয় কপাট।

নৈনী জেলে সেবার এলাহাবাদের বিত্তবান, অভিজাত, জাঁদরেল আইন ব্যবসায়ী মতিলাল নেহ্রুর রুচিমত যে যুবক "ই'য়ে জেল, হোটেল নেহি হ্যায়" বলে বাইরের লোভনীয় আহার্য্যকে অবহেলায় খেতে অস্বীকার করেছিল, যে যুবক বাড়ীতে নয়, জেলে আছে বলে বাপের পাঠানো পাখা, বরফের বাক্স সব 'আনন্দ ভবন'-এ ফেরৎ পাঠিয়েছিল—সে যুবকটিকে শুধু দু'একজন ভারতীয় মাত্র নয় সারা ভারতের সব মানুষই ভালবাসত এককালে। সেই সহমর্মিতা ও সবার জন্যে মনের কোনে একটা সমব্যথার প্রদীপ শিখা অতি যত্নে জ্বালিয়ে রেখেছিল কারাপ্রাচীরের আড়ালে বাস করা যে জওহরলাল সেই জওহরলালই কী আজ ভারত-ভাগ্যবিধাতা আমাদের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহ্‌রু ?

যে পণ্ডিত নেহ্রু সেবারের বন্যাবিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বন্যায় দুর্গতদের অস্থায়ী ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়ে একটি কান্না আপ্লুত, মন্ত্রী দর্শনে ভয়াতুর, পলায়নপর ছুটন্ত শিশুকে কোলে তুলে নেবার জন্য ক্যাম্পের কক্ষে কক্ষে প্রায় লুকোচুরি খেলে সেই শিশুটিকে পাকড়াও ক'রে কোলে তুলে নিয়েছিলেন সেই নেহ্রুই কী পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার সর্বদলীয় সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞার তুরীতে উড়িয়ে দিয়ে বহু শিশু-নারী-যুবা-বৃদ্ধকে ভিটেছাড়া ক'রে কাঁদাবার জন্য নিজের জেদের বশে পাকিস্তানের পকেটে তুলে দিচ্ছেন বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ?

বিচিত্র এই পলিটিক্স নামক পেশাটা আর ততোধিক বিচিত্র

বুঝি বা পলিটিশিয়ানরা। সাপের কুটিল গতিভঙ্গীর মানে বোঝা যায় কিন্তু পলিটিশিয়ানরা কখন কি কারণে পঙ্কিল পথে হাঁটা-চলা করেন, তা বোঝার মত বুদ্ধি বুঝি ভগবান ভারতমাতার সন্তান কিঞ্চিদধিক সাঁইত্রিশ কোটি জনতাকে দেয় নি।

মদ খেলে মাতাল হওয়া যায়—এ অভিজ্ঞতা কানাই কাকতির বহুদিনের, কিন্তু বিশেষ কোন মেয়েমানুষের কথায় যে এত নেশা পায়, এমন ভাবে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উষ্ণতার অনুভূতি বয়ে যায়, সে অভিজ্ঞতা সে অতীতে আয়ত্ত করেনি। শিবানী যে ভাবে যে সুরে যে ভাষায় স্বল্প আঁধারআবৃত সায়ন্তন নদীতীরে বসে যে কথাগুলো বলে গেল, সে কথাগুলো যে ব্রহ্মপুত্রের কলতানের মত এখনও কানাইয়ের কানে কুলুকুলু সঙ্গীতে মূর্চ্ছা তুলছে। আর মনের মধ্যেটা যেন সেই সঙ্গীতের অনুরণনে থেকে থেকে কেমন মাতাল হ'য়ে উঠছে। কখনও ওর ইচ্ছে হয় গলার সবচেয়ে চড়া পর্দ্দায় কয়েক চরণ গান গেয়ে উঠতে, কখনও মনে হচ্ছে চরম একটা মুহূর্তে তার কাছে হারার মত হেরে যাওয়া শুভ্রেন্দুকে উপলক্ষ করে এই নির্জন নদীতীর প্রকম্পিত করে উৎপ্রাসের অট্টহাসি হেসে উঠতে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ দুটোর কোনটাই করল না কানাই কাকতি। কেবলমাত্র অপার এক আনন্দের নেশায় নিজের মনকে টইটম্বুর করে পাখীর মত হাল্কা পায়ে হনহনিয়ে হেঁটে চলল নিজের বাড়ীর দিকে।

কানাই কাকতি বাড়ী ফিরে দেখল ওর বিশ্বস্ত অনুচর গোপীকৃষ্ণ চালিহা তার জন্যই অপেক্ষমান। কিন্তু দেখামাত্র তাকে হঠাৎ কাল সকালে আসতে বলে একরকম ছুটেই সে ঢুকে গেল নিজের ঘরে। কেননা যে নেশা তার হয়েছে সে নেশার ঘোর এই সন্ধ্যারাতে কিছুতেই ছুটিয়ে দিতে সে চায় না। এ নেশায় যতক্ষণ নিজেকে বুঁদ করে রাখা যায় রাখবে। ঘরে ঢুকেই দোরে খিল এঁটে দিল কানাই। তারপর কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কেমন একটু লজ্জা পেয়ে হিঃ-হিঃ

করে হেসে উঠে বিছানায় লুটিয়ে দিল দেহ। অনাবশ্যক একটা গড়াগড়িও দিয়ে নিল সে। কেমন যেন ওর দেহের কোষে কোষে এক মধুর অনুরণন। সেই অনুরণনে রণিত অন্তরে কানাই অনেকক্ষণ চিত হ'য়ে শুয়ে থেকে নিজের ঘরের কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইল অপলকে। বুঝলো ও তার মনে আজ রঙ লেগেছে। রঙে রঙে যেন সারাটা অন্তর তার রেঙে উঠেছে। হ্যাঁ, শিবানী নিজের সুন্দর করে গুছিয়ে বলা কথায় ওর মনে, দেহে, চোখে, সর্ব ইন্দ্রিয়ে যেন আজ রঙ ধরিয়ে দিয়েছে। কাত হয়ে শুয়ে কানাই ওর অস্বাভাবিক বড় পাশ বালিশটা আঁকড়ে ধরে। কল্পনার চোখে চেয়ে দেখে—এই পাশ বালিশটা আর বেশীদিন তার বিছানায় ঠাঁই পাবে না। কার জন্য তবে এই জড় বস্তুটাকে ঠাঁই ছেড়ে দিতে হবে? এ প্রশ্নের যে মূর্তিমতী উত্তর, সে তার সারা অবয়ব নিয়ে ত বহুদিন থেকে কানাইয়ের মনের মণিকোঠায় উৎকীর্ণিত হ'য়ে আছে। কানাইয়ের চোখের সামনে থেকে যেন বিলীয়মান পাশ বালিশটার স্থানে ফুল্লমুখি শিবানীর মুখ ভেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কানাইয়ের মনে পড়ে যায় আর মাত্র একটি দিন সে আছে এ বাড়িতে, তারপরই শিবানীর ইচ্ছায় সে এঘর ছেড়ে, পিতৃপিতামহের এ ভিটা ছেড়ে, এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে দূরে, বহু দূরে। আর সেই সময় থেকেই সুরু হবে তার ও শিবানীর মিলিত জীবন—জীবনভর ও যা চেয়ে এসেছে।

এও ঠিক তার সেই চাওয়াটা পাওয়ার পরিধিতে আসতে দেয় নি যে সে হ'ল তারই এককালের সহপাঠি শুভ্রেন্দু। আর সেই জন্যই ত তাকে সে চরম শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু নিজে হাতে ত তার আশৈশবের শত্রুকে শাসন করতে পারছে না—তাকে শাস্তি দেবার ভার যে তুলে নিয়েছে শিবানী নিজের হাতে। ঠিক এটাই হবে তার চরম শাস্তি। বঙ্গালটা চিরদিন যাকে ভেবে এসেছে সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে নিকটের মানুষ, বলতে গেলে

একান্ত নিভৃত যে মন সেই মনেরই মানুষ—তারই হাতে হোক ওর চরম পরাজয়, চরম শাস্তি।

কিন্তু সে নিজে কেন নেবে না নিজের হাতে প্রতিশোধ ? নেবে, নেবে—শুভ্রেন্দুর কায়ার উপর প্রতিশোধ না নিতে পারলেও প্রতিশোধ নিতে পারে সে তার প্রতিকৃতির ওপর। হ্যাঁ তাই নেবে। সঙ্গে সঙ্গে কানাই উঠে পড়ে খুলে ফেলে ওর ঘরের আলমারীটার পাল্লা। দ্রুত হাত চালিয়ে বের করে একটা বেশ বড় খাম। দেখতে দেখতে ক্রমেই ওর চোখ-মুখ ভীষণ হয়ে ওঠে, হ'য়ে ওঠে কুটিলতর। খামটার মুখ খুলে বের করে একটা ছবি—যে ছবিতে কানাই ও শুভ্রেন্দু বসে আছে পাশাপাশি।

এ ছবি আজকের নয়। সেই ওরা যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল, তখন তোলা হয়েছিল ছবিটা। পরীক্ষার পর ওরা দু'জনে গিয়েছিল গৌহাটী শহরে বেড়াতে। সেই সময় কানাইয়েরই আগ্রহাতিশয্যে তোলা হয়েছিল দুই সহপাঠীর এই মিলিত ফটো। ছবিটা চোখের কাছে তুলে ধরল কানাই। দেখতে দেখতে ওর চোখের মণিদুটো জ্বল জ্বল করে ওঠে। উত্তেজনার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গলার শিরাগুলো ফুলে ওঠে আবার মিলিয়ে যায়। দেখতে দেখতে মনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সঙ্কল্পটা ওর চিন্তাশক্তিকে করে আচ্ছন্ন। সঙ্গে সঙ্গে ও হাতের ছবিটা রেখে দেয় বালিশের ওপর, তারপর হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যায় বড় ট্রাঙ্কটার কাছে। কপালে, ঠোঁটের ওপরে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। দ্রুত হাতে খুলে ফেলে ট্রাঙ্কের ডালাটা—সঙ্গে সঙ্গে একটা এক ফুট লম্বা ছোরা ওর চোখে ঝিকমিকিয়ে ওঠে। ত্বরিৎ হাত বাড়িয়ে বজ্র-মুঠিতে তুলে নেয় অস্ত্রটা। তারপর কুটিল ভঙ্গীতে বালিশের কাছে গিয়ে, মনের সব আক্রোশ আরোপ করে শুভ্রেন্দুর ছবিটার বুক লক্ষ্য করে আমূল বসিয়ে দেয় সেটা। আর সঙ্গে সঙ্গে কানাই হা-হা করে বিকট শব্দে হেসে ওঠে ছাত কাঁপানো হাসি।

সে হাসি শোনামাত্র দোরের বাইরে ওকে খেতে ডাকতে আসা মিনিবালার বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠিত হয়ে ডেকে ওঠেন ঃ

—কানাই ? অ কানাই ?

—কে ?

প্রশ্ন করেই বুঝতে পারে কানাই কে তাকে ডাকছে। কিন্তু মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে নেশা করার পর যে ভাবে সে বেশামাল হয়ে পড়ে—সেইভাবে অভিনয় করে যাবে সে মায়ের সঙ্গে। তবেই মিনিবালা পালিয়ে যাবে। কেননা অতীতে বহুবার এ ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখেছে ও, মদো মানুষের ক্ষেপামী দেখে মিনিবালা ভয় পায়, ভীতা হয়ে ওঠে। তখন আর কোন আর্জি নিয়েই আসতে সাহস করে না আপন আত্মজর কাছে সে। এ ছাড়া সেবার যে ভাবে কানাই মাকে জব্দ করেছিল কথার প্যাঁচে, তাও মনে পড়ে যায় কানাইয়ের। তখন খুব নিয়মিত মদ খেত না কানাই। কেননা মা খুব গালমন্দ করত। মাঝে মাঝে অভিমান করে বলত, মদ না ছাড়লে সে তাকে ছেড়ে চলে যাবে বাপের বাড়ি। ঠিক তখনকার কথা। একদিন সন্ধ্যায় ওর মদোগুরুর বাড়ী থেকে এক পাইট টেনে বাড়ি ফিরেছে। মিনিবালা এসেছে ওর ঘরে কি যেন বলতে। . কিন্তু ঘরে ঢুকেই নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সে বলে ওঠে ঃ

—আবার তুই মদ খেয়েছিস কানু ?

—তোমার দিব্যি গেলে বলছি মা, মদ আমি খাইনি !

—মিথ্যে কথা। নইলে তোর মুখ থেকে গন্ধ বেরুবে কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরে কানাই জড়িয়ে জড়িয়ে বলে ঃ

—মাইরী মা, একটা কথা বলব ? মানে তোমার মত মেয়েলোক ত আর কোনদিন মদ খায়নি, তবে মদের গন্ধ জানলে কি করে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি মিনিবালা। হয়তো উত্তর দেবার প্রবৃত্তি হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর মায়ের এই বাক্‌রণে ভঙ্গ দেওয়ায় জয়ের হাসি হেসে উঠেছিল তারই সন্তান।

—কইরে কানাই, দোরটা খুলবি ?

মাতাল হওয়ার মত কপট কণ্ঠে কানাই জড়িয়ে জড়িয়ে বলে ঃ

—না, আবার মাইরী এসেছ বিরক্ত করতে ?

—আবার খেয়েছিস ওই ছাইপাঁশ ?

মিনিবালার কণ্ঠে ক্ষেদ ঝরে।

—খাবো, একশবার খাবো, হাজার বার খাবো, লাখ বার খাবো, আবার খাবো।

মিনিবালা বোঝে যে এরপর বন্ধ দরজায় তার পক্ষে ব্যর্থ অপেক্ষার আর মানে হয় না। তাই গজ গজ করতে করতে প্রস্থান করে সে। বুঝতে পেরে কানাই মনে মনে হেসে ওঠে। ভাবে আজ সে যা যা ঠিক যেমন যেমন ভাবে চাইছে তেমনই হচ্ছে। তা না হলে চলবে কেন, হাতে মাত্র যে তার একটা দিন আর দেড়টা রাত। এইটুকু সময়ের মধ্যে তাকে সব গুছিয়ে নিতে হবে। কাল ঠিক রাত চারটা। সময় বড় কম। কতটুকু আর।

কানাই দু'তিনটা ট্রাঙ্ক খুলে বেশ কয়েকটা নোটের তাড়া বের করে। বিছানায় সাজায় সেগুলো থরে থরে। আর এক ট্রাঙ্ক থেকে একটা গহনার বাক্স বের করে। সেটা খুলতেই অনেকগুলো সোনার গহনা হ্যারিকেনের আলোয় জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে। সেগুলোর মাঝ থেকে একটা বেশ ভারি ওজনের হার দু'হাতে ধরে চোখের সামনে তুলে ধরে কানাই! কল্পনা করে ও এই হারছড়া যখন শিবানীর শঙ্খধবল গ্রীবায় আশ্রয় পাবে—তখন ওর এ অলঙ্কার জন্ম বুঝি সার্থক হয়ে যাবে। এই সব অলঙ্কার একটা একটা করে সে তুলে দেবে শিবানীর দেহের সম্ভাব্য সকল অঙ্গে। সেই সালঙ্কারা

সুসজ্জিতা শিবানী—কাল থেকে কানাই কাকতির। সারাজীবন সে যাকে যেমন করে চেয়ে এসেছে, সে ঠিক তেমন করেই তার হচ্ছে।

আনন্দ, আনন্দ, আনন্দের মীড়-গমক-মূর্ছনায় কানাইয়ের সারা অন্তর যেন সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে। মনে মনে স্থির করে সে, যে নেশায় ও সন্ধ্যা থেকে বুঁদ হয়ে আছে সে নেশার সঙ্গে যদি মদের নেশাটা মেশানো যায় তা' হ'লে না জানি আরও কত মেজাজি হয়ে উঠবে সারা মন! মদে মদ ঢেলে যেন কি এক মেশাল মদ খায় সাহেবরা, যাকে বলে ককটেল। কিন্তু মেয়ে-মানুষের নেশার সঙ্গে মদের নেশা মিশে কোন জোরালো নেশা হ'তে পারে কিনা তা পরীক্ষা করবে আজ কানাই। এই কথা ভাবতে ভাবতে ও আলমারির তাক থেকে বের করে বোতল, বের করে গেলাস। আর পরক্ষণেই বোতলের ছিপি খুলে খুনলাল তরল পদার্থ ঢালে গ্লাসে। কলকল শব্দ হয়। সে শব্দ শোনামাত্র কানাইয়ের সারা শরীরের শিরাগুলোতে বওয়া রক্ত-ধারায়ও বুঝি কলোনাদ ওঠে।

জওহরলালজী, অতীতের এবং বর্তমানের বাঙ্গালীকে বাদ দিয়ে তুমি কি ভারতের প্রতিভাধরদের নাম করতে পার? পার না। কেননা ভারতের সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞানসাধনা, ললিতকলা থেকে প্রায় সর্বক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিভাই যে আগে ভাগে এগিয়ে গেছে —আজও নানা ক্ষেত্রে যাচ্ছে। এই জন্যই ত' গোখেল বলেছিলেন What Bengal thinks to-day rest of India will think tomorrow. জাতীয় জীবনের কোন্ বিভাগে নেই বাঙ্গালীর অগ্রগামীতা? সর্ববিভাগেই তার প্রতিভা অতীতে প্রকাশিত ও বর্তমানে প্রকাশমান। সাহিত্যে এবং কলাশিল্পে বাঙ্গালী পূর্ণমাত্রায় সৃজনশীল রয়েছে, নিত্য নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সে সর্বদাই অগ্রণী। বিজ্ঞানেও বাঙ্গালী সন্তান বরেণ্য হয়েছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙ্গালী বিধান রায়ের নামে যেন কিংবদন্তীই প্রচলিত হয়েছে। তাই মহাত্মার মত মহান নেতারও নাড়ী টিপতে হতো বিধান বাবুকেই। অবশ্য গান্ধীজির অনেক সময়ের 'ফিঁভার' "পলিটিক্যাল ফিভার" রূপেও আখ্যাত হ'ত। আর সেই দ্বিতীয় প্রকারের অসুস্থতার আরোগ্যকারীও নাকি ছিলেন বাঙ্গালী বিধান রায়। এযুগে বাঙ্গালী চলচ্চিত্র পরিচালক পাচ্ছে বিশ্ববন্দনা; অর্জন করছে ফরেন মানি। বন্দুক চালনায়, বাঙ্গালী এগিয়ে, এয়ার মার্শাল স্বর্গত মুখার্জীর কাছে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ঋণ অপরিশোধনীয়, হিমালয়জয়ী তেনজিং নোরগে বাংলাবাসী, বিশ্ববরেণ্য যাদুকর প্রতুল

চন্দ্র সরকারও যে বাঙ্গালী, নন্দাঘুটি বিজয়ীরাও বাংলার সন্তান, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমে ভারতের আর কোন প্রদেশ এগিয়ে যায় নি, গিয়েছে বাঙ্গালীই।

তাই একথা কি অবশিষ্ট ভারত অস্বীকার করতে পারে যে বাঙ্গালীর মধ্যেই রয়েছে প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য্য ও প্রতিভায় স্বতঃস্ফুর্ত্ত প্রবাহ। সুতরাং বাঙ্গালী কোথাও মার খেলে, লাঞ্ছনা ভোগ করলে সারা ভারতের প্রত্যেকেরই গায়ে লাগা উচিত। কেননা বাঙ্গালী না জেগে উঠলে, ফাঁসীর মঞ্চে বাঙ্গালীর যুবশক্তি জীবনের জয়গান না গেয়ে গেলে ভারতাত্মার প্রাণে স্বাধীনতা অর্জনের জাগরণী সঙ্গীত রণিত হ'তো না। তাই বাঙ্গালীর প্রতি তোমার মত বিচক্ষণ রাজনীতিকেরও ঔদাসিন্য আমাকে পীড়া দেয়। খণ্ডিত বাংলার অঙ্গছেদ করে অপর রাষ্ট্রকে উপঢৌকন দিতে গিয়ে তুমি যে আরও ভুল করছ নেহ্‌রু। তোমার হোমরা চোমরা অফিসারদের ভুলের খেশারৎ দিতে কেন হবে বেরুবাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভারতীয় বাঙ্গালীকে? একটু কুণ্ঠ বা বিবেকের বকুনি কি তোমার মনকে ব্যথিত করছে না? যারা ভুল ক'রে দেশের মাটিতে বিদেশের স্বার্থ কায়েম করল তাদের কী শা দিয়েছ? দাওনি। দিতে পারেনি তোমার সিভিলিয়ান সর্ব শাসন। তাই বলছি পণ্ডিত নেহ্‌রু তুমি ভুল করছ।

রাতের আহার শেষ করে শিবানী ওর ঘরে ঢুকল। হ্যারিকেনটা মাথার দিকের পড়বার টেবিলে রেখে তক্তপোষে উঠে পড়ল। একলা ঘরের বিবিক্ত পরিবেশের সুযোগে গ্রীষ্মাধীক্য থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় বুকের বডিস ও গায়ের ব্লাউজ খুলে রাখল মাথার কাছে। কাপড়ের আচলটায় উদাল গায়ে জড়িয়ে, মাথার বেনুনীর লেজের দিকটা বালিশের পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল ও। শুয়ে পড়েই হাত বাড়িয়ে হ্যরিকেনের শিখাটা ডিম করে দিল।

গুলো বটে কিন্তু চোখের পাতা এক করতে পারল না। মনের মধ্যে কেবলই আজ সন্ধ্যায় কানাইকে যে আশ্বাস ও দিয়ে এসেছে, সেই নিয়ে নানা প্রশ্ন ও প্রতি-প্রশ্নের আনাগোনা। সে কথা ভাবতে একটা বিশ্রী অস্বস্তির কাঁটা যেন খচ-খচ করে হৃদয়-নিভৃতে। বিছানা জুড়েও যেন একটা কেমন অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করে ও। তাই শুয়ে থাকতে পারে না। মানসিক অস্থিরতার আতিশয্যে শায়িত দেহটা তুলে উঠে বসে ও। মনের অতলে একটা জমাট বাঁধা অসহায়তা ছটফট করে। আর অনুশোচনার তীব্র লোনা জলে মনের মিষ্টি ভাবটা যেন বিস্বাদ হয়ে যায়।

অনুশোচনার চাঞ্চল্যে ওর ইচ্ছা করে টেবিলের কোণাটায় মাথা কুটতে। কেন সে অমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব দিল কানাইকে? সেই প্রস্তাবটা কার্যকরী করতে হ'লে কয়েক জনের মনে যে নির্মমতার আঘাত হানতে হবে তা তার মত মেয়ের পক্ষে কত না কঠিন।

কেন ও এমন একটা কঠিন দুরূহ ব্যাপারকে অত সহজ ও সরলভাবে মনে স্থান দিল? কিন্তু না দিয়েই বা উপায় ছিল কী? যদি সে ঐরকম একটা লোভনীয় প্রস্তাব না দিত—যে প্রস্তাব তার বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলার মতই দুঃসহ—তবে সে শুভ্রেন্দু-শত্রু কুটিল কঠিন কানাইকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারত না। তার মনের মধ্যে শুভ্রেন্দুর রক্তপানের ঈপ্সাটা যেন 'ম্যয় ভুখা হুঁ' রবে বিকট মুখ ব্যাদান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই নিষ্ঠুর ভয়াল ইচ্ছার দানবটাকে সাময়িক ভাবেও দমিত করে রাখতে হলে এই লোভনীয় প্রস্তাবের প্রাণটা সেই ভয়াল ইপ্সার মুখ ব্যাদানের সম্মুখে ছুঁড়ে না দিলে তার ঐ ঝলসিত লেলিহান লোলুপতাকে সংযত করা যেত না আজ রাতটা পর্যন্ত্যও। তাই কানাইয়ের নির্মম ভয়ঙ্কর সংকল্পের কালুষ্যে শুভ্রেন্দুর ভবিষ্যৎ যাতে আচ্ছন্ন না হয় সেই প্রয়োজনের প্রতি একান্ত হ'য়ে শিবানী ঐ

প্রস্তাব দিয়ে বীতভয় হয়েছিল। এছাড়া অন্য কোন উপায় ত ছিল না তার সামনে। পথহারা পথিকের মত যেন ও নিরুপায় হয়ে এই বিপদশঙ্কুল পথে পা বাড়িয়েছে।

সুতরাং তাৎকালিক যে সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে সেটা না নিয়ে আর কিইবা করতে পারত। সে সিদ্ধান্ত না নিলে সেই মুহূর্তেই কি শুভ্রেন্দুকে তার ভবিষ্যতের কাল কুটিল কূপে হাত-পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হ'ত না? কিন্তু এখন শিবানী কি করে? আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর ওর ভাগ্যে যে আসন্ন বিপর্য্যয় তার ভীষণতা নিয়ে এগিয়ে আসছে। তার ও শুভ্রেন্দুর ভালবাসার যে শিখাটি স্নিগ্ধ আলোক বিকিরণে আলোকিত করছে তাদের উভয়ের মন, সেই শিখাটিকে কানাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুত প্রস্তাবটির নির্মম ঝড়ের ঝাপ্টা থেকে কি করে রক্ষা করা সম্ভব?

ভাবতে ভাবতে শিবানীর বুকে যেন আশঙ্কার স্পন্দন দ্রুত হতে দ্রুততর হয়। ওর মনটায় কি এক তীব্র জ্বালা ছড়িয়ে পড়ে। নিশ্বাস যেন ভারি হয়ে আসে। হৃদয়ের সুকোমল অনুভূতিটা যেন ফাঁকা হ'য়ে আসে। নিজের সারা সত্তাটাকে বড় নিঃস্ব মনে হয়—মনে হয় অর্থহীন। মাথাটা যেন অস্বাভাবিক ভারি মনে হয়। বিছানা থেকে নেমে এগিয়ে যায় ও টেবিল আয়নাটার কাছে। মা রুণীবালা যেটা তাঁর বিয়ের সময় পেয়েছিলেন সঙ্গতিপন্ন পিতার কাছ থেকে। আয়নায় প্রতিবিম্বিত নিজের মূর্ত্তি দেখে শিবানী যেন নিজেই শিউরে ওঠে। তার মুখের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন এই কয়েক মুহূর্তেই চিন্তা তার শোষণ শক্তিতে শুষে নিয়েছে! এ যেন রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জায় গড়া শিবানী নামের মেয়েটির খোলস মাত্র। ওর দেহের কোষে কোষে জীবনের যে অনুরণন চলেছিল, তা যেন হঠাৎই এক ভুলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শিরায় শিরায় বওয়া রক্তগুলি বুঝি স্পিরিটের মত বাতাসের সঙ্গে মিশে উবে গেছে। তাই তার চোখমুখ আজ

মৃতের মুখের মত সাদা। জীবনের জোয়ার-ভাটা যেন আর তার দেহের অগণিত শিরা উপশিরায় আসা যাওয়া করছে না। ওর দম্ যেন বন্ধ হয়ে আসে—মনে হচ্ছে মৃত্যু বুঝি তার হীম-শীতল প্রকাণ্ড হাত নিয়ে আলাদীনের সেই প্রকাণ্ড দৈত্যটার মত ভীষণ হ'য়ে তাকে ধরতে আসছে। মনে পড়ছে সেই গল্পের শ্লেজ গাড়ীর হরিণের কথা—যে কিনা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দিক্-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে এক খানায় পড়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল। শিবানীরও ত' সেই দশা। পথ খুঁজে না পেয়ে বিপথে পাড়ি দিতে গিয়ে সেওত' দুরন্ত গতি নিয়ে পড়তে যাচ্ছে কানাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি-রূপ ভয়ঙ্কর সেই খাদটায়।

কিন্তু—সেই গাঢ় কাল আঁধারে শিবানী যেন ছোট্ট একটা আলোর বিন্দু দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ তাই ত'। সেই আলোকবিন্দু ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে যেন ওকে আর এক নতুন পথ দেখাচ্ছে। যদিও এ পথটা বিশেষ দুর্গম, তবু যেন ওর কেমন মনে হয় এ পথে যদি মনের অটুট সঙ্কল্প নিয়ে, একান্ত নিষ্ঠায় এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তবে বোধ হয় সিদ্ধি ওদের নাগালে ধরা দিতে পারে। অন্ততঃ ধরা দেওয়া খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

মনের চিন্তাপথে পাওয়া নতুন পথের আপদ-বিপদের নানাদিক নিয়ে বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে বলে শিবানী আবার বিছানার আশ্রয় নেয়। আবার দেহভার এলিয়ে দেয় উপাধানের আলিঙ্গনে। মনের দেশে শত পথে শত রকম প্রশ্ন আনাগোনা করে। ও ভাবতে ভাবতে বেশ বুঝতে পারে, যে পথ সে দেখেছে মনের আলোকে, সে পথ স্বার্থপরের পথ। সে পথটা অনেকের চোখের জলে হবে পিছল—অনেক বাধার কণ্টক সে পথে পাতা থাকবেই। কিন্তু উপায় কি? মানুষকে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে এমন এমন সময় তার জীবনে আসে, যখন তাকে স্বার্থপর হতে হয়—বহুর স্বার্থকে বলি দিয়ে, অনেকের স্বার্থের ব্যর্থতার বিনিময়ে নিজের স্বার্থের পথটাকে

নিরাপদ করতে হয়, করতে হয় বাধাশূন্য। শিবানীর মনের এই মুহূর্তে হঠাৎ যে পথ-নির্দেশ মিলল সে পথ ত' তেমনি কোন পথ। এমন পথের পথিক হওয়া আদৌ সম্ভব কিনা—না সবটুকুই একেবারে অসম্ভব, সে প্রসঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখতে হবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। এই ভাবনাব গলিঘুচির অন্ধিসন্ধি খুঁজতে খুঁজতে এক সময় চিন্তাশ্রান্ত শিবানীর চেতন মন অবসাদগ্রস্ত হ'ল আব এই অবসরে চোখের পাতায় নেমে এলো নিদ্রার যবনিকা।

পণ্ডিত নেহ্‌রু, তুমি কি ভারতরঙ্গমঞ্চের বর্তমান যুগদৃশ্যের মুখ্য অভিনেতা? আমি জানি লোকসভার মর্য্যাদা কিরূপ, তার গুরুত্ব কত, অধ্যক্ষের কি বিপুল দায়িত্ব, সদস্যরাও সেই মর্য্যাদার অংশীদার হিসাবে মহিমান্বিত। কিন্তু আসাম প্রসঙ্গে বিতর্কের শেষ পর্য্যায়ে যখন এই পশ্চিমবঙ্গ বাসিন্দাদেরও অনেকের বহু ভাবে বহু সময়ে নিন্দাভাজন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি জোরাল বক্তৃতা দিয়ে বেশীরভাগ সদস্যের মন ঘুরিয়ে দিল তখন উত্তর প্রদেশীয় দুই ভদ্রলোক যে কাণ্ড করেছিল তাকে অভিনয় ছাড়া আর কি বলতে পারি? মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খেদ করে বলেছিল—আমাদের জীবদ্দশাতেই এই—না জানি অবর্তমানে দেশের কি অবস্থা হবে। এ কথা বলে যখন ভারত সরকারের সব দোষ নিজের স্কন্ধে তুলে নিতে যাচ্ছে তখন তুমি গদগদ স্বরে দোষের ভাগী হতে যেন এগিয়ে এলে ভাইরে লক্ষ্মণ বলে। মাননীয় সদস্যগণ তোমাদের দু'জনের কথায় ও আচরণে মুগ্ধ হল হয়তো সাময়িকভাবে—কিন্তু কেউ এটা ভেবে দেখলে না যে এই কাজে আসামে যারা সভ্যতার ইতিহাসের পৃষ্ঠা করেছে কলঙ্কিত—সংবিধানের সুনাম করেছে ধূল্যবলুণ্ঠিত তাদের কতখানি প্রশ্রয় দেওয়া হলো! তারা মনে মনে এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে যে তারা যা কিছুই করুক না কেন—কেন্দ্রের দুই বলিষ্ঠ নেতা তাদের দোষ কাঁধ পেতে নেবে!

আসাম সফরের সময় ম্যাজিষ্ট্রেটদের প্রতি কটাক্ষ করে তুমি বলেছিলে—'আমি ম্যাজিষ্ট্রেট হলে হাঙ্গামার সূত্রগুলো নষ্ট করতাম।'

কিন্তু পণ্ডিত নেহ্রু, তোমার দুর্বল শাসন কি হাঙ্গামা শেষে এতদিন চলে যাবার পরও সেখানকার অনসমীয়াদের পুরাপুরি নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হয়েছে? হয় নি। তাই বলি পণ্ডিত নেহ্রু, তুমি ভুল করছ—ভারতকে যদি তার বৈচিত্রের মধ্যেও ঐক্যবদ্ধ রাখতে হয় তবে গণতন্ত্রের পন্থায় হলেও সবল হাতের শাসন চাই।

অবশেষে শিবানীর নারীত্বের নির্ব্যাজ নিষ্ঠার প্রতি সম্মান দেখাতে হ'ল মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি নবেন্দুশেখরকে, শুভ্রেন্দুর মা মমতাময়ীকে, শিবানীর বাবা সরযূপ্রসাদ ও মা রুণীবালাকে। শিবানীর চোখের জলে সিক্ত পরিকল্পনা শুনে তাঁরা নানাভাবে ভেবে দেখলেন যে এই মারামারি হানাহানি থেকে যে দুটি তরুণ প্রাণ পরস্পরের হাত ধরে মুক্তি চাইছে, তাদের মুক্ত বিহঙ্গের মত মুক্তি দেওয়া উচিত। স্নেহ, মায়া ও মমতার সোনার খাঁচায় ওদের আবদ্ধ করে রাখবার দুর্বলতা থেকে যদি অভিভাবকরা মুক্ত না হন তবে হয়তো দুটি পাখীই একদিন খাঁচার মধ্যেই মরে পড়ে আছে, দেখা যাবে। তাই যদি তারা মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে গিয়ে ভাগ্য দোষে ক্লান্ত পাখা নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে করতেও তার সংগে পাঞ্জা লড়তে পারে, পারুক না।

এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও সহায়তা করল অত্যুৎসাহী কানাই কাকতির লেখা বেনামি এক টুকরো চিঠি—'বঙ্গাল শুভ্রেন্দু, তোমার শেষ সময় আসন্ন।'

প্রতিদিনের মত শিবানী প্রাতঃকৃত্য সেরেই শুভ্রেন্দুর ঘরে এসেছিল আজও। মাথার দিকের জানালাটা খুলতে গিয়ে তার সঙ্গে গোঁজা দেখেছিল এক টুকরো কাগজ। কাগজটা পাওয়ামাত্র চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। আর তাতে লেখা দেখেছিল ঐ কথাকটি। লেখাটুকু পড়ামাত্র শিবানীর মনে উৎকণ্ঠার একটা কান্না যেন চেঁচিয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ও ভয়বিহ্বল হরিণীর মত

ছুটে গিয়েছিল মমতাময়ীর কাছে। উচ্ছ্বসিত কান্নায় তার বুকে ভেঙ্গে পড়ে বলেছিল :

—বল, জ্যেঠি মা, আমি কি করব ?

ওর নারীহৃদয়ের এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই মমতাময়ীর। ওর হাতের কাগজের টুকরোটায় চোখ বুলিয়ে শিবানীকে উদ্বেগকণ্ঠে শুধান তিনি :

—কে লিখেছে এটা, কোথায় পেলি শিবী ?

—কানাইদার লেখা, পেয়েছি শুভ্রদার মাথার দিকের জানালায়।

একথা শোনামাত্র শিউরে ওঠেন মমতাময়ী। ভয়ব্যাকুল স্বরে বলেন :

—শিবী, মা, ওযে আমার একটি মাত্র সন্তান! কানাইয়ের কাছ থেকে চেয়ে এনে তুই ওর জীবনটা ভিক্ষা দে আমায়।

মুহূর্তে যেন শিবানীর মধ্যে যেন এক সঙ্কল্প-কঠিনা নারী শক্তির অংশ নিয়ে জেগে ওঠে। উজ্জীবিত শিবানী দৃপ্ত স্বরে বলে :

—জ্যেঠিমা, এ যুগে ভিক্ষা বৃত্তিটা বড় নিকৃষ্ট বৃত্তি। দুর্বল হ'লে সবল আরও সরোষে তাকে পর্যুদস্ত করতে এগিয়ে আসে।

—তবে আমি কি করব রে ?

মমতাময়ী ছলোছলো চোখে চেয়ে বালিকার মত প্রশ্ন করেন। যেন শিবানী আজ তাঁর শিক্ষিকার আসনে উঠে বসেছে।

—তোমাদের কিছুই করতে হবে না জ্যেঠিমা, শুধু আমার মিনতি, আমি যা করতে চাই, তা যতই অসম্ভব হোক, তাতে বাধা দিও না। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেইটিই শুভ্রদাকে কানাইদাদের হাত থেকে রক্ষা করার একমাত্র পথ।

—আমি কথা দিচ্ছি শিবী, ওর যদি মঙ্গল হয় তবে আমার অনুমতি ত পাবিই তোর জ্যাঠামণির অনুমতিও আমি আদায় ক'রে দেব। তুই আমায় বল শিবী, কি ক'রে বাঁচাবি ওকে ?

শিবানী বলে তার পরিকল্পনার কথা, বলে সে কিভাবে, কি কৌশলে কানাইদের শান্তি কমিটি ডাকার গূঢ় কারণটা জেনে নিয়েছে কানাইয়েরই মুখ থেকে। কিভাবে কানাইয়ের কাছে তার মত ভরা বয়েসের মেয়েও কতটা ঝুঁকি নিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার ভাণ করে মনের কথা বের করে এনেছে। সেসব কথা শুনতে শুনতে তাঁর চেয়ে অনেক দশক ছোট এক ফোঁটা মেয়ের মনোবল ভেবে মমতাময়ীর মাথা যেন আপনা থেকে তাব প্রতি আনত হয়, হয় শ্রদ্ধালু। আবেগাপ্লুত হয়ে শিবানীর একটি হাত হাতে নিয়ে অভিভূত স্বরে বলেন ঃ

—হ্যাঁ মা, তুইই পারবি! তুইই পারবি আমার শুভ্রকে সকল বিপদ থেকে মুক্ত করতে। স্বার্থক নাম মা তোর। তুই সত্যিকারের শিবানী। তুই ছাড়া আমার আপনভোলা, পড়া পাগলা ছেলেকে সারা জীবন আর কে আগলে রাখবে? আমরা আর ক'দিন মা, কাল ত' ঘনিয়ে এলো। কিন্তু…

—এতে মনে শত কিন্তু এলেও কোন কিন্তুতে কান দিলে ত' চলবে না জ্যেঠিমা। হাতে ত' মোটে দশ বার ঘণ্টা সময়। এর মধ্যে আমাদের তৈরী হ'য়ে নিতে হবে। আর কানাই কাকতির বড় একটা লোভের দিকে ছলনার ধুলো ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে হবে।

—নারে মা, আমি ভাবছি, তোর বাবা-মা যদি এতে মত না দেয়।

—তাঁদের মত আমি আদায় কবে ছাড়ব জ্যেঠিমা।

দৃঢ় স্বরে বলে শিবানী।

—তবে তুই তোর মা-বাবাকে বলগে। আমি তোর জ্যাঠামণি আর শুভ্রকে সব বলে বুঝিয়ে রাজী করাচ্ছি।

মমতাময়ীর নির্দেশমত শিবানী তখনি দ্রুত পায়ে বাড়ি চলে যায়। রুণীবালা তখন প্রাতঃকালীন স্নান সেরে প্রতিদিনের

মত ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে যাচ্ছেন। ঠিক তখুনি শিবানী এসে দাঁড়ায় তার সামনে 'মা' বলে ডাক দিয়ে।

—কি রে, কিছু বলবি?

—হ্যাঁ, মা।

শিবানী আনুপূর্বিক সব বলে যায় মায়ের কাছে। আর বিস্মিত চোখ মুখ নিয়ে সব শুনে যান রুণীবালা।

রুণীবালা প্রথমে রাজী হন না। কেননা দূর অনির্দেশের পথে কি করে কোন্ প্রাণে ছেড়ে দেবেন একমাত্র বুকের ধনকে? তাই ছুটে যান স্বামীর কাছে। বলেন সব কথা তাঁকে। সরযুপ্রসাদও তাই ভেবেছিলেন—অনিশ্চিত ভবিতব্যের পথে মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু তাঁদের এ যুক্তি টিকতে দেয়নি শিবানী। সে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে স্পষ্ট বলে বসে:

—যদি তোমরা কানাই কাকতির দলের গুণ্ডাদের হাত থেকে শুভ্রদাকে রক্ষা করতে না পার—তবে কিন্তু সেইদিনই আমি বুকে ছুরি বসিয়ে বা কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে মরব।

এত সব শুনে ওর মা ও বাবার মনে উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে। তার পর যখন আরও শুনলেন যে, তাদের মেয়েই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সংগে শুভ্রেন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা করার এক পরিকল্পনা সময়োচিত হস্তক্ষেপে ব্যর্থ করে দিয়েছে, তখন আর নিষেধ করতে পারলেন না। প্রমাণ স্বরূপ শিবানী ওদের দেখাল তার জিম্মায় রাখা রিভালভারটা।

স্ত্রীর কথা মনযোগ দিয়ে শুনে নবেন্দুশেখরও রাজী হলেন। সব চেয়ে বেশী বাধা এলো শুভ্রেন্দুর কাছ থেকে। বারবার মমতাময়ীর অনুরোধ, চোখের জল প্রত্যাখ্যান করে। তার কেবলই এক কথা:

—বাবা-মাকে ছেড়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে যেতে কিছুতেই পারব না আমি।

কিন্তু মমতাময়ীর দৃঢ়তা ও চোখের জল তার সে সঙ্কল্পও ভাসিয়ে দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তিনি বলেছিলেন:

—তুই কি মনে করিস তোকে মেরে ফেললে আমাদের বুড়ো-বুড়ির কেউ বেঁচে থাকবো? আমরাও আত্মহত্যা করব। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তুই যদি বেঁচে-বর্তে থাকিস, তবে তোদের মিলিত জীবনের মধ্যেই আমরা যে বেঁচে থাকব, খোকা।

এ যেন এক আধুনিক রূপকথা।

নীলকমল আর লালকমল অতিথি হ'য়ে এসে উঠেছে, অপরিচিত রাজ্যের এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে। গভীর রাত্রিতে তারা শুনল ছেলে-পুত্রবধূ-বাপ-মার মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে:

বাপ—আমি বুড়ো হয়েছি, ক'দিনই বা বাঁচবো, আমিই যাই রাক্ষসের পেটে।

মা—সে হবে না, সিঁথির সিঁদুর যদি মুছেই যাবে, কি হবে এ দুঃসহ জীবনে? বরং স্বামী পুত্র বর্তমানে সতী নারী ডঙ্কা মেরে চলে যাই রাক্ষসের পেটে।

পুত্র—একি কখনও হয়, উপযুক্ত পুত্র কি তার বাপ-মাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে?

পুত্রবধূ—স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ীকে কি অকালে মরতে দিতে পারি কল্যাণীবধূ আমি? আমিই যাব আজ রাক্ষসের পেটে।

সেদিন রূপকথার গল্পের বাপ-মা-পুত্র-পুত্রবধূকে রাক্ষসের আহার হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল লালকমল-নীলকমল। কিন্তু এ যুগের প্রাদেশিকতারূপ বিকট দৈত্যের ক্ষুধা যে আরও বেশী। মুখব্যাদান তার আরও বৃহৎ—গোটা ভারতবর্ষ তাতে সে গ্রাস করতে পারে। পালা করে রূপকথার রাক্ষসের মত মাত্র একটি করে জীবন রোজ নিয়ে সে তৃপ্ত নয়, তার মুখগহ্বরে বহুজীবন হয়েছে ইতিমধ্যেই বলি। আর্তআশ্রয়ী বলিষ্ঠ নীলকমল লালকমলের মত দুটি মাত্র অসির স্পর্দ্ধা নয়, বন্দুক বেয়নেট ট্যাঙ্ক বিমান বোমা

সর্বোপরি আইনের অস্ত্র হাতে থাকলেও এ যুগের রাষ্ট্রশক্তি সে দৈত্যকে দমিত করবার মত সবল নয়।

শেষ পর্যন্ত টলতে হ'ল শুভ্রেন্দুকেও। নবেন্দুশেখর, মমতাময়ী, সরযুপ্রসাদ, রুণীবালা একসঙ্গে বসে তাদের ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেন। রাত্রির অন্ধকারে বর ও কনের মা-বাবা প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখার অগ্নি সাক্ষী করে ওদের দু'জনের হাত বেঁধে দিল পরস্পরের দায়িত্ব নিতে। পুরোহিতের মুখে মন্ত্র উচ্চারিত হ'ল না, শাঁখের কণ্ঠ ঘোষণা করল না মধুমিলনের মহালগ্ন, বিবাহ সভার সকলের সম্মতির অপেক্ষায় থাকল না ওরা, তবু যেন আরও বহু গুণ বেশী শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল দুটি যুনী-যুবা মন। মমতাময়ী নিজের সিঁদুর কৌটা থেকে লাল টকটকে সিঁদুর নিয়ে শিবানীর সিঁথিতে পরিয়ে দিতে বলল শুভ্রেন্দুকে। নিজের হাতের নোয়া শাঁখা শিবানীর হাতে গলিয়ে দিলেন রুণীবালা। নবেন্দুশেখর জানালেন যে পরদিনই শুভ্রেন্দুর কলকাতার ব্যাঙ্কে ড্রাফ্‌ট পাঠিয়ে দেবেন তিনি, যত টাকার সম্ভব। এ ছাড়া দু' পরিবারের যত সোনা-দানা ছিল, সব পুঁটলি বেঁধে দিয়ে দিল তারা শিবানীর হাতে। বলে দিল বার বার করে, পথে যে কোন বিপদ হলে যেন এগুলো মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে উভয়ে উভয়ের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করে তারা।

সন্ধ্যার আবছায়া পৃথিবীতে নামলে সবকিছু গুছিয়ে নেবার ব্যস্ততার মধ্যেও শিবানী এক ফাঁকে শিমূলতলার নদীতীরে গিয়ে দেখে এসেছিল কানাই কাকতির শক্ত মজবুত ভেলাটা ঠিক বাঁধা রয়েছে ঘাটে। ব্রহ্মপুত্রের ঢেউয়ের দোলায় আনন্দে যেন ভাসছে সেটা। যেন সে হাতছানি দিয়ে শিবানীকে ডেকে বলছে:

—এসো না চলে এখনই!

রাত গভীর হলে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছটি প্রাণী সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল ব্রহ্মপুত্রের দিকে। শিবানীর পরনে এই প্রথম শাড়ীর পরিবর্তে উঠেছে মেখলা-চাদর। ওর মুখে চোখে একটা অপূর্ব দৃঢ়তার

দ্যুতি। শুভ্রেন্দু অসুস্থ শরীরে বিশেষ ভেঙ্গে পড়েছে। সারাদিন ধরে বিবেকের সংগে যুদ্ধ করে অসুস্থ দেহমন তার অত্যধিক দুর্বল হয়ে পড়েছে। রুণীবালা ও মমতাময়ী অশ্রুছাপা চোখে পথ চলতে চলতে ক'বার হোঁচট খেয়ে গেলেন। আজ যেন জোনাকিরা বড় বেশী আলো জ্বালিয়েছে অভিনব বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নব-দম্পতিকে পথ দেখাবে বলে। ওদের দু'জনকে দেখে নির্মেঘ আকাশে তারারা যেন হাসছে আজ তাদের ঝিকিমিকি চোখে।

নদীতীরে বিদায় বিধুব মুহূর্ত এলো। এতক্ষণে মায়ের কোলে ভেঙ্গে পড়ল শিবানী। রুণীবালার চোখেও অশ্রুর বন্যা। কে যে সান্ত্বনা দেবে ও কে পাবে সান্ত্বনা, তা স্থির করা কঠিন হয়ে উঠলো। তবু সবই নিঃশব্দে করতে হবে। শব্দ হলে তা কোথায় কারও কানে গেলে সর্বনাশ! চার জন বয়স্কা নারী-পুরুষ দুজন তরুণ তরুণীকে মনের সব শুভ ইচ্ছা সহ জানালেন আশীর্বাদ। মমতাময়ীও রুণীবালার কান্নার মধ্যেই এক সময় নবেন্দুশেখর ভারি কণ্ঠে বললেন :

—আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি, তোরা উঠে পড় মা।

তার কথা মত প্রথমে শিবানী উঠল ভেলায়, তারপর সে প্রসারিত হাতে ধরে অতি সন্তর্পণে তাতে তুলে নিল অসুস্থ শুভ্রেন্দুকে।

কানাই কাকতি আয়োজনেব ত্রুটি রাখেনি কিছু! লগি, বৈঠা, সবই ছিল শিমুল গাছের কাছে। সেগুলো ওরা তুলে নিল ভেলায়। তারপর শেষ বারের মত পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়ে গেলে নবেন্দুশেখর ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করে শরীরের সব শক্তিতে ভেলাটা ঠেলে দিলেন। ব্রহ্মপুত্র যেন বুক পেতেই ছিল। মৃত্যুর হাত থেকে দুটি জীবনকে নিজের বুকে আশ্রয় দিয়ে মুহূর্তে অনির্দেশের পথে ভাসিয়ে নিয়ে চলল ওদের। মমতাময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখের জল মুছতে মুছতে বলে উঠলেন :

—দুর্গা, দুর্গা।

মানুষের পূর্ব পুরুষরা নাকি অন্য রূপ ধরে জল থেকেই উঠেছিল ডাঙ্গায়, সভ্যতার পত্তন করবে বলে। আজ আবার সেই সভ্য মানুষের অসভ্যতা ও বর্বরতায় সেই মানুষই মানুষের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আশ্রয় নিল জলের বুকে। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস।

ভেলাটা যতই মধ্যনদীর দিকে তীর ছেড়ে এগিয়ে যেতে লাগল, ততই মনে মনে নিশ্চিন্ততা বোধ করল শিবানী। কেননা তীরে তাদের নিরাপত্তা নেই যতটা আছে নীরে। একবার ও চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে নদীর দৃশ্য দেখে নিল। নদীর বুকে কোথাও কোন আলোর নিশানা নেই। হানাহানির ভয়ে মাঝি মাল্লারা বেসাতি ছেড়ে বাড়ী চলে গেছে। তবু কিন্তু উৎকণ্ঠা কম ছিল না শিবানীর মনে। বিশেষ করে তার নারীজীবনের প্রেয় পুরুষ অসুস্থ শুভ্রেন্দুকে নিয়ে ওর যত চিন্তা। প্রথমেই ও ওর পোঁটলা থেকে একটা দড়ি বের করে পরস্পরকে ওরা বেঁধে নিল ভেলার সঙ্গে। বলা ত যায় না, যদি ভীষণা ব্রহ্মপুত্রের কোন বিরাট আবর্তে আবর্তিত হয়ে ওরা নীরের অতলান্তে লীন হয়ে যায়, ছিটকে পড়ে যায় ভাসন্ত যান থেকে—তবে ভেলার সংগে সংগেই আবার ভেসে উঠতে পারবে।

শুভ্রেন্দুর জ্বরটা বেড়েছে আবার। বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে সে। তাই চোখ বুজে পড়ে আছে। মাথা ধরেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে জিবের ডগায় আগের মতই 'শুভ্রদা' কথাটা এসে পড়েছিল বলে শিবানী নিজের কাছেই বিস্তর লজ্জা পেল। মনে মনে দু'চারবার 'ওগো' কথাটা তালিম দিয়ে নিয়ে বলল :

—ওগো, তোমার আবার মাথা ধরেছে নাকি ?

—খুব।

—মাথাটা টিপে দেই ?

শিবানীর স্বরে ব্যাকুলতা।

—দাও।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে শুভ্রেন্দু।

শিবানী দু'হাতে ধরে ভেলা থেকে তার কোলে শুভ্রেন্দুব মাথাটা তুলে নেয়। তারপর অতি যত্নে কপালটা টিপে দিতে লাগল। ক্ষণপরে শুভ্রেন্দু চোখ মেলে চেয়ে বলল ঃ

—আমায় দিয়ে এ কি করালে বলত ?

—ওপরে আকাশ আর তারারা সাক্ষী, নীচে ব্রহ্মপুত্র, আমি যা করেছি এছাড়া তোমার আর কিছু ভাল হতে পারত না। এ না হলে কানাই কাকতির চরদের হাত থেকে তুমি কিছুতেই নিস্তার পেতে না।

একথা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল শুভ্রেন্দু। বলল ঃ

—মানুষ অবশ্য ঘটনার দাস। ঘটনা যে পথে তাকে নিয়ে যায়, সেই পথেই তাকে যেতে হয়। তবু মা-বাবাকে এই বিপদের মুখে ছেড়ে চলে আসাটা ঠিক······

—তুমি ত' একাই মা-বাবাকে ছেড়ে আস নি, আমিও।

—আমি আমাদের দু'জনের কথাই বলছি। তাঁদের প্রতি আমরা যে অন্যায় করলাম তার জন্য আমরা দু'জনেই সমান দায়ী। কিন্তু আর একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি—তুমি যে এতটা ডাংপিটে, তা আমার জানা ছিল না।—মা-বাবার সামনে সোজা বলে বসলে আমার কিছু হলে গলায় দড়ি দেবে বা দেবে কাপড়ে আগুন ?

—বারে, আমি ডাংপিটে হব না ? ব্রহ্মপুত্রের জল হাওয়ায় মানুষ হওয়া মেয়ে না আমি ! আমায় মনের মধ্যে যে কথা দিন-রাত গান হয়ে গুঞ্জরিত হচ্ছে তা প্রকাশ করলেই যত দোষ? তা ছাড়া যে তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি হোষ্টেল ছেড়ে নিশুতি রাতে পালিয়ে এসেছি, পথে এ দেশের মেয়েদের সবচেয়ে যে জিনিস ঠুনকো—তা পর্যন্ত ভেঙ্গে চৌচির হতে হতে বাঁচিয়ে এনেছি,

কানাই কাকতি, যাকে আমি জীবনে সব চেয়ে ঘৃণা করি তাকে পর্যন্ত নানা কথার ছলনায় বশ করে ভুলিয়ে ভালিয়ে রিভালভারটা হাত করেছি—তারপরও তোমাকে অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে রাখি কি করে? এ ব্যাপারে আমি সত্যি বড় স্বার্থপর।

—তোমায় স্বার্থপর বললে ও কথাটার মানে অভিধানে ঘুরিয়ে পরার্থপর রাখতে হয়। প্রেয়কে পাবার জন্যে গল্প উপন্যাসে নায়িকারা কত কিছু করে, কিন্তু তুমি যা করলে তার বোধ হয় তুলনা হয় না। আমি তাই বলি, তুমি অনন্যা।

শুভ্রেন্দুর মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খুশীতে আনত হ'ল শিবানীর মুখ। ধীর লাজ নম্র কণ্ঠে বলল:

—সেই 'ভোগালী বিহুর' দিন তোমার স্পর্শে যেদিন মনের মাঝে উপলব্ধি করলাম আমি নারীর মর্য্যাদায় হয়েছি ভূষিতা, সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে আমার আমিকে যে তোমার [illegible]েই স'পে রেখেছি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি—আমার প্রথম প্রেমকে যে করেই হোক সফল করে তুলব।

—সত্যি শিবানী, তোমার প্রেমকে সফল ক'রে তুলতে যে অগ্নি-পরীক্ষায় তোমায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'য়েছে তার তুলনা এ যুগে বিরল। একথা ভেবে আজ এ অসুস্থতার মধ্যেও আমার মনের মাঝে যেন রামধনুর সপ্তরঙের ছটা দেখতে পাচ্ছি—আর সে রামধনু সৃষ্টি হয়েছে তোমার প্রেমের সুধাবর্ষী জলকণার স্পর্শে।

বলতে বলতে অন্তরের এক অপার আনন্দে আভাসিত হয় শুভ্রেন্দুর সারা মুখ। সঙ্গে সঙ্গে ওর কপালে শিবানীর সঞ্চরণশীল ডান হাতটা টেনে নিয়ে তাতে নিজের মুখটা কেমন এক খুশী-খুশী অনুভূতিতে গুজে দেয় সে।

শুভ্রেন্দুর আবেগ স্পর্শে অনাস্বাদিতপূর্ব এক শিহরণে রুচিরা শিবানীর মনপ্রাণ রোমাঞ্চিত হয়। মধুর আবেশে মুদে আসে ওর দৃষ্টি। সেই মুদিত চোখ দিয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে বুঝি

প্রেয়কে পাওয়ার অনির্বচনীয় আনন্দে। বাঁ হাতের চাঁপার কলির মত আঙ্গুল বাড়িয়ে ও মুছে ফেলে চোখের সে আনন্দময় অশ্রু।

মুক্তির আশ্বাসে মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে ধরেও আকাশ আঙ্গিনায়। অগণিত তারারা ওদের দিকে চেয়েই মিটিমিটি আজ হাসছে। ব্রহ্মপুত্র যেন ওদের খুশীতে খুশী হ'য়ে গাইছে জলকল্লোলের সুমধুর গান। যে গান শুনে শিবানীর মনে ও একটা মিষ্টি সুরের গুঞ্জরণ শুরু হয়। উপচীয়মান আনন্দে অধীরা শিবানী এক সময় ঝুঁকে পড়ে আবেশ দৃষ্টিতে শুভ্রেন্দুর মুখে চেয়ে অস্ফুটে বলে ঃ

—এই !

—বল।

—তুমি বল।

—কি ?

—কথা।

—না আজ কোন কথা নয়।

—তবে কি ?

—গান !

—গান ! কোথায় ?

—আমার মনে।

—আর আমার কিন্তু বুকে।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ !

—দেখি ?

বলতে বলতে শুভ্রেন্দু হাত বাড়াতে যায় শিবানীর উত্তুঙ্গ উরষের উদ্দেশ্যে।

—অসভ্য। Don't be Vulgar.

লজ্জিত হয়ে ভৎ'সিত স্বরে কথাটা বলতে বলতে শিবানী শুভ্রেন্দুর উদ্যত ডান হাতটা মুঠিতে ধরে নামিয়ে দেয়।

এমন সময় হঠাৎ ভেলার একদিক জলের মধ্যে নীচু হচ্ছে বুঝতে পেরে শঙ্কিতা শিবানী দু'হাতে ত্রস্তে শুভ্রেন্দুকে জড়িয়ে ধরে। শুভ্রেন্দুও আকস্মিক বিপদ থেকে মুক্তির আশায় জাপ্টে ধরে তাকে। জিনিসগুলির প্রায় সবই বুদ্ধি করে ভেলার সংগে বেঁধে রেখেছিল শিবানী। পরক্ষণেই প্রবল বেগে পাক খেতে খেতে ভেলাটা জলের তলে তলিয়ে যায় আবর্তের গতিতে। ওরা দুটিতে আরও নিবিড় আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত হয়। কি একটা কথা শুভ্রেন্দুকে বল্‌তে যাচ্ছিল শিবানী—সে কথাটা ওর বুদ্বুদ হয়ে উঠে পড়ে জলের বুকে।

শিবানীর মনে একটা আক্ষেপের আলোড়ন ওঠে—যাকে পেতে এত মূল্য দিতে হ'ল—সে পাওয়া কি এতই ক্ষণস্থায়ী হবে? মিলনের পালা শুরু হতে না হতেই কি শেষ হয়ে যাবে? নেমে আসবে তাতে শেষের যবনিকা? মন বলে—যায়ই যদি শেষ হ'য়ে যাক না। এ মৃত্যু তোমাদের কতনা বাঞ্ছিত!

তেমন বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটার আগেই অবশ্য আবার ওদের ভেলা ভেসে ওঠে জলের উপরে। শিবানী একদিকে চাপ দিয়ে ভেলাটা সোজা করে নেয়। উল্টে যাওয়া ভেলা ধরে ওরা সাঁতরাতে থাকে। মুখে ঢুকে যাওয়া জল কুলকুচা করে ফেলে দিয়ে শিবানী শুভ্রেন্দুকে বল্‌ল:

—তুমি আগে উঠে পড়।

শিবানীর কথামত শুভ্রেন্দু জলে ডোবা পা দুটো নাড়াচাড়া ক'রে, জলের সমতলে দেহটা এনে, দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ে ভেলায়। তারপর হাত বাড়িয়ে শিবানীকেও টেনে তোলে সে।

এত রাত্রিতে দু'জনে ঝড়ো কাকের মত জলে ভিজলো। চিন্তিত হ'ল শিবানী অসুস্থ শুভ্রেন্দুর শরীরে এর প্রতিক্রিয়া ভেবে। ও ওর চাদরটা নিঙরে নিয়ে তা দিয়ে দ্রুত হাতে শুভ্রেন্দুর গা মাথা মুছিয়ে দিল। এর পর পোঁটলাটা খুলে তাতে বাঁধা প্লাষ্টিকের

ব্যাগটা বের করল। তা থেকে একটা শুকনো ধুতি বের করে পরতে দিল শুভ্রেন্দুকে। শুভ্রেন্দু স্রোতে চলমান ভেলায় উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় পাল্‌টে নিল। ভেজা ছাড়া কাপড়টা দড়ির সংগে বেঁধে রাখল শিবানী। চারদিক থেকে হিমশীতল হাওয়ারা যেন ছুটে এসে শুভ্রেন্দুর জ্বরো শরীর ধরে ঝাকানি দিতে লাগল। তাই শিবানীর দেওয়া চাদরটা গায়ে জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল সে। তার দিকে চেয়ে বলল ঃ

—তুমি ছাড়বে না কাপড় ?

—ছাড়তে ত' হয়—বিশেষ করে ভিজা জামা-কাপড়ে থাকলে তোমার পরিচর্য্যা করি কি করে ? কিন্তু ··

—ও, তোমাদের, মানে মেয়েদের কাপড় ছাড়াবার বৈজ্ঞানিক দিকটা ভেবে কুণ্ঠিত হচ্ছ ?

—না তা ঠিক ··

লজ্জা পেয়ে অল্প একটু হেসে বলে শিবানী।

—লজ্জা পাবার কিছু নেই। জলে বাস করলে লজ্জার প্রশ্ন ওঠে না—ওটা স্থলচরদের একচেটিয়া। জলচরদের সে বালাই নেই।

শুকনো কাপড় ও জামা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তবু কুণ্ঠিতা শিবানী শুভ্রেন্দুকে বলে ঃ

—এদিকে তাকাবে না কিন্তু !

—বেশ, এই আমি চোখ বুজে রইলুম। তবে চিরকালের মত যেন না আবার চোখ বুজে থাকতে হয়। ছাড়া শেষ হলে অন্ততঃ একটা সাড়া দিও।

—কি সব অলুক্ষুণে কথা যে বল। আমার ভয় করে না বুঝি। বেশ, ঘাট মানলুম, তোমায় আর চোখ বুজতে হবে না।

ব'লে শুভ্রেন্দুর দিকে চেয়ে একটু হাসে শিবানী। তারপর সে শুকনো বডিস, ব্লাউজ ও মেখলা গায়ে তুলে নিতে তৎপর হয়। হাতের কাজ চালিয়ে যেতে যেতেই বলে ঃ

—আচ্ছা, তুমি ত' রাসভারি অধ্যাপক, তবু এত ফাজিল তা ত' আগে বুঝতে দাও নি ?

—ওটা সংগদোষ।

রোগ যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেও মুচকি হেসে বলে শুভ্রেন্দু।

—যা অসভ্য !

লজ্জিত স্বর শিবানীর।

কথার পিঠে কথা চলে। যেন দু'টিকে আজ কথায় পেয়ে বসেছে। কথা বল্‌তে বল্‌তেই শিবানী বেশ পরিবর্তন করে ফেলে। তারপর বসে পড়ে জানুর ওপরে শুভ্রেন্দুর মাথাটা তুলে নেয়। শায়িত শুভ্রেন্দুর মাথার চুলে দরদভরে আঙ্গুল চালাতে থাকে। সীমাহীন নদীর বুকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে শিবানী এক সময় বলে :

—আচ্ছা, এমন যদি হয়, আমরা ভাসতে ভাসতে ভাসতে একেবারে সাগরে গিয়ে পড়ি ?

—তার মানে দাঁড়াবে এই, যে প্রাণ নিয়ে পালানো, সে প্রাণ আর ধোপে টিকলো না।

—তেমন হ'বার আগেই আমরা না খেতে পেয়ে মারা পড়ব।

—ক'দিনের রসদ আছে ?

শিবানীকে শুধায় শুভ্রেন্দু।

—হ্যাঁ, তা কাল দিন ও রাতটা চলে যাবে।

সময় গড়িয়ে চলে আপন গতিতে ; ওদের ভেলাও ভেসে চলে স্রোতের গতিতে গতিবান হয়ে। শুভ্রেন্দু বেশ বুঝতে পারে তার দেহের রোমে রোমে জ্বরের তাপের মাত্রাধিক্য ঘটছে। সেই সঙ্গে সারা দেহে শীতের শিহরণ। তবু ও জোর করে ভুলতে চায় সব যন্ত্রণা।

—আচ্ছা, এমন যদি হয় যখন দিন হবে, তখনই গিয়ে তীরে ভীড়লো আমাদের ভেলা—আর গুণ্ডা লোকরা মার মার শব্দে এসে আমাকে···

—তাহলে তোমার অহমকন্যার সঙ্গে রাখা রিভালভার গর্জে উঠে তেমন পশুদের কাকেও প্রাণ নিয়ে পালাতে দেবে না।

শুভ্রেন্দুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলে শিবানী। চোখে যেন ওর জ্বলন্ত আগুন—

—কিন্তু আমি ঘুমালে ত'। যদি সাত রাত সাত দিন জেগে থাকতে হয়, তাও থাকবো। কিছুতেই ঘুমাবো না, কিছুতেই না।

আপন মনে শেষের কথাটা নিজেকেই যেন বলে শিবানী।

জলে ভেজাটা শুভ্রেন্দুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। ক্রমেই শরীরের তাপ বাড়তে থাকে তার। সঙ্গে মাথার যন্ত্রণাও। উৎকণ্ঠিতা শিবানী সাধ্যমত সেবা করে যায় ওর। কখনও কপাল টিপে দেয়, কখনও চুলে আঙ্গুল চালায়, কখনও ওর আঙ্গুলগুলো এক এক করে টেনে দেয়। কিন্তু শুভ্রেন্দুর জ্বরের তাপ ক্রমেই উঠতি মুখে—সেই সঙ্গে দেহের কম্পন। কি করে যে শিবানী, ভেবে পায় না যেন। গায়ে দেওয়ার ভারি কিছু ত' নেই সঙ্গে। জ্বরকাতর শুভ্রেন্দুর যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করতে শিবানী যখন বিব্রত ঠিক সেই অবসরেই কোন এক কোণ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ উঠে এসে ঘন কালো পর্দায় আবৃত করে তারকিত আকাশ। স্বাভাবিক আবছা অন্ধকার হঠাৎ গাঢ় হ'তে শিবানী তাকাল আকাশের দিকে। আকাশের অবস্থা দেখে ওর সারা মন আশঙ্কায় ভরে যায়। উপরে ঐ মেঘ-সাজে সজ্জিত আকাশ আর নীচে ব্রহ্মপুত্র। বড় অসহায় মনে হয় ওর নিজেকে। আকাশের দিকে চেয়ে আকুতি জানিয়ে যেন বলে—হে মেঘ দেবতা, একটু করুণা কি আজ এই মেয়েটির প্রতি করতে পারনা? পার না কি আজকের মত তোমার বর্ষণ বন্ধ রাখতে?

কিন্তু শিবানীর সে কথা মেঘদেবতার কানে গিয়ে বুঝি পৌঁছায় না। টিপ্ টিপ্ করে হু'চার ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হ'তে শিবানীর উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাড়াতাড়ি সে পোঁটলা খুলে বের করে

একটা বড় প্লাষ্টিকের চাদর। সেটা দ্রুত হাতে খুলে জ্বরঘোরে পড়ে থাকা শুভ্রেন্দুর পাশে শুয়ে পড়ে, ঢেকে নেয় দু'জনের দেহ। কিন্তু শীতকাতর শুভ্রেন্দুকে কি করে বাঁচাবে ও সেই বর্ষণ-শীতল হিমেল ধারার হাত থেকে ?

শিবানীর মনে একটা মতলব আসে। কিন্তু লজ্জা ও কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হয় ও সে কথা ভেবে। ওদিকে জ্বরের যন্ত্রণায় শুভ্রেন্দুর আকুলি বিকুলি। শীতে দাঁতে দাঁত ঘষা। অবশেষে মন থেকে সরমের শেষ দ্বিধা সরিয়ে দিয়ে শীতার্ত শুভ্রেন্দুকে তার বক্ষ-কবোঞ্চে আশ্রয় দিতে পক্ষীমাতার মত দু'হাতে জাপ্টে ধরে শিবানী।

আকাশ থেকে অনেকক্ষণ অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে। প্লাষ্টিক চাদরের নীচে শায়িতা শিবানী নিজের গা পেতে নেয় সে বৃষ্টিধারা। হিমেল হাওয়ার আঁচ লাগতে দেয় না শুভ্রেন্দুর পীড়িত শরীরে। একসময় বন্ধ হয় সে বর্ষণ। শিবানী ঘাড় ফিরিয়ে, মাথা তুলে, আকাশের বুকে দৃষ্টি বুলিয়ে, মেঘের অস্তিত্ব না দেখে সন্তর্পণে উঠে পড়ে। এরপর আচ্ছাদিত প্লাষ্টিক চাদরটা সরিয়ে দিয়ে শুভ্রেন্দুর শিয়র সংলগ্ন হ'য়ে বসে। নির্জীব হ'য়ে পড়েছে শুভ্রেন্দু। কানের কাছে মুখ নিয়ে তাকে ডাকে শিবানী আবেশ কণ্ঠে ঃ

—এই !

কোন সাড়া আসে না ওপক্ষ থেকে।

শুভ্রেন্দুকে ক'বার ডেকে সাড়া না পেয়ে বোঝে যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ও তাকায় তারকা খচিত আকাশের দিকে। মনে মনে ভাবে, উন্মুক্ত আকাশতলে তারাদের মিষ্টি হাসির অভিনন্দন ও জলকল্লোলের সুমধুর তানের মধ্যে তাদের মত বোধ হয় জগতের আর কোন নবদম্পতি মধু যামিনী যাপন করেনি। উৎকণ্ঠাকে ঠেলে রেখে মনে মনে খুব খুশী হয় শিবানী ! অবশেষে জয় তার হয়েছে। যদিও সে জন্য তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তবু তার নিজেরই

পরিকল্পনা যে শেষ পর্য্যন্ত রূপায়িত হয়েছে সে জন্য এ মুহূর্তে সে সত্যিই তৃপ্ত, পূর্ণ।

হঠাৎ একসময় হাই ওঠে শিবানীর। ক্লান্তি না নিদ্রার প্রতিভূ এ? ক'দিন ধরে শরীর তার ও দুটোর কোনটাই পায়নি। সারাদিন যে উৎকণ্ঠায় ও উদ্বেগে কাটিয়েছে সে, রাত্রে সেই উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগই তাকে চোখের পাতা এক করতে দেয়নি। তাই এখন এই নিরিবিলি নদীর শান্ত ব্যাজনের প্রশ্রয় পেয়ে নিদ্রা যদি চোখের পাতায় আসন পাতে, আপত্তির কিছু থাকা উচিত নয়।

কিন্তু শিবানী ত' তা পারে না। কোলে যে তার নিদ্রিত অসুস্থ স্বামী, শুভ্রেন্দু। ভেলা ভেসে চলেছে অনির্দেশ যাত্রায়—কত রকম বিপদ এসে যেতে পারে। কে তাকে তা' থেকে রক্ষা করবে শিবানী ঘুমিয়ে গেলে? না-না-না, এত কষ্টের পর, এত মূল্য দিয়ে পাওয়া মিলনে আর কোন বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারবে না শিবানী। সহ্য করবার শক্তি নেই। তবে হয় তো সে পাগল হয়ে যাবে। সতর্ক সজাগ শিবানীকে তাই অতন্দ্র দৃষ্টিতে জেগে থাকতে হবে স্বামীর শিয়রে। অন্ততঃ যতদিন না তারা নিরুদ্বেগ নিশ্চিত কোন কুল পায়।

শিবানীর চোখের পাতা থেকে একসময় তারাগুলো যেন ধীরে ধীরে মুছে যায়! যেন কান বধির হয়ে মাঝে মাঝে শুনতে পায়না জলকল্লোলের শব্দ। চেতনা কি তবে বিলুপ্ত হচ্ছে ওর? ঝিমুনি পায় যেন শিবানীর। জোর করে চোখের পাতা টেনে টেনে যেন খোলে ও। হাতে জল তুলে চোখে ঝাপ্টা মারে। সংগে সংগে দেহের চেতনা যেন সাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু সে কয়েকটি মুহূর্তের জন্য। আবার সেই ঝিমুনি, আবার সেই অচেতন অনুভূতিতে চেতনের বিলুপ্তি। অবচেতনের সঙ্গে চেতনার টাগ-অফ-ওয়ার চলে বেশ কিছুক্ষণ। শেষ পর্য্যন্ত নাছোড় নিদ্রার কাছে নত হতে হয়

শিবানীকে। বসে থাকতে থাকতেই ঘুমন্ত শুভ্রেন্দুর বুকে মাথাটা এক সময় এলিয়ে পড়ে ওর। নিশ্বাসে নিশ্বাসে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে যেন দুটি ঘুমন্ত যুবক-যুবতীর। ঘুমের কোলে অচৈতন্য ওদের বুকে নিয়ে স্রোতের টানে তরতরিয়ে ছুটে চলে ভেলাটা।

…চারদিকে শত শত নাগ-নাগিনী রোষ কষায়িত ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস শব্দে গর্জাচ্ছে। কেউই ঢুকতে পারছে না চাঁদ সদাগরের তৈরী শক্ত, পোক্ত লোহার বাসর ঘরে। এক এক ক'রে নানা শ্রেণীর নাগেরা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে হিংসার ফণা গুটিয়ে হেঁট মাথায় ফিরে আসছে। দেবীমনসার উত্তেজনাকর বক্তৃতার উদ্বুদ্ধ হয়ে অবশেষে কুটিলা কালনাগিনী তার কালো ক্ষুদ্র দেহ দিয়ে এগিয়ে এল। সর্পদেবী মনসার চোখ-মুখ আবার আশান্বিত হয়ে উঠল। তিনি ফুল্ল স্বরে বললেন :

—হ্যাঁ, তুমিই পারবে কালনাগিনী! তুমিই পারবে আমার মান বাঁচাতে। চাঁদ সদাগরের প্রতি আমার মনের সব ক্রোধ তোমার বিষের প্রতি কণিকায় সঞ্চারিত ক'রে দিচ্ছি। যা-য়া-ও!

কথা শেষ হ'তে মা মনসা খিল খিল করে প্রহেলি হাসি হেসে উঠলেন। কালনাগিনী তার ছোট দেহকে ততোধিক সঙ্কুচিত করে একমাত্র ছিদ্র পথে ঢুকল গিয়ে লোহার বাসর ঘরে! ঘুমিয়ে আছে নববিবাহিত সুস্মিত বরতনু কুমার লখিন্দর, তার বুকে নিদ্রালসে ঢলে পড়ে আছে নববধূ বেহুলা। এমন সময় কালনাগিনী তার কুটিল সর্পিল গতিতে কিলবিলিয়ে ছুটে এসে দংশন করে লখিন্দরকে! সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাজাগর কুমার বুকফাটা আর্তনাদ করে ওঠে—

"জাগ ওরে বেহুলা, সায় বেনের ঝি,
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি?"

সে কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করামাত্র চিৎকার করে জেগে উঠল আতঙ্কিত বেহুলা। …..

আর বহু লোকের কোলাহল শুনে—ব্রহ্মপুত্র বক্ষের ভাসমান

ভেলা-বাসরে আর্তনাদ করেই জেগে উঠল শিবানী। জেগে উঠেই ঘোরলাগা চোখে দেখে কি এক অজানা ঘাটে এসে ভীড়েছে তাদের ভেলা। ওর আর্তনাদে শুভ্রেন্দুরও নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়েই কলরবরত জনতাকে দেখামাত্র ত্রস্তে আতঙ্কিত শিবানী তার পোঁটলায় হাত দিয়ে দেখে নিল সেই নির্মম অস্ত্রটা ঠিক আছে কিনা!

উল্লসিত জনতা, অসমীয়া ভাষাভাষী জনতা ক্রুদ্ধ চীৎকার করে মেখলা পরা শিবানীর দিকে চেয়ে বলে ঃ

—উঠে এসো ডাঙ্গায়। বঙ্গালটা বুঝি অসমীয়া মেয়ে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে?

—না?

আর্তনাদের মত করে কণ্ঠের সকল শক্তিতে চেঁচিয়ে বল্‌তে থাকে শিবানী—

—এই ব্রহ্মপুত্রের বুকে বসে বল্‌ছি—বিশ্বাস কর, ও আমার স্বামী, আমি ওর স্ত্রী।

শুনে জনতা শতমুখে উপহাসের হাসি হেসে ওঠে।

—বিপদে পড়লে অনেকেই অমন সাজানো স্বামী-স্ত্রী হয়ে বসে!

কে একজন ভীড়ের মাঝ থেকে বলে ওঠে—

—উঠে এসো বল্‌ছি, নইলে কিন্তু বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে জলেই মেরে ফেলব তোমাদের।

কথা শেষ করে সরোষে হাতের বাঁশটা আন্দোলিত করে বক্তা।

—চল, শিবানী, ওঠাই যাক না ডাঙ্গায়।

শুভ্রেন্দু বলে শিবানীকে। শোনামাত্র শিবানী দু'হাতে শুভ্রেন্দুকে আঁকড়ে ধরে যেন অমঙ্গলের আক্রোশ থেকে রক্ষা ক'রতে চায়। সোচ্ছ্বাসে কেঁদে উঠে বলে ঃ

—না না, যাব না। ওগো, ওরা তোমায় ছিনিয়ে নেবে আমার

কাছ থেকে। না-না-না, আমি কিছুতেই ওদের হীনতার কাছে হত হ'তে দেব না তোমায়।

শিবানীর ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠের এ আর্তনাদ বিদ্বিষ্ট মনা বর্বরদের হাসির খোরাক যোগায় মাত্র।

—উঠে এসো, নইলে যাকে বাঁচাতে চাইছ তাকেই আগে লাঠি মেরে শেষ করে দেব বলছি।

নিষ্ঠুর নির্মম কণ্ঠে জনতার একজন বলে। যেন বাঙ্গলাভাষীর প্রাণ প্রাণ নয়।

তবু শিবানী সহকার সহ স্বর্ণলতার মত আঁকড়ে রাখা শুভ্রেন্দুকে শিথিল করে না। ভয়াতুর স্বরে বলে ঃ

—না, কিছুতেই ওকে মারতে পাবে না, তার আগে আমাকে মার তবে।

—কি ছেলেমানুষী করছ শিবানী, নির্মম নিয়তির হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই। চল উঠে পড়ি।

শুভ্রেন্দু বলে। শিবানীর ঠোঁটদুটো অব্যক্ত এক ব্যথায় থর্ থর্ করে কাঁপে। ঐ অবস্থায় ও পোঁটলাটা শক্ত করে বাঁ হাতে আঁকড়ে ডান হাতে শুভ্রেন্দুকে ধরে উঠে দাঁড়ায় ভেলার ওপর। ডাঙ্গার দিকে চেয়ে ও চেঁচিয়ে বলে ঃ

—তোমরা উঠে যাও ঘাট থেকে, তারপর আমরা আসছি।

—উহুঁ, সেটি হচ্ছে না, তারপর তোমরা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালাও আর কি।

—তোমাদের মত ইতর পশু নই আমরা, যে মিথ্যে বলব।

জলন্ত চোখে চেয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলে শিবানী। লোকগুলো পরস্পর কি যেন পরামর্শ করে। তারপর তাদের একজন বলে ঃ

—আচ্ছা আমরা উপরে চলেই যাচ্ছি। শিগ্গীর উঠে এসো তোমরা।

পরস্পর আলোচনা করতে করতে লোকগুলো উঠে যায়।

শিবানী শুভ্রেন্দুর মুখের দিকে পিপাসিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সাধ-ভরে দেখে তাকে! চোখের তারায় ওর সে কী আকাঙ্খা অবশেষে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে স্ফুরিত অধরে বলে:

—আমি রাক্ষসী, ডাইনী, তোমাকে মেরে ফেল্‌লাম। ওগো কেন আমি তোমায় এমন করে নিয়ে এলাম!

শিবানীর বিলাপিত কান্না আকাশে বাতাসে যেন সীমাহীন ব্যথা ছড়িয়ে দেয়।

—আঃ, ছেলেমানুষী করো না শিবানী। তুমি কেন মারবে আমায়, তুমি আমাকে বাঁচাবার যত চেষ্টা করেছ কোন বাঙ্গালী মেয়ের কিছুতেই এতটা দুঃসাহস হতো না।

—ওগো, ওরা তোমায় কি কিছুতেই ছেড়ে দেবে না—যদি তোমার বদলে ওদের আমায় মেরে ফেলতে বলি। তবে ত' তুমি অন্তত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পাবে। তোমার মা-বাবা কত আশা নিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তোমায়।

—লক্ষ্মীটি, স্থির হও, অমন করোনা, শিবানী। Please. ওরা উপহাস করবে, টিটকিরি দেবে। ওদের নিষ্ঠুরতা সইতে পারি আমি শিবানী, কিন্তু ঐ অট্টহাসি নয়, উপহাস নয়।

—দেখি, তোমার গায়ে জ্বর আছে কি না?

কান্নার বেগে স্ফুরিত অধরে ছেলে মানুষের মত বল্‌তে বল্‌তে শুভ্রেন্দুর কপালে হাত দিয়ে তার জ্বর দেখে শিবানী। ওর এ ব্যবহারে ক্ষীণ হাসে শুভ্রেন্দু। আত্মগত কণ্ঠে সে বলে:

—যে দেহে একটু পরে আর প্রাণের স্পন্দন থাকবে না, সে দেহে জ্বরের তাপ থাকলে কি এমন ক্ষতি হবে বল ত?

শুভ্রেন্দুর একথা শুনে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে শিবানী:

—না—না ও কথা তুমি মুখে এনো না গো, মুখে এনো না।

—মুখে কি সাধে আনছি শিবানী, আনতে বাধ্য হচ্ছি। যে আমাকে বাঁচাবার জন্য তুমি হোষ্টেলের নিরুদ্বেগ জীবন ছেড়ে এসে

কত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সইলে, যে মিলিত জীবনের স্বপ্নঘোরে সব ছেড়ে চলে এলে, সেই ...

মুখের কথা শেষ করতে পারে না শুভ্রেন্দু, কান্নার একটা ডেলা যেন ওর কণ্ঠ আটকে ধরে। শুভ্রেন্দুই শিবানীকে ধরে নামায় ভেলা থেকে। ওরা হাত ধরাধরি করে ঘাটের ওপরে উঠে আসামাত্র লোক-গুলো ওদের দিকে বেগে এগিয়ে আসতে থাকে। তা দেখে শিবানী মুহূর্তে যেন ভিন্নরূপ ধারণ করে। ভেঙ্গেপড়া কান্নাকরুণ মেয়েটিতে যেন এক অপূর্ব তেজ এসে ভর করে! দেখতে দেখতে ও ভীষণা হ'য়ে ওঠে। হাতে উদ্যত রিভালভার নিয়ে ওদের দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে কঠিন স্বরে বলে :

—খবর্দ্দার, তোমরা কেউ এগোবে না, তবে আমি গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হব। তোমাদের যা বলবার আছে আমায় বল, আমি তার জবাব দিচ্ছি।

রিভালভার দেখে জনতার মধ্যে দ্বিধা জাগে, বিশৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে যেন ওরা। তবু একজন অসমীয়াভাষী যুবক সাহসে ভর ক'রে প্রশ্ন করে শিবানীকে :

—কোথা থেকে আসছ তোমরা ?

উত্তরে শিবানী অকপটে ওদের গাঁয়ের নাম বলে।

—তোমাকে নিয়ে ঐ বঙ্গালটা বুঝি পালিয়ে যাচ্ছে ?

—না, মিথ্যে কথা, আমাকে নিয়ে ও পালিয়ে যাচ্ছে না, আমিই ওকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি।

চীৎকার করে দৃঢ় স্বরে বলে ভীষণা শিবানী।

—পালাচ্ছ কেন ?

—পালাচ্ছি কেন ? পালাচ্ছি এই জন্য যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনেক মানুষই রাতারাতি ঠিক তোমাদেরই মত পশু হয়ে গিয়েছে।

শিবানীর একথা শুনে জনতা আগুন-ঝরা গলায় পরামর্শ

করে পরস্পর। কি যেন একটা ইঙ্গিতে ওরা সবাই উদ্বুদ্ধ হয়। পরক্ষণেই ওরা হাতে হাতে রাস্তার খোয়া তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে তাদের দুজনের দিকে সেগুলো নিষ্ঠুরভাবে ছুঁড়তে শুরু করে। আকস্মিক এ বিপদে শিবানীরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে শিলাবৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য ছুটে পালাবার চেষ্টা ক'রবার আগেই একটা কালো কঠিন খোয়া এসে শুভ্রেন্দুর কপালে লাগে। সে 'উ মাগো' বলে কপাল চেপে ধরে বসে পড়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে তার ক্ষতস্থান থেকে। মুহূর্তে শুভ্রেন্দুর কপাল ও কপোল বওয়া রক্তে সুকুমার মুখ হয় বিকৃত। তার রক্তবিকৃত সে মুখ দেখামাত্র শিবানী যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ওর মাথায় চিন্তাসূত্রগুলো কেমন উত্তপ্ত হয়ে যায়, কেমন যেন একটা প্রতিশোধ স্পৃহা ওর মস্তিষ্কের চিন্তাধারা আচ্ছন্ন করে। পরক্ষণেই ও হাতের রিভালভারের ট্রিগার টিপে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে হিংস্র উল্লাসে ওদের দিকে ধাবিত হ'য়ে বলে :

—অসমীয়া মারিম, অসমীয়া মারিম।

শিবানীব এলো পাথারি গুলিতে পলায়নপর জনতার দু'চার জনের গায়ে চোট লাগে। কিন্তু শিবানী ততক্ষণে ক্রমেই স্বাভাবিক চিন্তা হারিয়ে ফেলছে। একটা হিংস্র উল্লাসে মেতে উঠছে যেন ওর সারা সত্তা, বহু ধকল সওয়া তার সারা মন। দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সে গমকে গমকে গুলি ছুঁড়ে যায়। ত্রাসত্রস্ত মানুষগুলো ছুটতে থাকে। কিন্তু এক সময় গুলি শেষ হয়—বার বার ঝাঁকানি দিয়ে রিভালভার তাক করেও আর গুলি ছোঁড়া যায় না। শিবানীর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে হয় না আর কোন শব্দ।

রিভালভার নিঃশব্দ হওয়ার ব্যাপারটা বুঝে ফেলামাত্র পলায়নপর জনতা ঘুরে দাঁড়ায়। মার মার রবে ফিরে এসে ওরা ছেঁকে ধরে ওদের। শিবানী ততক্ষণে দু'হাতে শুভ্রেন্দুকে আঁকড়ে ধরেছে।

ভীষিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইছে। কয়েকজন দুর্বৃত্ত ওর বাহু-বন্ধন থেকে উন্মত্ত উল্লাসে তাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলে শিবানী তাদের আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে পর্যুদস্ত করতে ব্যর্থ প্রয়াশ পায়।

অসহায় শিবানীর বাহু-বন্ধন থেকে জহ্লাদ উল্লাসে ওরা শুভ্রেন্দুকে ছিনিয়ে নেওয়ামাত্র ওর মাথাটায় সব কিছু চিন্তা যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে যায়। খালি হাতটা সম্মুখের দিকে প্রসারিত করে ধরে রিভালভারের ট্রিগার টেপার মত ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে বলে ওঠে:

—ঠাস্, ঠাস্—অসমীয়া মারিম। বেঙ্গলি মারিম।

পরক্ষণেই খিল খিল করে প্রহেলী হাসি হেসে উঠে অকারণ ছুটতে থাকে ও উর্দ্ধশ্বাসে। চোখে মুখে তখন ওর ভীত বিহ্বল অস্বাভাবিক এক অভিব্যক্তি।

পণ্ডিত নেহ্রু, তুমি পঞ্চশীলকে এ যুগের জাতিগুলোয় পরস্পরের সহাবস্থানের মহামন্ত্র বলে চালু করবার কত না চেষ্টা করেছ ও করছ, কিন্তু তোমার দেশের লোক যেখানে তোমারই শাসনকালে পরস্পরের সংগে স্ব স্ব ধর্মমত ও সংস্কৃতি নিয়ে নিরুদ্বেগে বসবাস করতে পারছে না, সেখানে বিদেশের রাষ্ট্রগুলি এই পঞ্চশীলে আস্থা রাখবে, এটা কি করে আশা কর? কম খেসারৎ দিয়েছ তুমি পঞ্চশীল-এর পেছনে? চীন তোমার দুর্বল নীতির জন্যই মূলত ভারত ভুখণ্ড করেছে আক্রমণ, দালাইলামাকে তোমার দুর্বল নীতির বলি হয়ে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে এসে পরবাসী হতে হয়েছে। তোমার আশ্বাসেই যে দালাইলামা সেবার দেশে ফিরে গিয়েছিল, সেই দালাইলামাকে তুমি তার মর্য্যাদা মত স্বাধীন ভাবে ভারতে বাস করতে দিয়েছ কি? তোমার দুর্বল নীতি চীনকে তোষণের নামান্তর করেও তাকে ভারতসীমান্ত ছাড়া করতে পারেনি পারবে বলেও আমি মনে করি নে। রাজনীতি দুর্বলের নীতি নয়—এ ক্ষাত্র নীতি। এখানে জোড়া-তালিতে চল্লে—তালির পর তালি বেড়েই যায়। তাই প্রয়োজন দৃঢ়তার, প্রয়োজন দ্বিধাহীন নীতি নির্দ্ধারণের। লোকে বলে শান্তির জন্য 'নোবেল লরিয়েন্ট' হ'বার আশায় তুমি এই ভাবে একটার পর একটা ভুখণ্ড বা কোটি কোটি অর্থ উপঢৌকন দিচ্ছ পাকিস্তানকে। ওরা কাশ্মীর প্রশ্নে বেয়নেট ও বন্দুক তাক করলেও তুমি তার পরিবর্ত্তে প্রেমানন্দে বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছ। এক শ্রেণীর লোকের এই গুঞ্জন কি সত্য নেহ্রু?

সত্যিই কি তুমি তোমার একটি খেয়ালের জন্য সমগ্র জাতিকে দিয়ে দেওয়াচ্ছ খেসারতের পর খেসারৎ ?

তোমার শাসনে সুলোকের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে বাঁচা দায়। লোকে যতক্ষণ না ঘোঁট পাকাচ্ছে—যতক্ষণ না 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে বড় রকমের কোন গণ-ডেপুটেশন-এর আয়োজন করছে, ততক্ষণ তোমার শাসন কারও সুস্থ দাবীতে কর্ণপাত করে না। তুমি কি মনে কর ভদ্র নিরুপদ্রব জীবন যাপনে আস্থাশীল মানুষরা কথায় কথায় মিছিল বের করবে ? 'মিছিলের শহর কলকাতা' ব'লে যে তুমি উপহাসবাণী উচ্চারণ করেছিলে—সেই তোমার শাসনযন্ত্রই যে বলে মিছিল করে সংঘবদ্ধ না হলে সরকারের বধির কর্ণে কোন সুস্থ আবেদন পৌঁছায় না।

যে দেশের রাষ্ট্রনায়করা একটার পর একটা ভুল করেও 'গদি' ছেড়ে দেয় না—সে দেশের শাসন-যন্ত্র কি করে অ-বিকল থাকে ? সবাই জানে—এ শাসনে কাউকেই ভয় করবার নেই—'সরি' বল্‌লেই তরে যাওয়া যায় সব ভুল-ভ্রান্তি করার অন্যায় থেকে।

তুমি যখন অসমীয়াদের গুণগানে পঞ্চমুখ, একশ্রেণীর অসমীয়া নেতার গায়ের অপরাধের ধূলো ঝাড়তে ব্যস্ত, কই তখন ত একটি কথাও বল্‌লে না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে হরেশ্বর গোস্বামীকে রক্ষা করতে যে দৃঢ়তা দেখায়, সে বিষয়ে ? বল্‌তে ত' পারলে না সত্যাশ্রয়ী মহাত্মার শিষ্য যে আসামে যদি এই ভাবে দৃঢ়তা দেখাত শাসন কর্তৃপক্ষ, তা হলে বহু অমূল্য জীবন নষ্ট হ'ত না, নারীরা হ'ত না লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা, শিশুদের ভয়ার্ত চীৎকার ও বাঙ্গলাভাষী ভারতীয়দের ভাগ্যজ্বলা আগুনের লেলিহান শিখায় আসামের আকাশ বাতাস হত না লালে লাল।

তাই বলি পণ্ডিত নেহ্‌রু, তুমি ভুল করছ, ভুল করছ তুমি মাত্র একটা নয়, দুটো নয়—অনেক, অনেক।

এতে তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়—যে তুমি বিদেশে নানা

রাষ্ট্রের বহু মানুষের বন্ধু, সেই তুমিই তোমার আচম্বিত নীতির জন্য দিনের পর দিন দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধার আসন থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। এ যে তোমার কত বড় পরাজয় নেহ্‌রু! তাই বলি নেহ্‌রু, অনেক ভুলের মালা গলায় পরেছ, এবার সে মালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে হয় দৃঢ় হও, শক্ত হাতে শাসন যন্ত্র চালাও, নতুবা মন্ত্রীত্বের মসনদ হেলায় ছেড়ে নেমে এসো, নেমে এসো জনতার মাঝে, তাদের মনের মাঝে ধ্বনিত করো, রণিত করো নবজাগরণের সঙ্গীত। যে সঙ্গীতের তালে তালে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সজাগ হ'য়ে ভারতকে তার বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে সার্থকতার পথে এগিয়ে নেবায় সঙ্কল্প নেবে। নেহ্‌রু, অনেক ভুল করেছ—এ শুধু আমার একার স্বগতোক্তি মাত্র নয়, এ গণতন্ত্রী দেশের অনেকের মতেই এ সত্য উক্তি।

একশ্রেণীর অসমীয়া ভাষাভাষী ভ্রান্তপথযাত্রী দুর্বৃত্তবৃন্দ হৈ-হল্লা করতে করতে শুভ্রেন্দুকে টেনে হিঁচড়ে অদূরের গ্রামের দিকে নিয়ে চলে গেল। ওদের সোরগোলের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলে পথের দু'দিকের নিশ্ছিদ্র বনদেশ থেকে বেশ ক'জন ভয়ার্ত নারী-পুরুষ, কিশোরী-বালিকা একে একে বেরিয়ে এলো। লোকালয় ছেড়ে পলায়নপর মানুষগুলো বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বনের কাঁটা গাছের আচড়ে ওঁদের দেহের এখানে ওখানে রক্ত ঝরছে। ওদের সবার চোখেমুখেই ভয় ভয় ভাব। কপালে কপালে উদ্বেগের কুঞ্চন। দুর্বৃত্তরা শিবানীর যে হাল করে গেল—তার বুকে যে আঘাত হেনে গেল শুভ্রেন্দুকে ছিনিয়ে নিয়ে, তা' সবই দেখেছে ওরা। আর তারা তাদের ভয়াল অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে শিবানীর ওরা কি সর্বনাশ করল। ওদের দেখে শিবানী তার অসুস্থ মস্তিষ্কের নির্দেশে ভীতচকিত হয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ওদের সঙ্গের মেয়েরা এগিয়ে গিয়ে "বাবা বাছা" বলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে সঙ্গে যেতে

রাজী করালো। অবশেষে ওরা বিহ্বল শিবানীকে সংগে নিয়ে ওদের পলায়নের বর্বরতা এবং ভীষণতার পথে এগিয়ে চলল। পালাতে হবে ওদের নিষ্ঠুরতার তাণ্ডব-নৃত্যে নেচে ওঠা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছেড়ে।

কিছুটা দূরেই রেল ষ্টেশন—ওদের গতি সেই দিকে। নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ওরা পালাতে চায় মৃত্যু মহোৎসবে উল্লসিত আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে। শিবানী আজ ওদের সহযাত্রী, হোক সে অসমীয়াভাষী মেয়ে—তবু সে সর্বহারা—তার আপন অধিকার থেকে সেও বাঙ্গলাভাষীদের মতই চ্যুত, তাড়িত, বঞ্চিত।

চল্‌তে চল্‌তে এক এক সময় হঠাৎ থেমে পড়ে শিবানী। তারপর অসুস্থ মস্তিষ্কের খেয়ালে ডান হাতটা সামনের দিকে প্রসারিত ক'রে ধরে চোখে মুখে একটা অদ্ভুত কাঠিন্য এনে বলে ওঠে:

—ঠাস্‌, ঠাস্‌! বেঙ্গলী মারিম! অসমীয়া মারিম!

এ কথা ব'লে আবার ও শান্ত স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। আবার স্বাভাবিক ও সহজ হ'য়ে পথ চলে।

রেল ষ্টেশনের আর বেশী বাকি ছিল না। ছিন্নমূল মানুষগুলোর ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে—কেননা এইটুকু পথে আর কোন উন্মত্ত জনতা মৃত্যুর পরোয়না এনে তাদের গতিরোধ করেনি।

হাজার হাজার বাংলাভাষী উদ্বাস্তু আজ আসাম রাজ্যের মৃত্যু-সীমান্ত ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে সন্নিহিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে। ট্রেনের কামরাগুলো ভয়ার্ত, হৃতসর্বস্ব, বিহ্বল, ছিন্নমূল মানুষে ঠাসা। একবার ওদের অনেকেই উনিশ শ সাতচল্লিশে পাওয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে বয়ে ভারতীয় নাগরিক হ'তে ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছিল। সেই ওরা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে সংবিধান স্বীকৃত মর্য্যাদা পেয়েছে। তবু ভারতের সীমানাতেই ওদের আবার সাজতে হয়েছে পুনরুদ্বাস্তু।

যে পশুত্বপরিকীর্ণ রাজ্য ছেড়ে কুকুর বেড়ালের মত তাড়া খেয়ে ওরা চলে আসছে সে রাজ্যের পলিটিশিয়ানদের এতে লজ্জা নেই। সে রাজ্যের এক শ্রেণীর ছাত্র-গুণ্ডারা এতে শ্লাঘা বোধ করেছে ও করছে। আর যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ওরা দাবি করতে পারে পূর্ণ নিরাপত্তা, সেই কেন্দ্রীয় সরকার দলীয় স্বার্থেব তৌলে এমন নির্মম বীভৎস ঘটনার বিচার বিবেচনা করার গা-বাঁচানোয় ব্যস্ত। তাই এই সদ্য পুনরুদ্বাস্তু হতভাগ্যদের ভার নিতে এগিয়ে এলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারেব ত্রাণ বিভাগ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সজ্জন সাধুবৃন্দ এবং পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রসের সেবকবৃন্দ ও অন্যান্য আরও কটি ছোট বড় সেবা প্রতিষ্ঠান।

উদ্বাস্তুদেব জন্য সারি সারি ছাউনি পড়েছে বঙ্গ-আসাম সীমান্ত সহর আলিপুর দুয়ারে। ছাউনির মাঝে মাঝে সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলোব অফিস-ক্যাম্প। তাতে টাঙ্গানো আছে প্রতিষ্ঠানেব নামোৎকীর্ণ লাল বা সাদা ফেষ্টুন। ভলান্টিয়াররা ষ্টেশনের দিক থেকে আসামেব 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে তাড়া খাওয়া নিঃস্ব নরনাবীদের দফে দফে সঙ্গে এনে পুলিশ ও ত্রাণবিভাগেব অফিসারদেব কাছে নাম লিখিয়ে ছাউনিতে নিয়ে যাচ্ছে।

ভলান্টিয়ারদের কেউ কেউ লঙ্গরখানাব সামনে সারবন্দি হয়ে দাঁড়ানো সব থেকেও ভিক্ষুক হওয়া মানুষদের হাতের পাত্রে খীচুড়ি পরিবেশন করছে। কোন কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের তাঁবু থেকে বাচ্চাদের জন্য বিলোন হচ্ছে পাউডার গোলা দুধ। কোন ক্যাম্প থেকে আবার বিতরণ করা হচ্ছে চাপাটি-তরকারী। কোথাও বা এক বস্ত্রে চলে আসা নারীপুরুষদের মধ্যে বিলোনো হচ্ছে শাড়ী-ধুতি। চারদিকে অদ্ভুত এক কর্মব্যস্ততা। আর্তের সেবায় দয়ার্দ্র হৃদয় মানুষের মহত্তম প্রচেষ্টা।

হঠাৎ এক সময় ত্রাণবিভাগীয় ও পুলিশ কর্মচারীরা শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। কেননা নবউদ্বাস্তুদের অবস্থা পরিদর্শনে কলকাতা থেকে

এসেছেন ত্রাণ বিভাগের সেক্রেটারী সিভিলিয়ান মিঃ বাসু। সঙ্গে তাঁর জেলা ও মহকুমা শাসক, পুলিশের বড়কর্ত্তা, জেলা মেডিক্যাল অফিসার প্রভৃতি। অফিসারবাহিনীসহ সিভিলিয়ান মিঃ বাসু ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন ভয়নীল মানুষগুলোর নাকাল হওয়া অবস্থা। অফিসাররা পরস্পর আলোচনা করেন, কী ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হলে তবে মানুষ নিজের আশ্রয় ও জিবীকা নিশ্চয়তা ছেড়ে এভাবে চলে আসতে পারে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ে।

ত্রাণ-বিভাগীয় অফিসারদের কাছে সেবাব্রতীরা তখন সবে আসা একগাড়ী যাত্রীকে নিয়ে এসেছে নাম-ধাম লেখাতে। সেখানে এগিয়ে গিয়ে মিঃ বাসু শুনতে চেষ্টা পান নিজ নিজ মুখে বলা ওদের করুণ কাহিনী। হঠাৎ ওঁর দৃষ্টি ঠিকরে পড়ে ওদের মধ্যে চোখে মুখের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিবানীর ওপর। দেখা-মাত্র যেন মিঃ বাসু চম্‌কে উঠলেন। অনেকক্ষণ তাঁর দৃষ্টি সরাতে পারেন না শিবানী নামের মেয়েটির মুখ থেকে। তাঁর মননিভৃতে তখন অবচেতন মনের অথৈয়তা থেকে একটা বেদনাময় স্মৃতি তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে ভেসে উঠেছে। হ্যাঁ, অবিকল এক। এমন কি চিবুকের ঠিক বাঁ দিকের তিলটা পর্য্যন্ত।

মিঃ বাসুর একমাত্র সন্তান মলি। সাতরাজার ধন এক মাণিকের মত যেন মহা আদরিণী সে মেয়ে। বাপ-মায়ের একমাত্র স্নেহ রাখবার আশ্রয়স্থল। আদর আর আদর। সোহাগ আর সোহাগ। কোন সময়ই মিসেস বাসু মেয়েকে চোখের আড়াল করেন না। মিঃ বাসু কর্মস্থল থেকে ফিরে এসেই মেয়েকে নিয়ে পড়েন। সঙ্গে আনেন পুতুল-লজেন্স-টফি। আজ যে খেলনাটা নতুন, কাল সেটা আর তার জীর্ণতা নিয়ে খুকু মলির মন পায় না।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠে মলি। শৈশব থেকে বাল্য, বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন। এই যৌবনচঞ্চল যুবতীকে উপযুক্ত পাত্রে পাত্রস্থ করতে হবে। সিভিলিয়ান মিঃ বাসু এমন

সমাজের মানুষ যে সমাজে তাঁর মেয়ের উপযুক্ত পাত্র পেতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

মহাধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল মলির।

মিঃ ও মিসেস বাসুর হৃদয়-সমুদ্রে বিচ্ছেদের ঝড় বইয়ে মলি স্বামী-সঙ্গিনী হ'য়ে চলে গেল বিদেশে।

ক্রমে ক্রমে দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর বিলীন হ'য়ে যায় কাল সমুদ্রে। আসন্ন সন্তান সম্ভবা মলিকে মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় নিয়ে আসা হল। সব সময় মলিকে আগলে থাকেন মিসেস বাসু। দিনরাত তাকে খুশী রাখার কত চেষ্টা। প্রসূতির পরিচর্য্যার জন্য বিদেশে পাশ করা লেডিডাক্তারের তত্বাবধানে দু'জন অভিজ্ঞ ধাত্রী দিনরাত কাজ করে। পান থেকে চূণটুকু খসবার উপায় নেই।

অবশেষে দিন ঘনিয়ে আসে। ফরেন সার্ভিসে কাজ করা জামাই 'কেবল্' পেয়ে ছুটে আসে ফ্লাই ক'রে। এক বর্ষণ-ক্লান্ত রাত্রে প্রসববেদনায় আচ্ছন্ন হয় মলির সারা দেহ। শহরের সবকটি বড় বড় বিষেশজ্ঞ ডাক্তারকে নার্সিংহোমে ডাকা হ'ল নির্বিঘ্নে প্রসব করাবার তদারক করতে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক পথে পথ ক'রে মাটির পৃথিবীতে এলো না সে শিশু। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা সমবেত সিদ্ধান্তে স্থির করেন অপারেশনে করতে হবে। সিজারিয়ান অপারেশান।

ব্যবস্থার কোন ত্রুটি থাকে না।

লেবার রুমে ছুরি-কাঁচি হাতে ডাক্তাররা আবার পরামর্শ ক'রে সিদ্ধান্ত নেন যে দু'জনকে বাঁচানো যাবে না। বিশেষ করে শিশুকে বাঁচানো সহজ হবে কিন্তু প্রসূতিকে নয়। মিঃ বাসু, মিসেস বাসু ও মলির স্বামী সমবেতভাবে মলির প্রাণভিক্ষা চায় ডাক্তারদের কাছে। চেষ্টায় লেগে যান তাঁরা চিন্তিত মুখে। কিন্তু কোন ত্রুটি না থাকা সত্বেও শেষ রক্ষা হয় না। বিষণ্ণ মুখে ডাক্তাররা লেবার রুম থেকে বেরিয়ে যান ব্যর্থতার বোঝা বয়ে।

সংবাদটা শোনামাত্র পাগলিনী প্রায় মিসেস বাসু মলির নিস্পন্দ নিথর দেহের উপর আছড়ে পড়ে সংজ্ঞা হারান। আর মিঃ বাসু আকস্মিক এ আঘাতে যেন পাথর হ'য়ে যান!...

ভাবতে ভাবতে মিঃ বাসুর চোখ ফেটে যেন জল আসতে চায়। সরকারী কর্মচারীরা সাহেবের ভাবান্তর লক্ষ্য করে পরস্পরের মুখে চাওয়া চাওয়ি করে। উদ্বাস্তু জনতার একটি অংশ কৌতূহলী হ'য়ে অফিসার পরিবৃত মিঃ বাসুকে চক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ায়। বেগতিক বুঝে জেলা শাসক মিঃ বাসুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় ডাকেন:

—স্যার!

শোনামাত্র মগ্নাবস্থা থেকে যেন চেতনে ভেসে ওঠেন মিঃ বাসুর মন। ফিরে আসে সম্বিৎ। বলেন:

—এই মেয়েটিকে একবার কাইগুলী ইন্সপেকশন বাংলোয় আমার কাছে নিয়ে আসবেন। আর সম্ভব হ'লে ওর সঙ্গীদের কাছ থেকে ওর হিষ্ট্রিটা জেনে নেবেন। কি করে এলো, কেন এলো, কোথা থেকে এলো—এই আর কি।

—আচ্ছা স্যার।

সম্মতি দেয় নিম্নতন অফিসার। আশ্বাস পেয়ে আশ্বস্ত হওয়া সিভিলিয়ান মিঃ বাসু আবার পরিদর্শনের কাজে ক্যাম্পে ক্যাম্পে এগিয়ে যান। তাঁকে অনুসরণ ক'রে এগিয়ে চলে এক পাল ছোট বড় অফিসারবাহিনী।

তহিততম্বির শেষ করে মিঃ বাসু যখন ইন্সপেক্শন বাংলোয় ফিরে আসেন তখন অতি কষ্টে দু'তিনজন সরকারী কর্মচারি শিবানীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একরকম বল প্রয়োগ করেই ধরে আনে। মিঃ বাসু ওর কাছে এগিয়ে আসেন। এমন সময় শিবানী আবার তার অসুস্থ মস্তিষ্কের নির্দেশে ডান হাতটা সামনে প্রসারিত করে। মুখের ভাব কঠিন করে। পরক্ষণেই হিংস্র স্বরে বলে ওঠে:

—ঠাস্—ঠাস্—ঠাস্। বেঙ্গলী মারিম, অসমীয়া মারিম।

শিবানীকে উদ্ধার ক'রে আনা উদ্বাস্তুদের জনৈক মুখপাত্র প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ দেয়। কিন্তু সে শিবানীর নাম বা অন্য কোন পরিচয় জানাতে পারে না।

মিঃ বাসু সহানুভূতিভরে শিবানীর কাছে এগিয়ে আসেন। ওর মাথায় আশ্বাসের হাত বুলিয়ে দেন। স্নেহসিক্ত কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করেন ঃ

—তোমার নাম কি মা?

শুনে শিবানী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার ডাগর ডাগর চোখ মেলে চায়। কপালের রেখায় কুঞ্চন পড়ে। চোখের মণি ঘুরায় ও। দৃষ্টি যেন ভাষাহীন, শূন্য। মুখে ভীতিবিহ্বল ভাব ভেসে ওঠে। পরক্ষণেই ভয়ার্ত্ত চীৎকার ক'রে বলে ওঠে ঃ

—না-না, যেওনা, তোমায় ওরা মেরে ফেলবে, মেরে ফেলবে!

কথার শেষে হাউ হাউ করে ডুকরে কেঁদে ওঠে শিবানী।

আলিপুরদুয়ার থেকে একটি সরকারী জীপ হু-হু বেগে ছুটে চলে উত্তরবঙ্গের সুপরিচিত বিমানবন্দর বাগডোগরার দিকে। সিভিলিয়ান মিঃ বাসু তাঁর পরিদর্শনের কাজ শেষ করে এবার একা ফিরছেন না ক'লকাতায়। সঙ্গে অসুস্থ মস্তিষ্ক শিবানী। গাড়ী চলার ঝাকানির দোলায় শিবানী ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়া শিবানীর মাথাটা ঢলে পড়েছে মিঃ বাসুর কাছে। অতি যত্নে বাহু বেষ্টনে তিনি সাবধানে ধরে আছেন শিবানীকে। পাছে পথে শিবানী বেশীরকম উত্তক্ত করে, তাই তিনি নিজের বেয়ারা আর্দ্দালী ছাড়াও দুজন অতিরিক্ত সরকারী লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মোটর-পথে তাদের তেমন সহায়তার প্রয়োজন হল না।

নির্দিষ্ট জীপটা শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছুলে মিঃ বাসু মিসেস বাসুকে দম্‌দম্ এয়ারোড্রোমে আসতে বলে একটা টেলিগ্রাম

মুসাবিদা করে সঙ্গে আসা জনৈক ত্রাণ বিভাগীয় কর্মীকে দিয়ে বলেন :

—এটা এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করে দিয়ে আপনি এয়ারোড্রোমে চলে আসুন, কেমন ?

—আচ্ছা স্যার।

সম্মতি জানিয়ে নেমে চলে যান ভদ্রলোক। আরও কিছুটা পথ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে সরকারী জীপ গাড়ীটা বাগডোগরা এয়ার ফিল্ড-এ এসে হাজির হয়।

আকাশে উড়ে আসা একটা কারগো প্লেনের তীব্র শব্দে শিবানীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। হঠাৎ চমকে উঠে জেগে ওঠে ও। জেগেই শিরদাঁড়া সোজা ক'রে হুডখোলা জীপের মধ্যে উঠে দাঁড়ায়। কঠিনভাবে ডান হাতটা সামনের দিকে টানাটান করে ধরে বলে ওঠে :

—ঠাস্! ঠাস্! বেঙ্গলী মারিম। অসমীয়া মারিম!

জীপের অন্যান্যদের মত মিঃ বাসুও শিবানীর মুখে দৃষ্টি উঠিয়ে চেয়ে ছিলেন এতক্ষণ। তিনি এবার উঠে দাঁড়িয়ে শিবানীর পিঠে সান্ত্বনার হাত চাপড়িয়ে বলেন :

—মারে, এবার নামতে হবে। চল্ নেমে পড়ি।

চোখ পাকিয়ে ভাষাহীন শূন্য দৃষ্টিতে মিঃ বাসুর চোখ মুখে দেখে নিয়ে কি ভেবে যেন শিবানী যান থেকে নেমে পড়ে। মিঃ বাসুও যান ত্যাগ করে শিবানীর পাশে এসে তাকে ডান হাতে স্নেহভরে জড়িয়ে ধরে প্রতীক্ষালয়ের দিকে এগিয়ে চলেন।

সগর্জিত নির্দিষ্ট প্লেনটা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দমদম্ বিমান বন্দরের রানওয়েতে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে ছুটে চলে। অবশেষে তার গতি হয় স্তব্ধ। এয়ারোড্রোমের কর্মীরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঁচু সিঁড়িটা নিয়ে এসে যথাস্থানে লাগিয়ে দেয়।

একে একে যাত্রীরা নেমে আসেন ব্যোমযান থেকে। মিঃ বাসুও শিবানীসহ নামেন এক সময়। নেমে এগিয়ে চলেন সেই দিকে—যেখানে অনেকগুলি অধীর মুখ-চোখ প্রতীক্ষারত। প্রতীক্ষমানদের মধ্যে মিসেস বাসুর মুখটা মিঃ বাসুর চোখে পড়ামাত্র তাঁর মনের মধ্যে একটা দুর্বলতা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

শিবানীসহ এগিয়ে মিসেস বাসুর মুখোমুখী এসে যান তিনি। শিবানীকে দেখামাত্র মিসেস বাসুর মাতৃহৃদয়ের অথৈয়ত্তায় সে কি এক আনন্দের তোলপাড়! ক্রমে ক্রমে সেই আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়ে তাঁর চোখে মুখে। ঠোঁটদুটো স্পন্দিত হয় আবেগে। ধীরে ধীরে প্রসারিত করেন আশ্বাসভরা মাতৃবাহু। হারানিধি ফিরে পাওয়ার মত শিবানীকে বুকে টেনে নেন জননী হৃদয়ের অসীম আকুতিতে। এমনই চেয়েছিলেন মিঃ বাসু। এই রকম একটা মিলন মধুর দৃশ্য কল্পলোকে রূপ পেয়েছিল বলেই তিনি শিবানীকে সঙ্গে এনেছিলেন। ভেবেছিলেন পৌঢ়া মিসেস বাসু দীর্ঘ বার বছরে যে শোকের উষর মরুভূমিতে দিগভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেখানে মলি সদৃশ শিবানীর মুখ বুঝি সৃষ্টি করবে ক্ষীণ আশ্বাসের ওয়েসিস। তাই মিসেস বাসুর মাতৃবুকে আলিঙ্গিত শিবানীর দিকে চেয়ে সিভিলিয়ান মিঃ বাসুর চোখ কেন যেন দুটো আপনা থেকেই আর্দ্র হ'য়ে ওঠে।

আমার মনের একান্ত প্রকোষ্ঠে, পণ্ডিত নেহ্‌রু, তোমার শাসনে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের যে হতাশ চিত্র ভেসে ওঠে তাইত স্বতোৎসারিত হচ্ছে আমার স্বগতোক্তিতে। শান্তিপূর্ণ অহিংস সংগ্রামে যে স্বাধীনতা পেয়েছে ভারত তার শাসনতরণীর কর্ণধাররা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যে বাঙ্গালী ও বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের যজ্ঞানল প্রজ্বলিত করেছিল নিজের বিপ্লবী সত্তাকে 'ওঁ স্বাহা' বলে আহুতি দিয়ে, সেই বাঙ্গালীকে আজ শাসন ও শোষণে কোথায় ঠেলে দিচ্ছ তোমরা, পণ্ডিত নেহ্‌রু? এত বড় মারণ-যজ্ঞ করে যে বাঙ্গলা-ভাষীদের ভীষিত করে তাড়ালো অসমীয়া রাজনীতিকরা সেই বাঙ্গলাভাষীদের সাহায্যের জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন্ যুক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার উপুড়হস্ত না হয়ে আছে? খণ্ডিত বাংলার বুকে চাপা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে যখন পশ্চিমবঙ্গের শাসন ও সমাজ টলটলায়মান, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের মনে কি একটুও করুণা জাগল না সহযোগিতার হাত বাড়াতে? কেন? কোন্ মানসিকতায় কেন্দ্রীয় ত্রাণবিভাগ আজও এগিয়ে আসেনি আসাম আগত উদ্বাস্তুদের সাহায্যে এগিয়ে? কেন কেন্দ্রীয় সরকার আজও আসাম সরকারকে বলতে সাহসী হয় না যে, যে বীভৎস হত্যালীলার ভয়ে ভীত হয়ে অসমীয়া বাঙ্গালীরা পালিয়ে এসেছে, তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেই রাজ্যেরই সরকারের? কেন? পণ্ডিত নেহ্‌রু, তুমি নিজে যদি উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলি ঘুরে দেখে তাড়িত

মানুষগুলির মুখে চোখে লেগে থাকা ত্রাস ও ভয়ের ভাষা পাঠ করতে চেষ্টা করতে, তা'হলে বুঝতে কি অবস্থায় পড়লে মানুষ তার স্থিতু হওয়া আবাসস্থলকে অবহেলায় ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়।

যদি তুমি বুঝতে চাইতে তবেই বুঝতে পারতে কী নিদারুণ অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে পড়ে স্বাধীনতার বলি হওয়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত দিনের পর দিন অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু শাসকদের সে সহমর্মিতা কোথায়, কোথায় সেই আন্তরিক আকুতি? সমাজের ও শাসনের যত পঙ্কিলতা তাতে কেবলি জোড়াতালির ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে চিরস্থায়ী দুর্গন্ধ দূর করা যায় না পণ্ডিত নেহ্রু। এজন্য সরল ও সবল নেতৃত্ব চাই—যে নেতৃত্বে মানুষের যা কিছু মহৎ গুণ তাকে উস্কিয়ে দেবার ও জীবনের যা কিছু কল্যাণ তাকে উজ্জীবনের পথে পথ দেখাবার প্রয়াস থাকবে। সে প্রয়াস কি তুমিও করতে পারতে না নেহ্রু? জাতি কি তোমার কাছেও তাই আশা করেনি? করেছিল। করেছিল বলেই আজ তোমার এত জনপ্রিয়তা, করেছিল বলেই তুমি আজ ভারতরত্ন সম্মানে হয়েছ ভূষিত। কিন্তু সে রত্নের উপরে আজ যখন একের পর এক ভুল সিদ্ধান্তের ধূলার আস্তরণ পড়ছে তখন দেশের দীনতম এক জাতীয়তাবাদী লেখক হিসাবে আমার মনেও যে ব্যথার রেশ ছড়িয়ে পড়ছে নেহ্রু।

পণ্ডিত নেহ্রু, তুমি তোমার জনপ্রিয়তার মেঘপুঞ্জে ভারতের রাজনৈতিক আকাশকে আচ্ছন্ন করে একের পর এক যে ভুল করে চলেছ তার সুদূরপ্রসারি পরিণতি ভেবে আমি শঙ্কিত হচ্ছি। আর সেই ভুলের হাতছানি থেকে যাতে তুমি তথা কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারতীয় জাতি রক্ষা পায়, সেই জন্যই আমি মোগল আমলের বার ভুইঞাদের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, কম্‌রেড এম. এন. রায়,

শরৎচন্দ্র বসু, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতারা যেমন করে কেন্দ্রের অসঙ্গত জেদ ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রকৃত বিরোধী নেতার ভূমিকা পালন করে গেছেন—'মন্বন্তরে না মরা' 'মারি নিয়ে ঘর করা' বিরোধী ভাগ্যরূপ বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা এই বাংলা তথা বাঙ্গালীর মধ্য থেকে আবার তেমনি এক শক্তিশালী সর্ব্বভারতীয় বিরোধী নেতার আবির্ভাব কামনা করি।

শুভ্রেন্দুকে নিয়ে তখন অভিনীত হচ্ছে আর এক নাটক। সে নাটকের যবনিকা উঠলে প্রথম দৃশ্যেই যে রসের অবতরণা হ'ল সে বীভৎস রস। সে রস নিষ্ঠুরতার, নির্মমতার। দুর্বৃত্তরা ওর দেহের উপর অজস্রধারায় বর্ষণ করতে লাগল কীল চড় ঘুষি লাথি। একটি অসুস্থ ভদ্রদেহ সেই পাষণ্ডতা আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারে? এক সময় আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ক্ষতবিক্ষত দেহ ওর সংজ্ঞা হারায়। অবহেলায় পড়ে যায় ওর দেহ পথের বুকে।

ওদের পরিচালনা করছিল, গৌহাটী মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র এবং 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের অন্যতম সক্রীয় বিশিষ্ট সদস্য বরদাকান্ত বরদলৈ। সে হাস্যকর আন্দোলনের নামে কুকর্মের কমরেডদের অসমীয়া ভাষায় বলে:

—এই, আর বেশী মেরনা বঙ্গালটাকে। মরে গেলে ত সব চুকেই গেল। ওকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

এ কথা শুনে ওদের অনেকেই এক সঙ্গে প্রশ্ন করে:

—সে কি রকম?

—আগে এটাকে নিয়ে চল আমাদের বাড়ী। সেখানে ঘরে ওকে বন্দী করে রেখে সবাই মিলে বৈঠকে বসে ঠিক করি কি ভাবে কাজ করা যাবে।

—বেশ, তাই হোক, তাই হোক।

সমবেত স্বরে অনেকগুলো কণ্ঠ চেঁচিয়ে ওঠে। অচৈতন্য শুভ্রেন্দুর দেহটাকে দু'তিন জন তরুণ ধরাধরি ক'রে তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওদের পাণ্ডা যুবক তাদের বাধা দিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে :

—বঙ্গালটাকে আবার অত যত্ন করে নিতে হবে, ছোঁ? তার চেয়ে ওর একটা পা ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চল।

—ঠিক, ঠিক।

সবাই উল্লসিত হ'য়ে ওঠে। ওদের মধ্য থেকে একজন অতি উৎসাহী সগর্বে এগিয়ে এসে শুভ্রেন্দুর ডান পাটা ধরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলে নির্দ্দিষ্ট পথে। সেই যুবকের পিছনে পিছনে পশুতার উল্লাসে উন্মত্তপ্রায় জনতা হৈ চৈ করতে করতে জহ্লাদের আনন্দে উদ্বেল হয়ে এগিয়ে চলে।

সোরগোল শুনে বরদাকান্তের অশীতিপর প্রায় অথর্ব ঠাকুরমা নাতনি বিনীতাকে ডেকে বার্দ্ধক্যকম্পিতকণ্ঠে বলেন :

—ওরে বিনী, দেখতো বাইরে কিসের হৈ চৈ?

—যাই।

রান্নাঘরে ভাত কাত করতে করতে সাড়া দেয় বিনীতা। হাতের কাজ শেষ করে কোমরে জড়ানো আঁচল খুলে তাতে ভিজা হাত মুছতে মুছতে পথের দিকে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই পথের চলমান ভীড়টা এগিয়ে আসে। আগে আগে তার ওদের গ্রামের সবচেয়ে বখাটে ছেলেটাকে নির্মমভাবে একটা রক্তাক্ত দেহ অবহেলা-ভরে টেনে আনতে দেখে বিনীতার মনটা ব্যথার, বিষন্নতায় ভরে ওঠে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস করে না। কেননা ক'দিন হ'ল তার শিক্ষিত দাদা যেভাবে দিনের পর দিন এক হিংসার পথে এগিয়ে যাচ্ছে তা সে অবাক হয়ে দেখছে। কিন্তু বাবার অবর্তমানে একমাত্র পুরুষ অভিভাবক তার দাদাই। তাই তার কাজে বাধা দেওয়া বা প্রতিবাদ করা তার মত মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আজ যে বীভৎস খেলায় জ্যান্ত একটা মানুষকে মড়া কুকুরের মত

হেলায় টেনে আনছে তা দেখে তার মনের রুচি যেন সচীৎকারে ধিক্কার দিয়ে উঠল।

শুভ্রেন্দুর দেহটা টেনে এনে প্রথমে ওদের বাইরের উঠানে ফেলতে তার ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে চেয়ে বিনীতার নরম নারীমন দুলে উঠল। বরদাকান্তের কাছে এগিয়ে গিয়ে শুধালো :

—কে দাদা, কি করেছে লোকটা ?

—ওই একটা বঙ্গাল। একটা অসমীয়া মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

বিনীতাকে আর কিছু না বলে বরদাকান্ত সঙ্গীয় কয়েকজনের দিকে চেয়ে বলল :

—ধর তোরা ওর ঠ্যাঙ আর হাতদুটো। চ্যাঙদোলা করে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দিই।

বরদাকান্তর সিদ্ধান্ত মতই তার সাকরেদরা শুভ্রেন্দুর জ্ঞানহারা দেহটা ঘরের মধ্যে বয়ে নিয়ে অবহেলাভরে ধপ্ করে ফেলে দিল। সে শব্দ যেন বিনীতার নারী মনে ঐ ভাবেই আঘাত করল। ওরা বেরিয়ে এলে বরদাকান্ত ঘরের দোর টেনে দিয়ে তার কড়ায় তালা লাগিয়ে চাবিটা বিনীতার হাতে গুজে দিয়ে বলল :

—খুব সাবধান, বঙ্গালদের মত ধূর্ত্ত জাত কিন্তু আর নেই। যদি জ্ঞান ফিরে এলে জলের জন্যে চেঁচায়, দিবি। কিন্তু বেরিয়ে যেন না পালায়। অবশ্য পালাবার শক্তি ওর আর নেই। যা মার পড়েছে—দিন কয়েক বাছাধনের উঠবার মুরোদ থাকবে না।

কথা শেষ করে দলবল সহ বরদাকান্ত চলে যায় বাইরের ঘরে। সেখানে তাদের বৈঠক বসে। বরদাকান্ত বলে :

—ভাইসব! তোমাদের অনেকেরই ইচ্ছা যে বঙ্গালটাকে একেবারে জন্মের মত মেরে ফেলি। আমার ইচ্ছাও তাই। কিন্তু বেঁচে থেকে যতটা যন্ত্রণা সইতে পারে ও সহ্য করুক। তাতে ওকে আরও বেশী শাস্তি দেওয়া হবে। যে কাজ ও করেছে এইটাই তার

উপযুক্ত শাস্তি। এছাড়াও কিন্তু আমার মাথায় আর একটা মতলব এসেছে।

—কি? কি?

প্রশ্ন করে ওদের দু'তিন জন সমস্বরে।

—মতলবটা হ'ল এই, বঙ্গালটার বাবার কাছে ওকে মুক্তি দেওয়া হবে বলে মুক্তিপণ হিসাবে হাজার পাঁচেক টাকা চেয়ে টেলিগ্রাম করে দেওয়া। কেননা বঙ্গালদের একেবারে উৎখাত করতে হ'লে ওদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিতে হলে প্রচুর পেট্রোল চাই। তা ছাড়া অসমীয়া পুলিশদের প্রয়োজন হলে ঘুষ দিয়ে অস্ত্র যোগাড় করতে হবে। দেখলে না পাগলী মেয়েটা মাত্র একটা রিভালভার দিয়েই আমাদের কেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল? এখন বল, এ ব্যাপারে তোমাদের কি মত?

—টাকার আমাদের দরকার ঠিকই, কিন্তু ওকে তাই ব'লে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দেব?

ওদের একজন বলে।

—ছেড়ে দেব, এ কথা ত বলিনি। টাকার জন্য আটকে রাখছি। তারপর ওর বাবা টাকা নিয়ে এলে তখন টাকাও পাওয়া যাবে আর সেই সঙ্গে বাপ-বেটা দু'জনকেই এক সঙ্গে......বুঝলে না?

শেষটুকু মুখে না বলে বরদাকান্ত হাতের পাতা নিজের গলার কাছে এনে এমন ভঙ্গী করে যাতে সবাই বুঝল যে সে কি করতে চাইছে। এসব শুনে ওদের এক কলেজে পড়া ছেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে:

—দি গ্রাণ্ড আইডিয়া!

—এখন চল, বড়গোঁহাইদার কাছে পরামর্শ করে আসি।

বরদাকান্ত বলল। বড়গোঁহাই স্থানীয় ফাঁরীর পুলিশ অফিসার। আসাম থেকে বাঙ্গলাভাষীদের বিতাড়ণে তাঁর সায় ও সমর্থন সর্বাধিক। তাই বরদাকান্ত তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে যা কিছু সলাপরামর্শ করুক

না কেন সব কিছু বড়গোঁহাইকে বলে সৎপরামর্শ গ্রহণ করে থাকে।

সামনের দিকের দরজা বন্ধ করে বরদাকান্ত ভেতরের বাড়ির দিকে আসছে বুঝে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনতে থাকা বিনীতা এক ছুটে চলে যায় ঠাকুরমার কাছে। ঠাকুরমা তার ছানি পড়া চোখে বিনীতাকে আঁচ করে বলেন ঃ

—কিরে, বিনী, শুনলি, কিসের এত হৈচৈ ?

—হ্যাঁ, শুনলাম।

—কি ?

—দাদারা এক বঙ্গালী ছেলেকে মেরে আধমরা করে টেনে হিঁচড়ে আমাদের ঘরে এনে আটকে রেখেছে।

—জানিনে বাপু, কি যে করছে ওরা কালে কালে।

—তাই ত আমিও বলি।

—তা, দেখতে কেমন বল্‌ত' ছেলেটি ? ছোটলোক না ভদ্দর লোক।

—মুখচোখের কি আর বাকী আছে কিছু, রক্তে ধূলায় কাদায় একাকার। বোঝ না, এতটা পথ ছেঁচড়ে নিয়ে এসেছে।

—তা যা না, ছেলেটার শুশ্রূষা করগে একটু। আমার ত' শরীরে কিছু নেই, নইলে আমিই যেতাম।

—কিন্তু দাদা যদি বকে ?

শঙ্কিত স্বরে বলে বিনীতা।

—বকে, বকুনি শুনবি। তাই বলে যে মানুষটা মরতে বসেছে গেরস্তর ঘরে তাকে একটু সেবা করবি নে ?

বিনীতার মনের একান্তে আহত মুমূর্ষু মানুষটাকে একটু সেবা দেবার একটা আকুতি অনেকক্ষণ থেকেই চনমন করছিল, কিন্তু দাদার ভয়ে সাহস পাচ্ছিল না। ঠাকুরমার আশ্বাসে আশ্বস্ত হ'য়ে ও এক বাটি জল, একটু নেকড়া নিয়ে দোর খুলে ঢুকলো গিয়ে

শুভ্রেন্দু যে ঘরে বন্দী, সেই ঘরে। ভেতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে খিল তুলে এগিয়ে গেল অবহেলায় পড়ে থাকা শুভ্রেন্দুর মাথার কাছে। জলের বাটিতে ন্যাকড়া ডুবিয়ে ওর মাটি মাখানো রক্তাক্ত মুখটা পরিষ্কার করতে লেগে গেল। ক্রমে ক্রমে অপরিছন্ন ক্ষতবিক্ষত বন্দীর মুখটায় একটা দিব্যকান্তি সুপুরুষ যুবার চেহারা ভেসে উঠল। সে চেহারাটা বিনীতার মনের মধ্যে গিয়ে যেন ঘা মারল। ওর মন যেন অস্ফুটে বলে উঠল, 'চিনি, একে চিনি!'

কিন্তু কোথায়, কবে, কখন, কেমন করে?

এই প্রশ্ন মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে বিনীতা শুভ্রেন্দুর দেহের অন্যান্য ক্ষতস্থানও জলন্যাকড়া বুলিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল। তারপর ওদের শোবার ঘরে গিয়ে একটা মাদুর আর বালিশ এনে তাতে অতিকষ্টে ঠেলে গড়িয়ে তুলে দিল জ্ঞানলুপ্ত শুভ্রেন্দুর দেহটা। এরপর ছুট্টে গিয়ে এক বাটি পরিষ্কার জল এনে ওর চোখে মুখে থেকে থেকে ঝাপ্টা মারতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

কি করবে তা যেন ভেবে পায় না বিনীতা বরদলৈ। একটা মানুষ তাদের ঘরে তিল তিল করে শুকিয়ে মরবে অথচ তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না? হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় সেবার যখন ওর দাদা ফুটবল খেলতে গিয়ে পায় চোট খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল তখন একটা শিশিতে করে কি একটা ওষুধ এনেছিল—নাম বলেছিল ব্রাণ্ডি। সেটা খেলে নাকি গায়ের ব্যথা মরে। হ্যাঁ, তার কিছুটা এখনও আছে। ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল বিনীতা। একটু পরেই ফিরে এসে শুভ্রেন্দুর মুখে ফোঁটার পর ফোঁটা ফেলে দিতে লাগল শিশিটা কাত করে।

মাঝে মাঝেই ও সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্য করতে থাকে শুভ্রেন্দুর জ্ঞান ফেরে কিনা। থেকে থেকে নাকের কাছে হাতের পিঠ নিয়ে পরীক্ষা করে শ্বাস প্রশ্বাস বইছে কিনা।

অনেকক্ষণ পর শুভ্রেন্দুর ঠোঁটদুটো যেন একটু কেঁপে উঠল বলে মনে হল বিনীতার। ও আরও আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল। শুনল সে বন্দী মানুষটা বিড়বিড় ক'রে কি যেন বলছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না।

বিনীতা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে পড়ে শুভ্রেন্দুর মুখের কাছে কান পাতে। শুভ্রেন্দু তখন বিড়বিড় ক'রে বলছে :

—কি ছেলে মানুষী করছ শিবানী, আমাদের পরিত্রাণ নেই।

শিবানী! শিবানী! শিবানী! তড়িতাহতের মত বিনীতা সোজা হ'য়ে বসে। বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে ওঠে নামটা। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের পর্দায় সর্বঅবয়ব নিয়ে ভেসে ওঠে শিবানীর মূর্তিটা। মুখে সুন্দর একটা লজ্জা—যে লজ্জা কারও মুখে প্রেমের গোপন কথাটি ফাঁস হ'য়ে গেলেই দেখা যায়। তাকে ঘিরে ধরা মেয়েদের হাতে হাতে ঘুরছে একটা ফটো। হ্যাঁ, সেই ফটোতেই ওরা দেখেছিল সহপাঠিনী শিবানীর ফিঁয়াসে—এই ভদ্রলোককে।

সেই ভদ্রলোকের এই অবস্থা। তা হ'লে ওরা দুটিতেই এই কাটাকাটির রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আর সেই সুযোগে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে এই কুটিল আন্দোলন রূপ ব্যাধ বিচ্ছেদের তীর হেনেছে। ভাবতে ভাবতে বিনীতার কর্তব্যবোধ চাগিয়ে ওঠে। হাতের ব্র্যাণ্ডির শিশিটা থেকে আরও কয়েকফোঁটা ঢেলে দেয় শুভ্রেন্দুর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় রান্নাঘরে। উনান থেকে সবে জ্বাল দিয়ে নাবানো গরম দুধ একটা বাটিতে কয়েক হাতা তুলে নিয়ে আবার ত্রস্তে ফিরে আসেও। ফিরে এসে আবার বসে ও শুভ্রেন্দুর শিয়রে। একটু পরই সে তাকায় তার ঘোরলাগা চোখে। মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে চেয়ে জায়গাটা বুঝতে চেষ্টা ক'রে ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে। অস্ফুট স্বরে শিয়রে বসে থাকা বিনীতাকে শুধায় :

—শিবানী, শিবানী কোথায়?

—শিবানী কোথায় আমি ত জানি নে। তবে আমি ওর বন্ধু।

আমি ওর সঙ্গে হাণ্ডিকুঁই গার্লস কলেজেই পড়ি। ঘটনাচক্রে আপনি এসে পড়েছেন আমার জিম্মায়।

—ও, তা আপনি যখন শিবানীর বন্ধু, দয়া করে একটা উপকার করতে পারবেন আমার?

টেনে টেনে অতি কষ্টে কথা বলে শুভ্রেন্দু।

—বলুন।

সাগ্রহে শুভ্রেন্দুর মাথার কাছে ঝুঁকে পড়ে বিনীতা শুধায়।

—আমাকে এখুনি বিষ খাইয়ে বা বুকে ছুরি বসিয়ে মেরে ফেলতে পারেন?

শোনামাত্র ঋজু হয়ে মাথা তুলে বসে বিনীতা। বলে:

—দেখুন, আপনার কথাটা বিদ্রূপের মত শোনালেও ওটা কঠিন বাস্তব। মারবার লোকের এদেশে এখন অভাব নেই। কিন্তু আমি তাদের দলের নই। বাঁচার সাধ যদি থাকে, বলুন, আমি যে করেই হোক সব ঝুঁকি নিয়েও সাহায্য করব।

—বাঁচার সাধ আমার ঘুচে গেছে। দেহের কোষে কোষে আমার কী যে যন্ত্রণা। তাই ত' মরতে চাই আমি মরতে চাই।

—আমি অতটা উপকার আপনার করতে পারব না, সে জন্য দুঃখীত। তবে এখন এই দুধটুকু দয়া করে খেয়ে নিন ত?

—ওতে কিছু হবে না। দয়া করে আপনি আমায় মেরে ফেলুন। শিবানীর প্রকৃত বন্ধুর কাজ করুন।

—মৃত্যুত' আপনার মাথার কাছে কিন্তু তার চেয়ে এক কুটিল ষড়যন্ত্র চলছে আপনাকে নিয়ে। ওরা আপনার বাবার কাছে টেলিগ্রাম করছে মুক্তিপণ হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে এলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে জানিয়ে। কিন্তু ওটাও ওদের ছল। আপনার বাবা যদি টেলিগ্রামের ছলনায় ছলিত হয়ে চলে আসেন—তবে আপনাদের পিতা-পুত্রকে এক সঙ্গেই…

—উঃ ভগবান!

কপালে করাঘাত করতে শুভ্রেন্দু হাত তুলতে গিয়ে আবার যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে 'উঃ' বলে।

—দেখুন, ভেঙ্গে পড়লে ত' চলবে না। তা ছাড়া আমিও খুব নিশ্চিন্ত মনে যে এখানে আছি, তা নয়। দাদা দলবল নিয়ে চলে আসার আগেই আমায় এঘর থেকে চলে যেতে হবে।

—আচ্ছা,, একটা অন্ততঃ কাজ করতে পারেন ?

—বলুন ?

—বাবাকে আমার নাম করে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে পারেন—তাতে শুধু লেখা থাকবে—Do not come—Subhrendu

—দেখুন, যদিও আমি আপনার শত্রুপুরীর মেয়ে তবু বলছি চেষ্টা করে দেখবো, কথা দিতে পারছি নে। কেননা জানেন ত' ডাকবিভাগের অনেক কর্মী নাকি বেঙ্গলিদের টেলিগ্রাম আটকে দিচ্ছে। তা ছাড়া অনেক দূরে মহকুমা শহরে তার অফিস। বিশ্বাসী লোক দিয়ে পাঠাতে হবে ত' ?

—বেশ, তাই দেখবেন।

যন্ত্রণাকাতর ক্ষীণ কণ্ঠে বলে শুভ্রেন্দু।

—কিন্তু তার আগে আমার কথাটা রাখুন, এই দুধটুকু অন্ততঃ খেয়ে নিন।

—বিশ্বাস করুণ, আমার একটুও ইচ্ছে নেই এখন···

—জানি। তবু এটা আমার Satisfaction এর জন্য প্রয়োজন। কেননা Now I am nursing you.

—বেশ, বলছেন আপনি···

বলতে বলতে উঠতে যায় শুভ্রেন্দু। কিন্তু পারে না! সারা গায়ে তার কী কষ্টকর যন্ত্রণারই না জ্বালা।

—না-না, আপনাকে এ অবস্থায় উঠতে হবে না।

বলতে বলতে ওকে উঠতে বাধা দেয় বিনীতা।

—আমি চামচ নিয়ে এসেছি—তাই দিয়ে আপনার মুখে দিয়ে দিচ্ছি। হাঁ করুন ?

বিনীতার এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না শুভ্রেন্দু। সেবাময়ী বিনীতার এক অদ্ভুত রূপ যেন শুভ্রেন্দুর চোখে ধরা পড়ে। মনে মনে ভেবে দেখে এমন করে বলা এমন কারো অনুরোধ অবহেলা করা যায় না। দুধটুকু ওকে খাওয়াতে পেরে অদ্ভুত এক তৃপ্তি পায় বিনীতা। বলে ঃ

—আমার আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। তবে আপনাকে অনুরোধ, যখনই ঘর খোলার শব্দ পাবেন তখনই যেন বেহুঁসের মত পড়ে থাকেন। এতে দাদা ও তার দলবল হয়তো আর কোন নৃশংস অত্যাচার করবে না আপনার দেহের ওপর। বলুন, আমার কথা রেখে এটুকু কপট আচরণ করবেন আপনি—

ক্ষীণ একটু হাসে শুভ্রেন্দু—থৈ থৈ মেঘে ঢাকা এক চিলতে চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণের মত। বলে ঃ

—আপনি শিবানীর বন্ধু ; তাই আমারও বন্ধু, আপনার কথা না রাখা শোভন হবে না।

একথা শুনে বিনীতার মন খুশীতে ভরে যায়। মনে মনে ভাবে যদি কোনদিন শিবানীর সঙ্গে আর দেখা হয়—তবে তাকে বলবে ঃ

—এমন ভদ্র cultured লোক যে তুই বেছে নিতে পেরেছিস, এটা তোর পক্ষেই সম্ভব।

এই কথা ভাবতে ভাবতেই মনে ও মুখে একটা খুশীর রেশ নিয়ে বিনীতা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বেরিয়ে দরজা টেনে যথারীতি তালা আটকে দেয়। তারপর দুধের বাটি ও ব্রাণ্ডির শিশি যথাস্থানে রেখে ঢোকে গিয়ে ঠাকুমার ঘরে। ঠিক এমনি সময়ই বরদাকান্ত বাড়ি ফেরে। সে দোরের কাছে এসে শিবানীকে ডেকে বন্দীর ঘরের চাবিটা চেয়ে নেয়। তারপর এগিয়ে যায় বাঙ্গাল বন্দীটার অবস্থা দেখতে।

দাদার এ আচরণে ভয়ে বিনীতার সারা গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। এতক্ষণও মনের একটা সুন্দর ইচ্ছার ইঙ্গিতে সবকিছু ক'রে

এসেছে—পরিণামের কথা ভাবেনি। তাই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ঠাকুরমার কাছে হাঁটু ভেঙ্গে বসে তার কোলে মুখ গুজে ভীতস্বরে বলে :

—ঠাকুমা, কি হবে।

—তোর ভয় কি বিনী, আমি ত আছি।

বৃদ্ধার কথা শেষ হতে না হতেই বরদাকান্ত হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে আসে :

—বিনী? বিনী?

—দাদা!

অপরাধী কণ্ঠে কোনক্রমে সাড়া দেয় বিনীতা। ইতিমধ্যে সশব্দে বন্দীর ঘরের দোরে আগল দিয়ে তালা মেরে বরদাকান্ত এসে গেছে উঠানের আধখানা পেরিয়ে।

—ওকে জামাই আদরে মাদুরে উঠিয়ে বালিশে শুতে দিয়েছিস কেন?

—শুইয়েছে, বেশ করেছে।

—গেরস্তর ঘরে দৃঢ়স্বরে বলেন বৃদ্ধা—যতক্ষণ আছে, অতিথি নারায়ণ। আমি বলেছি বিনীকে ওর সেবা করতে। তোরা যখন এ বাড়ির সীমানা থেকে ওকে নিয়ে যাবি তখন যা খুশী করিস, কিচ্ছুটি বলতে যাব না।

—আচ্ছা, যত পার সেবাযত্ন কর, কতক্ষণ আর, কাল বিকেলের মধ্যেই ওর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।

—বিনী?

এ কথা বলে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে আবার ডাকে :

—দাদা!

—আমি স্নানে চলাম, ঠাঁই করে ভাত বেড়ে দে অনেক কাজ আছে আমার।

নিজের ঘরে চলে যায় বরদাকান্ত। আর বিনীতার মনে উৎকণ্ঠা—আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর ওর জাগে বান্ধবী শিবানীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন বন্দী ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ ভেবে।

রাত্রি নামে পৃথিবীতে। কৃষ্ণপক্ষের ঘন কালো আঁধারে অস্তিত্ব হারায় পৃথিবীর সব আলো। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ প্রকৃতি বিদীর্ণ হয়ে আসপাশের বাঙ্গালীদের বাড়ীঘরগুলো পেট্রোলের আগুনে জ্বলে ওঠে। লক্‌লকে লেলিহান অগ্নিশিখা তার ব্যাদান মুখে যেন বাঙ্গালীদের ভবিষ্যৎ গ্রাস করে। থেকে থেকে নিগৃহীত নির্য্যাতিত মানবাত্মার ভয়ার্ত ক্রন্দনে আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

বিনীতা বারবার ব্যস্ত হয়ে গৃহাঙ্গন ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাইরের উঠোনে। আবার পরক্ষণেই ফিরে যায় ভেতর বাড়ীতে। তার সারা অন্তর জুড়ে এক অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য। একটা দম আটকানো উদ্বেগ, সীমাহীন উৎকণ্ঠা। নিষ্ঠুরতার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ মানুষের অনেক অনেক করুণ কান্না ও ভয়ার্ত চীৎকার বাতাসে ভেসে এসে ওকে আকুল করে তোলে।

ওদের ঘরেও ত নির্য্যাতীত এক নিষ্পাপ মানুষ অশেষ ক্লেশে বন্দীত্ব বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হ'য়েছে। হয়তো তাকেও এই হনন যজ্ঞের বলি হ'তে হবে। অসহায় মানুষকে জোর ক'রে মৃত্যুর করালগ্রাসে ঠেলে দেবার কী ভীষণ সম্মিলিত বীভৎস ষড়যন্ত্র। এই অন্যায় অত্যাচার থেকে ক্লিশিত মানুষের মুক্তির কোন ব্যবস্থা যদি তার জানা থাকত। যদি একটি মুহূর্তের জন্য ভগবানের মন ও সর্বশক্তিমনিতা লাভ করত সে। তবে সেই সবগুলি শক্তি প্রয়োগে মানুষের মনকে মুক্ত করত পশুতার পঙ্কিলতা থেকে। বিভেদ ও বীভৎস স্বভাবের কালোকুটিল ঈপ্সার পরিবর্তে সবার মনে সঞ্চারিত করত সুন্দর অমলিন ভ্রাতৃপ্রেম।

হঠাৎ যেন হৃদয়ের কোন অন্ধকার কোপ থেকে সুন্দর একটা চিন্তার সৌগন্ধে অনুবাসিত হয় বিনীতার নরম নারীমন। ওর মনে হয় মনের সেই সৌগন্ধ বুঝি এখনই সে নাসারন্ধ্র পথে ঘ্রাণরূপে টেনে নিতে পারবে প্রশ্বাসের সঙ্গে। সেই সুন্দর গন্ধ যেন ওর মনকে সব

কিছু ভয়, শঙ্কা, দ্বিধার হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে এক অভিলসিত স্বর্ণ-পথের সন্ধান দেয়। যে পথে শুধুমাত্র সৎ ও মহৎ জনরাই মাত্র বিচরণ করার অধিকার অর্জন করে। সেই স্বর্ণপথের পথিক হবার অটুট সঙ্কল্প নিয়ে বিনীতা এগিয়ে যায় বাইরের আঙ্গিনা থেকে ভেতরে। তারপর সে আঙ্গিনাও অতিক্রম ক'রে ও গিয়ে দাঁড়ায় একটা বন্ধ ঘরের কাছে। কি এক অনির্ব্বচণীয় অনুভূতির অনুরণ চলেছে তখন ওর দেহের রোমে রোমে।

খুট্ করে দরজা খোলার শব্দ শোনামাত্র শুভ্রেন্দু বসা থেকে শুয়ে পড়ে। ঠিক যেমন পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিল বিনীতা—অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ও। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে মরার মত বেহুঁস হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাদুরে। একটু পর ওর কানে আসে নারীকণ্ঠের অস্ফুট স্বর ঃ

—শুনছেন !

না ভুল নয়। চিনতে পাবে শুভ্রেন্দু এ স্বর। চোখ খুলবে খুলবে ভাবতে ভাবতেই আবার সেই কোমলতার উজ্জ্বল অস্ফুট স্বর কানে আসে ঃ

—কই, উঠুন, উঠে পড়ুন ?

এবার চোখ মেলে চায় শুভ্রেন্দু। দেখে এক কল্যাণী মূর্তি তার বরাভয় দৃষ্টিতে মহৎ এক আশ্বাসের আভাষ দিয়ে যেন তার দিকে চেয়ে আছে। বিনীতা আবার বলে ঃ

—এইবার পালান !

—কি বলছেন আপনি !

বিস্ময়ের বারিধিতে যেন হাবুডুবু খায় শুভ্রেন্দু।

—ঠিকই বলছি। ওরা সব এখন নিশাচরদের মত বাঙ্গালীমেধ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতে বেরিয়ে গেছে। এই সুযোগে আপনি পালান।

উত্তেজনায় শুভ্রেন্দুর হৃৎপিণ্ডটো দাপাদাপি করে যেন। বলে ঃ

—কিন্তু ওরা যদি আপনাকে এজন্য নির্য্যাতন করে।

—সে নির্য্যাতন সইবার শক্তি ভগবান আমায় দেবেন। সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু সে নির্য্যাতন যদি আমার ওপর

আসে তা সইতে পারব এই ভেবে যে বন্দী পাখিকে ওরা তখন আর ওদের নাগালে পাবে না। তাই সে নির্য্যাতন সওয়া আমার সার্থক হ'য়েছে বলে মনে করব আমি।

একটা অদ্ভুত জ্যোতির্ময় আশা যেন আলো ছড়ায় শুভ্রেন্দুর মনের মধ্যেটায়। সে আবার বাঁচবে! আবার মা, বাবা, শিবানীর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারবে। মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি! এ কি সত্যিই সম্ভব হ'তে চলেছে? না কি এ কোন ছলনাময়ী নারীর ছল মাত্র? অথবা স্বর্গের পথ ভুল করে কোন দেবী মানবী রূপ ধরে তার মত এক আর্ত মানুষের মহা উপকার করতেই মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন!

—Please, দেরী করবেন না। প্রতিটি মুহূর্ত্ত এখন যে আপনার কাছে মরকত মণির চেয়েও মূল্যবান! উঠুন, উঠে পড়ুন।

আন্তরিক অনুনয়ে বলতে বলতে বিনীতা তার মনে হয় সে যেন তার মনের অনুবাসিত চিন্তা থেকে স্বর্গোদ্যানের প্রস্ফুটিত পারিজাতের গন্ধ পাচ্ছে আজ। কি মিষ্টি, কি স্নিগ্ধ, কি সুন্দর সে স্বর্গীয় সৌরভ।

অবশেষে দুরুদুরু বুকে বিছানায় উঠে বসে শুভ্রেন্দু। হ্যাঁ সে যেন একটু একটু করে তার দেহের কোষে কোষে হৃতবল ফিরে পাচ্ছে। উঠে দাঁড়ায় ও অবশেষে চোখে মুখের এক উজ্জ্বল আভা নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বিনীতাও। বিহ্বল, হ্লাদিত শুভ্রেন্দু অভিভূতের মত বিনীতার একটা হাত দু'হাতের মুঠোয় টেনে নেয়— উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে ওঠে সে হাত। অন্তর নিভৃতের সবচেয়ে সৌরভযুক্ত কৃতজ্ঞতা জানাতে যায় শুভ্রেন্দু—কিন্তু কোন কথা ওর মুখ হতে বের হয় না। ঠোঁটদুটো শুধু আবেগে কাঁপে, ও বলতে চায়।

—"মনুষ্যত্ব আবার তোমাদের মনের পুষ্পক রথে চেপেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষগুলোর মনে মনে সঞ্জীবিত হোক বোন!'

কিন্তু কিছুই বলা হয় না। পরক্ষণেই হঠাৎ বিনীতার হাতটা ছেড়ে দিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে নিকষকালো আঁধারে মিশে যায় শুভ্রেন্দু।

বিনীতার চোখের কোল বেয়ে ঝরতে থাকে তখন ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু জল। তবে দুঃখে নয়—নিষ্ঠুরতার ঝড়ের ঝাপ্টা থেকে মনুষ্যত্বের প্রদীপের অন্ততঃ একটা শিখাও যে সে জ্বেলে রাখতে পেরেছে—তারই আনন্দে।
